দুই বাংলার

মজার গল্প

সম্পাদনা : মিজানুর রহমান কল্লোল

মিজানুর রহমান কল্লোল—সম্পাদিত

দুই বাংলার মজার গল্প

শিখা প্রকাশনী

দুই বাংলার মজার গল্প
মিজানুর রহমান কল্লোল-সম্পাদিত

প্রকাশকাল ❑ একুশে বইমেলা ২০১১

স্বত্ব ❑ নাজিফা তাজরিয়ান রহমান তিতির

প্রকাশক ❑ নজরুল ইসলাম বাহার। শিখা প্রকাশনী, ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
অক্ষরবিন্যাস ❑ ঈশিন কম্পিউটার, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ❑ এম আর প্রিন্টিং প্রেস ১১, প্যারি দাস রোড ঢাকা ১১০০
আমেরিকা পরিবেশক ❑ মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন,
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ❑ মশিউর রহমান

মূল্য ❑ ২৫০.০০ টাকা মাত্র

Dui Banglar Nirbachito Mojar Golpo : (Edited) by Mizanur Rahman Kaliol.
Published by : Nazrul Islam Bahar Shikha Prokashoni, 38/2-ka, Banglabazar,
Dhaka-1100. Computer Compose : Eashin Computer Pargendaria,
Keranigonj, Dhaka-1310. Shikha Published : 2011

Price : Taka 250.00 Only

ISBN-978-984-454-154-2

উৎসর্গ

অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ

ডা. ফারুক কাশেম

এবং

শিশু বিশেষজ্ঞ

ডা. আনার কলি

প্রিয় যুগলেষু—

সূচিপত্র

পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ৯
ইঁদুরের ভোজ ১৩
পাকা ফলার ১৬
দাশুর কীর্তি ২০
লালু ২৩
হর্ষবর্ধন তাজ্জব! ২৭
দাওয়াই ৩৩
গোপ্যার বউ ৩৭
চিত্তশুদ্ধি আশ্রম ৪০
কাকাতুয়া ৪৭
যৌবনের অপ্সরী ৫০
সিনিয়র এপ্রেনটিস ৫৭
অপরূপ কথা ৫৯
ডগি অ্যালসেশিয়ান নয় ৬৬
জেনারেল ন্যাপলা ৭৪
ভোম্বলদা ৮৪
ওভারকোট ৮৮
মামাদাদার কুষ্ঠি ফলন ৯৪
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ১০০
'শব্দজব্দ'র সূত্রে ১০৪
অন্য কোন খানে ১১২
সম্পর্ক ১৩০
নূরুল ও তার নোট বই ১৪১
দাদুতাড়ুয়া ১৪৯
ঝুনুমাসির বেড়াল ১৫৮
ঘুষ ১৬৬
নয়নচাঁদ ১৭৩

হস্তদন্ত ১৭৯
বাঘ ১৮৫
মামার বিশ্বকাপ দর্শন ১৯২
ভুলোমন ভুলোদা ২০০
ঝন্টু-মন্টু ২০৫
সাইকেল ভ্রমণ ২১০
নাক নিয়ে নাকাল ২১৪
আমার আর্থিক উন্নতি ২১৯
যে দিনে কাট্‌তি ২২২
রিখ প্রজেক্ট ২২৬
লঙ্কাকাণ্ড ২৩৪
গুণের আদর ২৪১
পঞ্চানন কাকুর গাড়ি ২৪৩
সার্কাসের ভাঁড় ২৪৮
সাহিত্য সাধনা ২৫১

পাঠশালার পণ্ডিতমশাই

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছে, আমি ছাতা মাথায় গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া তাহার পরচালার নিচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতগুলি ছেলে বসিয়া পড়িতেছে। একজন পণ্ডিতমহাশয় বাংলা পড়াইতেছেন। কান পাতিয়া একটু পড়ানোটা শুনিলাম। দেখিলাম পণ্ডিতমহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড়ো অনুরাগ। একটি উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিতমহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলো দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কী হয়?

ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম ভোঁদা। ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।

পণ্ডিতমহাশয় ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠলেন এবং তাহাকে মূর্খ! গর্দভ! প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন। ছাত্রও কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল কেন পণ্ডিত মশায়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কীসে হয়, তা কি জানিস না?

ছাত্র। তা জানব না কেন?

ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভালো করিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা করছি?

তখন ভোঁদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভালো রাম, তুমিই বলো দেখি; ভুক্ত শব্দ কী প্রকারে হয়?

রাম বলিল, আজ্ঞে, ভুক্ত ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।

পণ্ডিতমহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন, শুনলি রে ভোঁদা? তোর কিছু হবে না!

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, না হয় না হোক—আপনার যেমন পক্ষপাত!

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কী রে, হনুমান!

ভোঁদাও। ওর কপালে ভুজো আর আমার কপালে ভূ?

ছাত্র যে সুচর্বণীয় ভুজো এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিতমহাশয় তাহা বুঝিলেন না। রাগ করিয়া ভোঁদাকে কে ঘা প্রহার করিলেন এবং আদেশ করিলেন, এখন বল, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কী হয়?

ভোঁদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, জানি না।

পণ্ডিত। জানিস নে? ভূত কীসে হয়, জানিসনে?

ভোঁদা। আজ্ঞে, তা জানি। মলেই ভূত হয়।

পণ্ডিত। শুয়ার! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করে ভূত হয়।

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্ত ক্ত করিলেও তাই হয়। তখন সে বিনীতভাবে পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধা করিত হয়?

পণ্ডিতমহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরাশি সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় থেকে বড়ো বেশি দূর নয়। ভোঁদা গৃহ-প্রবেশ কালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া ভোঁদার মা কাছে আসিয়া সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কী হয়েছে, বাবা?

ছেলে। আমি পড়া বলতে পানি নাই বলে পণ্ডিতমশাই আময় মেরেছে।

মা। অধঃপেতে বুড়ো! আক্কেল নেই! আমার এই একরত্তি ছেলে! পড়া বলতে পারেনি বলে ছেলেকে মারে! আজ ওকে আমি একবার দেখব!

এই বলিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পণ্ডিতমহাশয়ের দর্শনাকাঙ্খায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু চলিলাম। সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিতমহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, হ্যাঁ গা পণ্ডিতমহাশয়, আমার একরত্তি ছেলে পড়া বলতে পারেনি বলে কি এমনি মারতে হয়?

পণ্ডিত। ওগো এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞেস করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভূত কেমন করে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা, ওসব কথা ও ছেলে মানুষ কেমন করে জানবে গা? ওসব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করো।

পণ্ডিত। ওগো সে—ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত?

পণ্ডিত। সেসব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কী বুঝবে? বলি একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তাও ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ওসব কথা বলে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতমহাশয়কে বলিলাম, মহাশয়, ও স্ত্রীলোকে, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ে কিছু বিচার করুন।

পণ্ডিতমহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, আপনি প্রশ্ন করুন।

আমি বলিলাম, ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি?

পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ভালো ভালো। পণ্ডিত পণ্ডিতের মতোই কথা কয়, শুনলি ভোঁদার মা? তারপর আমার দিকে ফিরিয়া এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, ভূত পাঁচটি।

তখন ভোঁদার মা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, তবে রে বুড়ো? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস? ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত, না বারো ভূত?

পণ্ডিত। সে কী বাছা, ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা করো, ভূত পঞ্চ। ক্ষিত্যপ্—

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় তো আমার একটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখর তাহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক বলিলাম, উনি যা বলিলেন তা হতে পারে। অনেক সময়েই শুনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখনো শোনেন নাই, অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধা হইতেছে?

কথাটা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কী সত্য বলিতেছি। কেননা বুদ্ধিটা কিছু স্থূলন। তাঁকে একটু ভেকাপনা দেখিয়া আমি বলিলা, মহাশয়, এ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ তো সকলেই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন—

কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাম্
ভূতনাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টংন সংশয়॥*

পণ্ডিতমহাশয়ের সংস্কৃত জ্ঞান ওই ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে বড়ো ৬য়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষত ভোঁদার মা-র সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন। অতএব যেমন শুনিলেন—ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টংন সং শয়ঃ- অমনই উত্তর করিলেন, মহাশয়, যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই তো আছে—

অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ সাল্মলীতরুঃ।

শুনিয়া ভোঁদার মা বড়ো তৃপ্ত হইল, এবং পণ্ডিতমহাশয়ের ভূসয়ী প্রশংসা করিয়া বলিল,, তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে মার কেন?

---

* কৃপলদিগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্রস্বরূপ কুষ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত। আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান করিব বলিয়াই তো মারি। না মারিলে কি বিদ্যা হয়?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ির কর্তাটির কিছু হল না কেন? ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বল, তো কিছুতেই কসুর করি না!

পণ্ডিত। বাছা! ওসব কি তোমাদের হাতে হয়? আমাদের হাতে।

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে? এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিতমহাশয় এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থানন করিলেন।

শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিতমহাশয় আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, মা এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।

ইঁদুরের ভোজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেরা বললে, ভারী অন্যায়, আমরা নতুন পণ্ডিতের কাছে কিছুতেই পড়ব না। নতুন পণ্ডিতমশাই যিনি আসছেন তাঁর নাম কালীকুমার তর্কালঙ্কার। ছুটির পরে ছেলেরা রেলগাড়িতে যে যার বাড়ি থেকে ফিরে আসছে ইস্কুলে। ওদের মধ্যে একজন রসিক ছেলে কালো কুমড়োর বলিদান বলে একটা ছড়া বানিয়েছে, সেইটে সকলে মিলে চিৎকার শব্দে আওড়াচ্ছে। এমন সময় আড়খোলা ইস্টেশন থেকে গাড়িতে উঠলেন একজন বুড়ো ভদ্রলোক। সঙ্গে আছে তাঁর কাঁথায় মোড়া বিছানা। ন্যাকড়া দিয়ে মুখ বন্ধ করা দু-তিনটে হাঁড়ি, একটা টিনের ট্রাঙ্ক, আর কিছু পুঁটলি। একটা ষণ্ডা-গোছের ছেলে, তাকে ডাকে সবাই বিচকুন বলে, সে চেঁচিয়ে উঠল—এখানে জায়গা হবে না বুড়ঢা, যাও দুসরা গাড়িতে।

বুড়ো বললেন, বড়ো ভিড়, কোথাও জায়গা নেই, আমি এই কোণটুকুতে থাকব, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। বলে ওদের বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে নিজে এক কোণে মেঝের উপর বিছানা পেতে বসলেন।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তোমরা কোথা যাচ্ছ, কী করতে?

বিচকুন বলে উঠল, শ্রাদ্ধ করতে।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, কার শ্রাদ্ধ?

উত্তরে শুনলেন, কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কার।

ছেলেগুলো সব সুর করে চেঁচিয়ে উঠল—

কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কা
দেখিয়ে দেব লবডঙ্কা।

আসানসোলে গাড়ি এসে থামল, বুড়ো মানুষটি নেমে গেলেন, সেখানে স্নান করে নেবেন। স্নান সেরে গাড়িতে ফিরতেই বিচকুন বললে, এ গাড়িতে থাকবেন না মশায়।

কেন বলো তো।

ভারী ইঁদুরের উৎপাত।

ইঁদুরের? সে কী কথা!

দেখুন না আপনার ওই হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে কী কাণ্ড করেছিল।

ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর যে হাঁড়িতে কদমা ছিল সে হাঁড়ি ফাঁকা, আর যেটাতে ছিল খইচুর তার একটা দানাও বাকি নেই।

বিচকুন বললে, আর আপনার ন্যাকড়াতে কী একটা বাঁধা ছিল সেটা সুদ্ধ নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

সেটাতে ছিল ওঁর বাগানের গুটি পাঁচেক পাকা আম।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আহা, ইঁদুরের অত্যন্ত খিদে পেয়েছে দেখছি। বিচকুন বললে, না না, ও জাতটাই ওরকম, খিদে না পেলেও খায়।

ছেলেগুলো চিৎকার করে হেসে উঠল; বললে, হাঁ মশায়, আরও থাকলে আরও খেত।

ভদ্রলোক বললেন, ভুল হয়েছে, গাড়িতে এত ইঁদুর একসঙ্গে যাবে জানলে আরও কিছু আনতুম।

এত উৎপাতেও বুড়ো রাগ করলে না দেখে ছেলেরা দমে গেল—রাগলে মজা হত।

বর্ধমানে এসে গাড়ি থামল। ঘণ্টাখানেক থামবে। লাইনে গাড়ি বদল করতে হবে। ভদ্রলোকটি বললেন, বাবা, এবারে তোমাদের কষ্ট দেব না, অন্য কামরায় জায়গা হবে।

না না, সে হবে না, আমাদের গাড়িতেই উঠতে হবে। আপনার পুঁটুলিতে যদি কিছু বাকি থাকে সবাই মিলে পাহারা দেব, কিছুই নষ্ট হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা বাবা, তোমরা গাড়িতে ওঠো, আমি আসছি।

ছেলেরা তো উঠল গাড়িতে। একটু বাদেই মিঠাইওয়ালার ঠেলাগাড়ি ওদের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল, সেই সঙ্গে ভদ্রলোক।

এক-এক ঠোঙা এক-একজনের হাতে দিয়ে বললেন, এবারে ইঁদুরের ভোজে অনটন হবে না। ছেলেগুলো হুর্‌রে বলে লাফালাফি করতে লাগল। আমের ঝুড়ি নিয়ে আমওয়ালাও এল—ভোজে আমও বাদ গেল না।

ছেলেরা তাঁকে বললে, আপনি কী করতে কোথায় যাচ্ছেন বলুন।

তিনি বললেন, আমি কাজ খুঁজতে চলেছি, যেখানে কাজ পাব সেখানেই নেমে পড়ব।

ওরা জিজ্ঞাসা করলে, কী কাজ আপনি করেন?

তিনি বললেন, আমি টুলো পণ্ডিত, সংস্কৃত পড়াই।

ওরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠল; বললে, তা হলে আমাদের ইস্কুলে আসুন।

তোমাদের কর্তরা আমাকে রাখবেন কেন?

রাখতেই হবে। কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কাকে আমরা পাড়ায় ঢুকতেই দেব না।

মুশকিলে ফেললে দেখছি! যদি সেক্রেটারিবাবু আমাকে পছন্দ না করেন?

পছন্দ করতেই হবে—না করলে আমরা সবাই ইস্কুল ছেড়ে চলে যাব।

আচ্ছা বাবা, আমাকে তবে নিয়ে চলো।

গাড়ি এসে পৌঁছোল স্টেশনে। সেখানে স্বয়ং সেক্রেটারিবাবু উপস্থিত। বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে বললেন, আসুন, আসুন, তর্কালঙ্কার মশায়! আপনার বাসা প্রস্তুত আছে। বলে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

পাকা ফলার

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পাড়াগাঁয়ে এক ফলারে বামুন ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত তাহারা সকলেই খুব গরিব; দই-চিঁড়ের বেশি কিছু খাইতে দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল দই-চিঁড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভালো। সুতরাং এরপর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে সে বলিল যে, পাকা ফলার খাওয়াতে হবে। সে বেচারা, গরিব লোক, পাকা ফলার সে কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, মশাই পাকা ফলার দেওয়া কী যার—তার কাজ? রাজারাজড়া হলে তবে পাকা ফলার দিতে পারে। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, তবে রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে আমি পাকা ফলার খাব।

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্য রাজার বাড়ি চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে তাহাতেই জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগা, রাজার বাড়িটা কোনখানটায়? একজন তাহাকে রাজার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, ওই যে পাকা বাড়ি দেখছ, ওইটে রাজার বাড়ি।

ব্রাহ্মণ 'পাকা ফলার' যেমন খাইয়াছে, 'পাকা বাড়ি'ও তেমনি দেখিয়াছে। সুতরাং, 'পাকা বাড়ি'র কথা শুনিয়া সে ভারী আশ্চর্য হইয়া রাজার বাড়ির দিকে তাকাইল। সে দেশের সব লোকেরই কুঁড়েঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। সে গদগদ স্বরে বলিল, পাকা বাড়ি! আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন? সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লেগেছিল!,

এ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়াইয়া ধরিল; আবার তখনই উঃ-হুহু করিয়া কামড় ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, তাই তো, এই পাকা ফলারের এত নাম। আর খানিক ভাবিয়া সে বলিল, ওঃ হো! বুঝেছি। নারকেলের মতন আর কী। ওটা ওর

খোলা; আসল জিনিসটা ভিতরে আছে। এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার দুইটা দাঁত ভাঙিয়া গেল; তাহাতে গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, আর বেশি দেরি নাই; এর পরই পাকা ফলার আসিবে। এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়িওয়ালা এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, আরে ঠাকুর, ক্যা করতে হো? মহারাজকে ইমারত খা ডালতে হো? চলো তুম হমারে সাথ! এই বলিয়া দারোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দারোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, কী ঠাকুর ওখানে কী করছিলে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, মহারাজ! আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা না ভাঙতে ভাঙতেই এটা ব্যাটা দারোয়ান আমাকে ধরে এনেছে!

এই কথা শুনিয়া রাজামহাশয় হোহো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি। যাহা হউক, তাহার সাদাসিধে কথাগুলি রাজার বেশ ভালো লাগিল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে, এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মতো ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় আসিল যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজামহাশয়কে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

পরদিন সকালে রাজামহাশয় মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন?

ব্রাহ্মণ বলিল, মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি। পাকা ফলার কী আর মন্দ হতে পারে? গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল। জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হল; কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল।

ময়দা আর ঘি দিয়া সে লুচি তৈয়ার করিতে হয় ব্রাহ্মণ বেচারা তাহা জানিত না। কাজেই সে ওই কাঁচা ময়দাগুলিকেই ঘি আর মিঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল; তবে, পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ।

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তয়ের করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাঁহার রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, এখান থেকে ময়দা ঘি নিয়ে তোমার বাড়িতে লুচি তয়ের করে, এই ঠাকুরকে পেট ভরে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।

রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনকে তাহার বাড়ি দেখাইয়া বলিল যে, আমি খাবার তয়ের করে রাখব, বিকালে আপনি এসে খাবেন। আমি বাড়ি থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে এখন। ব্রাহ্মণ রাজি হইয়া বাড়ি গিয়া বিকালবেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভালো ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, সেই লোকটি এসে তাকে বেশ করে খাওয়াস। তাহার ছেলে

বলিল, তার জন্যে চিন্তা কোরো না আমি তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াব এখন। রসুয়ে বামুন রাজবাড়িতে রান্না করিতে চলিয়া গেল; আর তাহার ছেলে ফলারে বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। দু-সেরের বেশি লুচি আর তাহার মতো তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খানচারেক লুচি আর খানিকটা তরকারি ফলারে বামুনের জন্য রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা তাহার সেই বন্ধু আর নিজের জন্য রাখিয়া দিল। ফলারে বামুন আসিলে পর সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে খাইতে দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি—রাজার বামুন ঠাকুর যাহা তয়ের করিয়াছে! এমন জিনিস দু-চারখানি মাত্র খাইয়া তাহার পেট তো ভরিলই না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল—আহা! আর যদি খানকতক দিত।

এমন সময় হইয়াছে কী, রাজার প্রধান ভাণ্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকালবেলায় ওই ফলারে বামুনের জন্য পুরো দু-সের ময়দা আর তাহার মতন অন্য সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে বামুনের মুখে ওই কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞেস করিল, কী ঠাকুরমশাই! কী যদি আর খানকত দিত? ফলারে বামুন বলিল, বাবা আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজামশাই চিরজীবী হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়াছেন। খালি যদি আর খানকতক হত!

ভাণ্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কখনো দিয়েছিল? ফলারে বামুন বলিল, চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছেন। ভাণ্ডারী সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল, সেকি ঠাকুরমশাই! দু-সের ময়দা দিয়েছি, তাতে কি মোটে চারখানা লুচি হয়? ব্রাহ্মণ বলিল, হ্যাঁ বাপু, চারখানাই ছিল। আর খেতে খুব চমৎকার লেগেছিল। ভাণ্ডারী বলিল, দু-সের ময়দায় তার চেয়ে ঢের বেশি লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ওই রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবারে গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন আপনার লুচি সেখানে আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, তাই নাকি? বাপু তুমি বেঁচে থাকো। হতভাগা বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান, পাঁজি, বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটিল। গালিগুলি অবশ্য ভাণ্ডারীকে দেয় নাই, রসুয়ে বামুনের ছেলেকে দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারিখানি লুচি খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াই তাহার সেই বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল, বন্ধু, ঢের লুচি তয়ের করে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শিগগির যাও; আমিও এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।

চোর বসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া সবে লুচির ঢাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর মুশকিলে পড়িল। লুকাইবারও স্থান নাই, পলাইবার পথ নাই। এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কী করে, মাচার কোণে একটা কাঠের থাম জড়াইয়া কোনো রকমে বেমালুম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে আবার ফলারে বামুন নিতান্তই সাদাসিধে লোক, লুচি খাইবার

তাহার মনটা যারপরনাই ব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং চোরকে সে দেখিতে পাইল না। ফলারে বামুন সামনে লুচি, সন্দেহ, তরকারি মিঠাই সাজানো দেখিয়াই খাইতে বসিয়া গেল। পেটে যত ধরিল তত সে খাইল; আর একটি হজমি গুলির স্থানও নাই।

এমন সময় ভারী একটা মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অন্যদিকে সে প্রায় দুপুর রাত্রের পূর্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেটাই ভারী দরকার। ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, তুমি এখনই ফিরে এলে যে? রসুয়ে বামুন বলিল, ঝাঁজরা ফেলে গিয়েছিলুম, তাই নিতে এসেছি।

এতক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এত বোঝাই হইয়াছে যে, আর একটু হইলে তাহার দম আটকায়। পিপাসার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। সে 'জল জল' বলিয়া চ্যাঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভালো করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে বলিল, ওটা কী রে? ছেলে দেখিল ভারী মুশকিলে। সে ফলারে বামুনের কথা তো আর জানিত না, কাজেই সে মনে করিয়াছে যে ওটা তাহার বন্ধু, গলায় সন্দেশ আটকাইয়া বিশ্রী স্বরে জল চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা বাপকে দিলে সে আর বন্ধুর হাত আস্ত রাখিবে না, আর কিছু না বলিলেও হয়তো এখনই মাচায় উঠিয়া দেখিবে, এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধি জোগাইয়া, সে বলিল, বাবা ওটা নিশ্চয় ভূত! তা নইলে মাচার উপর থেকে অমন বিশ্রী আওয়াজ দেবে কেন!

ভূতের কথা শুনিয়া রসুয়ে বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরও মুশকিলের কথা সেই যে, ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয়ই ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তারপর সে কী করে তাহার কী কী? ছেলের ভারী ইচ্ছা, সে ভূতকে জল দিয়া আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল, তা হবে না, যদি তোর ঘাড় ভেঙে দেয়! এই সময়ে তাহার মনে হইল যে মাচার উপর কয়েকটা নাকেল ছাড়ানো আছে, সুতরাং সে ভূতকে বলিল, মাচায় নারকেল আছে, থামে আছড়ে ভেঙে খাও।

ফলারে বামুনের হাতে কাছেই নারকেলগুলি ছিল; সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছড়াইয়া ভাঙিতে গেল। থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়া ছিল; ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নারকেল আছড়াইয়া বসিয়াছে, একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় আর কী!

এরপর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নারকেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চ্যাঁচাইয়া উঠিল; আর তাহাতে ভয়ানক চমকাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণ হাঁউমাউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া জড়ো হইল। আসল কথাটা জানিতে এরপর বেশি দেরি হইল না। চোর ধরা পড়িল, আর রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়া এমনই ঠ্যাঙান ঠ্যাঙাইল যে কী বলিব!

দাশুর কীর্তি

সুকুমার রায়

নবীচাঁদ স্কুলে এসে বললে, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুলসুদ্ধ সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসল—ডাকাতে ধরেছিল। বলিস কী রে?

ডাকাতে না তো কী? বিকেলবেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতেরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদা-জলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব। তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় তার বড়োমামা এসে তার কানধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, রাস্তায় সং সেজে ইয়ার্কি করা হচ্ছিল! নবীনচাঁদ কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, আমি কী করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল। শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, ফের জ্যাঠামি! নবীনচাঁদ দেখলে মামার সঙ্গে তর্ক কর বৃথা, কারণ, সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, একথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করনো শক্ত। সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল।

যাহোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ অনেকটা বোধ হয় দূর হতে পেরেছিল কারণ, স্কুলের অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কতা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটা পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ করে স্বীকার করেছিল। দু-একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরানো বলে সন্দেহ করেছিল তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বললে, ওটা তো জুতোর ফোসকা, তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বললে, যাও তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না! কেষ্টাটার জন্যে আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘন্টা পড়ে গেল। সবাই যে-যার ক্লাসে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকছে। আমরা বললাম, শুনেছিস? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল! যেমন বলা অমনি দাশরথি হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে, বই-টই ফেলে, খ্যাঃ খ্যাঃ করে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে একবার চিত একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক! পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এসেছেন, তখনও পুরোদমে হাসি চলছে। সবাই ভাবলে মাথাটা খেপে গেল নাকি? যাহোক, খুব খানিকটা হুটোপটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে বই-টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পণ্ডিতমশাই বললেন, ওরকম হাসছিলে কেন? দাশু নবীনকে দেখিয়া বললে, ওই ওকে দেখে। পণ্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাসের কোণায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটা ঘন্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল, কী রে দেশো? বড়ো যে ভাসাতে শিখেছিস! দাশু বললে, হাসন না? তুমি কাল ধুচনি মাথায় দিয়ে কীরকম নাচা নাচছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি? দেখলে বুঝতে কেমন মজা! আমরা সবাই বললাম। সে কীরকম? ধুচনি মাথায় নাচছিল মানে? দাশু বললে, তাও জান না? সেই কেষ্টা আর জগাই—ওই যা! বলতে বারণ করেছিল! আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কী বলছিস ভালো করেই বল না? দাশু বললে, শেঠেদের বাগানের পিছন দিয়ে নবু-একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময় দুটো ছেলে-তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচনির মতো কী একটা চাপিয়ে তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল। নবু ভয়ানক রেগে বললে, তুই তখন কী করছিলি? দাশু বললে, তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্যে ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম, ফের নড়বি তো দড়াম মাথা উড়িয়ে দেব! শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়োমামাকে ডেকে আনলাম। নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা তেমনি তার দেমাক, এইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ভালোমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললে, তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে? দাশু বললে, দূর বোকা! কেষ্টা কি ডাকাত? বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির । কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাসে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারি বেড়ালের মতো ফুলে উঠল, কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কটকম করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি নবীর তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হনহন করে আমাদের দিতে আসছে। মোহনচাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়ো। তাকে ওরকমভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বললে, কেষ্টা কই? কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে,

তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীচাঁদ বললে, ওই দশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা করো। মোহন বললে, কী হে ছোকরা তুমি সব জান নাকি? দাশু বললে, না সব আর জানব কোত্থেকে, এই তো সবে ফোর্থ ক্লাশে পড়ি; একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল বাংলা জিওমেট্রি...। মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বললে, সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জান কি না? দাশু বললে, ঠ্যাঙায়নি তো, মেরেছিল। মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বললে, খুব অল্প মেরেছিল, না? তবু কতখানি শুনি? দাশু বললে, সে কিছুই না, ওরকম মারলে একটুও লাগে না। মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বললে, তাই নাকি? কীরকম করে মারলে লাগে? দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বললে, ওই সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমাকে যেমন বেত মেরেছিলেন সেইরকম। এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান মলে চিৎকার করে বললে, দেখ বেয়াদব। ফের জ্যাঠামি করনি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব! তুই সেখানে ছিলি কি না, আর কী কী দেখেছিলি সব খুলে বলবি কি না?

জানই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল, ঘুসি, চড়, আঁচড়, কামড় সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাসের একটা রোগা ছেলে তাকে অমনভাবে তেড়ে আসতে সাহস পারে, তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাঁকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে চিত করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল। ম্যাট্রিক ক্লাসের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেরত, সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হ্যাঁ রে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন? কেষ্টা বললে, দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে! আর বলেছিল, তাহলে এক সের জিলিপি পাবি। আমরা বললাম, কই আমাদের তো ভাগ দিলিনে? কেষ্টা বললে, আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা, আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে যত চাস জিলিপি পাবি। আচ্ছা দাশু কী সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে?

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—অর্থাৎ, সে বহুকাল পূর্বে যে, তোমরা ঠিকমতো ধারণা করতে পারবে না—আমরা একটি ছোটো বাংলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ-এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর মাকে রবারের সাপ দেখিয়া একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা বাড়াতে প্রায় সাত-আট দিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন, এর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে এখন তিনি একজন বড়ো উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করে বিদ্যালাভ করে। কিন্তু শর্ত হল এই যে, যেবার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়িতে পড়ানোর টিউটার। সে যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইল ও মার পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানত বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনার আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হল পুরানো বাড়ি ভেঙে তেতলা বাড়ি করেছেন; সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ-বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধুলো নেন। তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূরে আসতে রাজি হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়াছেন—ফেরবার পথে নন্দরানিকে আশীর্বাদ করে যাবেন। লালুর মার আনন্দ ধরে না, উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত, এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়বে। বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নিচের বড়ো ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হল, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরি হয়ে এল, গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পুজো-আহ্নিকের জায়গা হল, কারণ তেতলার ঠাকুরঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন-কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কী দুর্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরি করতে, ফল-ফুল সাজাতে লালুর মা নিশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়েঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাকরবাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরানিকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ছাদ চুঁইয়া মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়ছে। উঃ কী ঠাণ্ডা সে জল! শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরানি, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেছে দেখছি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারিসুদ্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশি নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডাজল টপ টপ, টপ টপ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে অন্যধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ-ছাতটা দেখছি, এ-কোণ থেকে এ-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে। আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে গিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার জো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো মানুষ; অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপদজ্জনক। কী জানি ফাটা ছাত্র ভেঙে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে! ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলছে বটে কিন্তু কেউ কোথাও নেই, ঘোর অন্ধকার।

যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝোড়ো হাওয়া! দাঁড়াবার জো কী! কোথায় চাকরবাকর, কোন ঘরে শোয় তারা কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরিব মক্কেল যারা, তারাই এসে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্মমর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হল; অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কী! উত্তরে বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শিরশির করে কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে, যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরুভোজন ও রাত্রি-জাগরণে দু-একটা অম্ল উদ্‌গারের আভাস দিলে, উদ্বেগের অবধি রইল না। হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড়ো বড়ো মশা দুই কানের

পাশে এসে গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কী জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট দুই-অনিশ্চিত নিশ্চিত হল; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে টেকে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমন তার চুলকুনি! স্মৃতিরত্ন উঠে স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশায় জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তন আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চায়নে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রহিত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এ-পাশ থেকে ও-পাশ ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হল ডাক ছেড়ে চেঁচান, কিন্তু বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরানি সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে সেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত, শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজল, বললেন, ব্যাটারা যত পারিস, কামড়া আমি আর পারিনে। বলেই বারান্দার এক কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে তো এ দুর্ভাগ্য দেশে আর না। যে গাড়ি প্রথমে পাব সেই গাড়িতে দেশে পালাব। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারারাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে,—স্মৃতিরত্ন অচেতনপ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরানি ভোর না হতেই উঠেছেন,—গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিও তা গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপাচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নিচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হল। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কী ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা জানালা ছেড়ে মাঝখানে নেমেছে, কোষাকুষি, আসন প্রভৃতি পূজা-আহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট, কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেই তখনও ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—ওটা কী? এক কোণ আলো—অন্ধকারে মানুষের মতো কী একটা বসে না! সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

ঘুম ভেঙে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরানি ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারা রাত দুঃখের আর পার ছিল না যে মা!

কেন বাবা?

নতুন বাড়ি করেচ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারা রাতের বৃষ্টি বাদল বাইরে তো পড়েনি, পড়েছে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কী রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মতো ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে, এধার থেকে ছুটে ওদার যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্যসাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরানির দু-চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেন, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতলা, আপনার ঘরের উপর আরও দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তির-তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কী করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হল ও হয়তো ওই শয়তান লালুর কোনোরকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানে চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মতো ছুটে বাহিরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন।

লালুর বাবা সেইমাত্র নিচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, কী কাণ্ড করচ? হল কী?

নন্দরানি কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ওই লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে-এ মহাপ্রাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কী করলে সে?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কী করেছে চোখে দেখসে। তখন সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরানি সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করব কী করে তুমি বলো?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃহাঃ করে হেসে ফেললেন।

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়া দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হ্যায়। আর একজন এসে জানালে, সে মাসিমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছে। মাসিমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসিমা মানে নন্দর ছোটো বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে। এর পরে লালু দিন পনেরো আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না।

হর্ষবর্ধন তাজ্জব!

শিবরাম চক্রবর্তী

হর্ষবর্ধনের শ্রমদানের এক কাহিনী। শ্রমদান না বলে শ্রমের জন্য দান বলাটাই ঠিক।

বিনা স্বার্থে বা পারিশ্রমিকে পরের কর্মে নিজের ঘর্মদানকেই শ্রমদান বলে থাকে নাকি? ভূদান মার্কা দান খয়রাৎ, এটা একেবারেই কোনো ভূয়ো ব্যাপার নয়—প্রত্যেদর্শী মাত্রই জানেন!

কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটাই ঘটেছিল। পরের শ্রমের জন্য বা পরিশ্রমের হেতু হর্ষবর্ধন দান করেছিলেন। সেই দানটা আবার নানান আদান-প্রদান অনেকের বিনাশ্রমে অর্থাগমের প্রাপ্তিযোগের কারণ হয়েছিল, বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে যোগাযোগের সেই আকর্ষণীয়কর বৃত্তান্ত এই...

কী করে ঘটলো বলি...

চেতলার কারখানার গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন এক কাণ্ড করে বসেছেন। নিজের গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

দৃশ্যটা বিস্ময়কর, কেননা হর্ষবর্ধন—বিরুদ্ধে এহেন স্বকপোল—কল্পনা আমি ধারণাও করতে পারি না। নিজের গাল হস্তগত করতে কখনও আমি তাঁকে দেখিনি, অর্থাশ্য পরহস্তগত হতেও দেখিনি যদিও, তাহলে নিজের গালে হস্তক্ষেপ করতে কাউকেও কখনও দেখা যায় কি?

ছোট ছোট ছেলে মেয়ের গালে আদরের ছলে বড়দের স্থূল হস্তবলেপ হতে দেখা যায় সময় সময়, আবার চপেটাঘাতের তালে পরের গালে চড়-চাপড়ের পালা পড়তেও দেখা গেছে, কিন্তু আত্মচর্চায় নিজের গাল হাতাতে কাউকে আমি দেখিনি কখনো।

'গালে হাত দিয়ে এত কী ভাবছেন মশাই?' আমি শুধালাম।

'গালে নয়, আমার কপালে হাত পড়েছে।...ভাবনায় পড়েছি ভারী। বলে তেমনি আরেক এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'পেটে না হাত পড়ে শেষটায়।'

'তার মানে?"

'আমার এই কারখানায় বানানো যত আসবারপত্র দেখছেন না? এইসব হাল ফ্যাশনের আনকোরা ডিজাইনের নিত্যনতুন কায়দায় দেখছেন যত না—এসব আর চলছে না আজকাল। লোকের রুচি পাল্টাচ্ছে।'

'সে কি! আপনার এইসব চমৎকার তক্তপোষে শুয়ে আরাম পাচ্ছে না কেউ? ঘুম হচ্ছে না তাদের?'

'কোথায় হচ্ছে আর!' আবার তাঁর নাসারন্ধ্রের পথে আরেক ফুৎকার!

'বলেই কি মশাই! এমন চমৎকার কারুকার্যকরা তক্তপোষে শুয়েও ঘুম হচ্ছে না কারো!' শুনেই আমি হতবাক ঃ 'আমার তো মশাই যে, কোনো তক্তপোষ পেলেই ঘুম এসে যায়, অবশ্যি যদি তার ওপর গদির আপোস থাকে আর পেটের ভিতর উপোস না থাকে!'

'দূর মশাই! আপনার খালি খাই আর শুই! খাওয়া আর শোওয়ার ধান্দাতেই রয়েছেন কেবল। দুনিয়ার সবাই আপনার মতন নয়। তাদের মন আছে। মন বলে একটা পদার্থ আছে তাদের।'

'তা, কী হয়েছে তাদের?'

মন থাকলেই রুজি থাকে। মন বদলায, সঙ্গে রুচি পালটে যায়। ফ্যাশানের মোড় ঘোরে। জানেন এসব? খবর রাখেন এর?'

'আজ্ঞে না।'

'এখানকার লোক আর একেলে জিনিস নিয়ে খুশি হচ্ছে না, সেকেলে জিনিস চাঁইছে। একালের ফ্যাশানে আর মন উঠছে না তাদের, সেকালের ফ্যাশানে ফিরে যেতে চাইছে। অলঙ্কারের রাজ্যে দেখছেন না কি? আমার বৌ কী সব গয়না বাজার ঢুঁড়ে কিনে এসেছেন? সবার বৌ-ই তাই। সেকালের হাঁসুলি বাউটি বাজুবন্ধ আবার তাঁদের এখন নয়া পছন্দ! বলছি কি তবে? মাথার সিঁথিময়ূর থেকে পায়ের চপ্‌পল পর্যন্ত আপাদমস্তক পরিবর্তন!'

'তাই নাকি?'

'তবে আর বলছি কী? সেইমত এখন বাসন-ভূষণ, আসন-আসবার প্রভৃতি সব কিছুতেই সেকালকে ফিরিয়ে আনতে হবে, নইলে আর একালের লোকের মন উঠবে না। বুঝেচেন মশাই?'

'আপনার এসব সব ফার্নিচারে আরাম পাচ্ছে না তারা? এই আরামের রাজত্ব ফেলে...'

'রামরাজত্বের আমলে ফিরে যেতে চাইছে তারা। সেইরকম খাট পালঙ্ক সব বানাতে হবে আমাদের এখন। তাই ভাবছিলাম...'

'ভাবনার কথাই বটে।' আমি মাথা নাড়ি।

'আচ্ছা, রামকে বনে পাঠাবার জন্যে রাজা দশরথের সঙ্গে ঝগড়া করে দুয়োরানী কৈকেয়ী যে পালঙ্ক ফেলে ভূঁয়ের উপর শুয়েছিলেন সেই পালঙ্কের নক্সটা ছিল কেমন বলতে পারেন?'

'না। তবে ভূঁয়ের নক্সটা বাতলাতে পারি। এখনকার মত রকমই মাটি হবে।' আমি ভূয়োদর্শীর মতই কই।

'সেই পালঙ্কাটার নক্স আমি চাই। পেলে পরে বাজারে চালাই এখন।' তিনি পাল্টা হেঁকেন ঃ 'বাজার মাত করে দিই তাহলে।'

'কোথায় পাব সে নক্স?'

'রামায়ণ মহাভারতের কোথাও? কোনো পুরাণে—ফুরাণে? নেই কোনো খানে?'

'খট্টাঙ্গ-পুরাণ বলে কোনো পুঁথি আছে কি না জানি না। থাকলে তাতেই থাকা সম্ভব। নয় তো অজন্তায়। সেইখানেই যেতে হবে আপনাকে!'

'আপনার মতন এমন সবজান্তা থাকতে আমি অজান্তার কাছে যাব কেন? সে কী জানে। সে কী জানাবে আমাকে!'

'আহা, সে অজান্তা লোক কেন হবে গো! অজান্তা শোনেননি? অজন্তা গুহা। সেখানকার গিরিগাত্রে গুহার গর্ভে সেকালের ছবি-টবি খোদাই করা আঁকা হয়ে রয়েছে, তাই থেকে আপনার মনের মতন আসবার পত্রের নক্সাও আপনি পেতে পারেন। অজন্তা, ইলোরা, মহেঞ্জোদোরো, হরপ্পায় পাবেন এসব।'

'কেন, এই কলকাতায় বসে পাওয়া যায় না?'

'পেতে পারেন হয়ত। তাহলে আপনাকে যেতে হবে আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। সেখানে যদি ঐ সব জায়গায় নক্স টক্সার লিপিলিপি থেকে থাকে কিম্বা ও সবের বর্ণনা দেওয়া কোনো পুরানো বইপত্র। থাকলে সেখানেই থাকবে। পাওয়া যাবে ঐখানেই।'

'তা হলে ওখানেই যাওয়া যাক। জায়গাটা কোথায়?'

'আপনার এই চেতলার বাড়ির থেকে বেশিদূর না। যে তেত্রিশের বাস ধরে আপনার এখানে এলাম, সেই পথের ওপরেই পড়ে জায়গাটা।...'

'বটে? বটে? চলুন চলুন! শুভস্য শ্রীঘ্রম্।' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়েছেন।

তারপর ট্যাক্সি চেপে চকিতের মধ্যে আমরা তার চেতলার কারখানার থেকে সেই লাইব্রেরি কাণ্ডে গিয়ে পড়েছি। কাঠের রাজ্য থেকে যতো আকাঠের রাজ্যে।

সেখানে গিয়ে, সৌভাগ্যেই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার এক গবেষক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লাম—কথার সঙ্গে হর্ষবর্ধনকেও—'ইনি আমার এক বন্ধু, কাঠের কারবারী। আমাদের জাতীয় আসবাবপত্রের পুরাতত্ত্ব জানতে উদ্‌গ্রীব।'

'আববাবপত্রের পুরাতত্ত্ব? কিন্তু তার সম্পূর্ণ খবর কে রাখে?'

'পুরাতত্ত্ব মানে পুরাবৃত্ত? ফ্যাশনচক্র তো একই বৃত্তে ঘোরে ফেরে বারবার দেখা যেতে নাকি। সেকালের পোশাক আশাক যেমন একালে ফিরে আসছে—সেই বাবরি চুল, সেই জুল্‌পি দেওয়া গালপাট্টা—দ্যাখোনি?...'

'এমনকি গয়না টয়নার ব্যাপারেও সেযুগের মামুলি অলঙ্কার সব ফ্যাশান হচ্ছে এখন। সেই হাঁসুলি, বিছে, তাগা, অনন্ত, বাউটি, বাজু ইত্যাদি বাজু ইত্যাদি ইত্যাদি—যেমনটা ফিরে আসছেন ফের!' হর্ষবর্ধন কন।

'বৃত্তটা সম্পূর্ণ ঘুরে এসেছে এতাবৎ। আসবাবপত্রের বেলাতেও সেই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—বৃত্ত পুরা হয়েছে। সেই পুরাবৃত্ত—তার বৃত্তান্তরই খোঁজখবর চান ইনি। কোথায়—কোন বইয়ে তা পেতে পারেন জানতে চান তাই।' আমি জানাই।

'আসবাবপত্রের ফ্যাশান আমি রামরাজ্যের আমদানি করতে চাই মশাই!'

'ও এই!' শুনেই তিনি লাইব্রেরিয়ানের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্তরের হদিশ বাতলে দিলেন। তারপর সে সব হাতে এলে, কোথায় যে মেলে দেকিয়ে দিলেন তাও—'এই পাতাকটাতেই আপনার জানবার যা কিছু পেয়ে যাবেন।'

পাতা কটার ওপর চোখ বুলিয়ে সায় দিলেন হষবর্ধন—'হ্যাঁ, এই হলেই হবে। আপাতত এই যথেষ্ট। তা, কত টাকা দিতে হবে বইটার জন্য আপনাদের? দুশো? পাঁচশো? দু-হাজার?' লাইব্রেরিয়ানকে তিনি শুধান।

'বই তো আমরা বেচন না। এমন কি দশ হাজার টাকা জমা রেখেও ছাড়তে পারব না। এসব বইভ রেয়ার বুক্‌স—পর্যায়ের কিনা এসব। তবে এখানে এসে পড়তে পারেন—কপি করে নিয়ে যেতে পারেন ইচ্ছে করলে। এই কটা পাতাই তো? কেউ বসে কপি করলে ঘন্টাখানকের মামলা। কিন্তু দোহাই, শর্টকাটে যাবেন না যেন। খবরদার।'

শর্টকাটের মানে বুঝতে চান হর্ষবর্ধন।

'মানে, ব্লেড দিয়ে পাতা কুচ করে কেটে নেয়ার কু-মতলব ভাঁজবেন না। তা হলেই থানায় যেতে হবে বুঝেছেন?'

'সেখান থেকে সোজা শ্রীঘর। সেটাও আবার এই অলিপুরেই।' আমি খেঅলসা করে বুঝিয়ে দিই—'এইসা কুচ্‌-কামকা বাস্তে এহি হোতা হায়!' রাষ্ট্রভাষায় বক্তব্যটা রাষ্ট্র করি তার ওপর।

রাষ্ট্র করার পর আমার রাষ্ট্রদোহিতা প্রকাশ পায় সাদা বাংলায়—সত্যি বলতে এই সব কপি করতে আমরা উৎসাহ পাই না—যাঁদের নাম বহনের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের একজন অবশ্যি সেই ত্রেতা যুগে কপিদের নিয়ে কিছু কাজ করেছিলেন কিন্তু একালে আজ আমার পক্ষে ওই কপিকল হওয়ার একেবারেই নেই।'

'মানুষের অসাধ্য কিছু আছে নাকি মশাই? 'তিনি আমায় উদ্দীপনা দিতে চান—'বেশ আপনার একটা গল্প লেখার পারিশ্রমিক যদি আপনাকে দিই? আপনার একটা লেখার দাম কতো? এক ঘন্টার আপনি কত রোজগার করেন বলুন তাহলে?'

তাহলে? আমি ভাবতে লাগি। ভেবে দেখি সে কতা কহতব্য নয়। ঘন্টাখানেক রিক্সা টানলে যতো রোজগার হয় কলম টেনে আমার উপায় তার চেয়ে ঢের ঢের কম! আমার পাড়ার একটা ঠেলাওয়ালা এক বেলা ঠেলা ঠেলে যা কামাই করে একাধিক সম্পাদককে ঠেলাঠেলি করেও তার সিকির সিকি আমি দেখতে পাই না।

আমাকে ভাবান্বিত দেখে হর্ষ কন—আপনার ঘন্টামজুরির হিসেব থাক। আপনাকে অত মাথা ঘামাতে হবে না। তারচেয়ে আমার হিসেবেই আপনাকে দিই না হয়। এক ঘন্টায় আমার নিজের যা আয় হয় তাই থেকেই হিসেবটা বার করা যাক। মিনিটে মিনিটে কত হয় তার চুলচেরা খতিয়ানে না গিয়ে ঘন্টায় মোটামুটি

[illegible] খানেক—খুব না বেচাকেনার দিনেও হয়ে থাকে, আমার ধারণা। সেই হারেই [illegible] কেন আপনাকে? এইটুকু কপি করার জন্য হাজার খানেক খুব বেশি নয় [illegible] করে দেখলে। তবে সাধারণ জ্ঞানে এক ঘন্টার পারিশ্রমিক এক হাজারই [illegible] কম নেওয়া যায় না, দেওয়াও যায় না কাউকে।' বিবেচনা পূর্বক তিনি [illegible] 'কেমন, ভেবে দেখুন, আপনি রাজি কিনা।'

[illegible] ভেবে চিন্তেও নারাজ হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বলি—হ্যাঁ, [illegible]। তবে ঘন্টাখানেকের ভেতর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। সময় লাগবে। রয়ে [illegible] ধীরে সুস্থে এই কটা পাতা কব্জা করতে কয়েক ঘন্টা লাগবে আমার। বিকেল [illegible] যাবে বোধ হচ্ছে। তবে সময় যাই লাগুক, আপনাকে ওর বেশি টাকা লাগাতে [illegible] আর। ওই এই হাজারই আমার যথেষ্ট।'

'[illegible] য-ঘন্টা লাগে লাগুক। আমি আমার কারখানার গেলুম। সন্ধ্যে বেলায় এসে [illegible]। এই ধরুন আপনার দক্ষিণার এক হাজার।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত বাড়াই। হাজারে ব্যাজার আমি কক্ষণো নই। উনি [illegible] থেকে খান দশেক বড় নোট বার করে দিয়ে গেলেন।

আর তিনি উধাও হওয়ার পরই আমি সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগলুম। সেই গবেষক [illegible]কে গিয়ে ধরলুম—'ভাই, এই পাতা কটা তুমি করে দেবে আমায়? তার জন্যে [illegible] টাকা দেব আমি।' তারপরে তাঁর মৌনভার সুযোগ নিয়ে পাঁচশো টাকা তাঁর [illegible] ধরে দিই।

তিনিও মুখ বুজে নিয়ে নেন। কোনো উচ্চ বাচ্য না করেই।

আর, তারপরেই, আমার চোখের ওপরেই সেখানে পাঠরত, তাঁর কলেজের [illegible] একে ডেকে বলেন—'বাপু, এই পাতা কটা কপি করে দাও তো চটপট। ধরো [illegible] দুশো টাকা।'

আমি পাঁচশো আর তিনি, তিনি তিনশো নগদ পকেটস্থ করে বেরুবার মুখেই দেখতে পেলাম ছেলেটি শিশু বিভাগের পড়ুয়া বালখিল্যদের ভেতর থেকে [illegible]জনকে পাকড়ে এনেছে আর তার হাতে একশ টাকার একখানা গছিয়ে দিয়ে কী [illegible] বলছে...

কী বলছে তা বুঝতে আমাদের বিলম্ব হল না।

সন্ধ্যের মুখে এলেন হর্ষবর্ধন। এসেই তাঁর কপিটা পেলেন। লাইব্রেরির এক বেয়ারার হাত থেকে। সে তাই নিয়ে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

তাই পেয়েই হর্ষবর্ধন কী হর্ষোৎফুল্ল!—'বাঃ, বেশ হয়েছে। দিব্যি, কপি। [illegible] অক্ষরে লিখে দেওয়া—হস্তলিপি শেখার বইয়ে যেমনটা থাকে। স্পষ্ট পড়া [illegible]। পড়ে বোঝার কোনো অসুবিধা হবে না আমার।'

'হ্যাঁ বাবু!' আপ্যায়িত হাসি হাসে বেয়ারা।

বেচারার হাসিটা একটু বেয়াড়া বেয়াড়া ঠেকলেও হর্ষবর্ধন কিছু কম আপ্যায়িত [illegible]—'এতক্ষণ তুমি এই নিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছিলে আমার জন্যে? তোমাকেও কিছু দিই, কেমন? টিফিন করোগে।'

তাঁর মানিব্যাগ উন্মুখ করার মুখেই বেয়ারটা ব্যগ্রভাবে বাধা দেয়—'আবার কেন দিবেন বাবু? আমার মেহনতি তো পেয়েই গেছি। এই টুকুন লিখার কর্মে, এর জন্য দশ টাকাই তো বহুত। দু টাকার কাম দশ টাকা মুজুরি! বহুৎ বহুৎ! আর আমার চাই না বাবু।'

উন্মুক্ত ব্যাগের উন্মুখ একশ টাকা হাতে ধরে হষবর্ধন হতভম্ব হন! টাকা দিতে গিয়ে এই প্রথম তাঁকে অপারগ হতে হয়। অর্থনির্লোভ এ রকম বোকা লোক আছে নাকি কোথাও!

দাওয়াই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible]গোপালবাবুকে লোকে বলে কাষ্ঠগোপাল।

অকারণে বলে না। একটা মিষ্টি কথা বলবারও অভ্যেস নেই ভদ্রলোকের। কারণে অকারণে লোককে যা-তা বলে তাদের মন খারাপ করে দিতে তিনি ভয়ানক ভালোবাসেন।

এই ধরো, পটলা অঙ্কে ফেল করেক ক্লাসে প্রমোশন পেল না। তিন দিন ধরে ছেলেটা খালি কেঁদেছে, তাকে দেখলে সকলেরই দুঃখ হয়, কেবল কাষ্ঠগোপালের হয় না। পটলাকে আরো কষ্ট দিয়ে মনে মনে তিনি ভারী আরাম পান।

বাজারের ভেতর দিয়ে হয়তো পটলা যাচ্ছে, চারদিকে লোকজন, তার মধ্যে গলা চড়িয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, কিরে পটলা, অঙ্কে নাকি তুই তিন পেয়েছিস?

পটলা যে দৌড়ে পালাবে তারও জো নেই। রাস্তা জুড়ে কাষ্ঠগোপাল দাঁড়িয়ে।

—তা তিন তো পাবিই। যেমন তোর নিরেট মগজ! একেবারে যে গোল্লা পাসনি, এই তো বরাত বলতে হবে! অত লোকের সামনে ঢুকরে কেঁদে ওঠবার উপায় সেই পটলার। লাভের মধ্যে যারা খবরটা জানত না তারাও জেনে গেল। আর বাগিয়ে রসিয়ে কাষ্ঠগোপাল বলতে থাকলেন ঃ ওরে, লেখাপড়া না করে তুই বরং জলে ডুবতে যা। কালিদাসের বেলায় যেমনটা হয়েছিল—তেমনি যদি মা সবস্বতী তোকে দয়া করতে আসেন, তা হলে এ যাত্রা তরে গেলি। নইলে সামনের পরীক্ষায় ফের তুই অঙ্কের খাতায় পাঁচও পাস তো—

এবার ভ্যাঁক করে কেঁদেই ফেলল। পটলা। আর তাই দেখে মিটমিট করে হাসতে লাগলেন কাষ্ঠগোপাল।

বিশ্বনিন্দুক লোক। কিচ্ছু পছন্দ হয় না কাষ্ঠগোপালের। পাড়ায় কোনো বাড়িতে বিয়ে টিয়ে হলে ভদ্রতার খাতিরেও তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। আর খেতে বসে কী বলেন কাষ্ঠগোপাল—আরে ছ্যা, এর নাম লুচি? এ যে জুতোর চামড়া হে। পচা

ভেজিটেবল, ঘি জোটালে কোত্থেকে? রাম-রাম, এ-রকম বাজে মাছের কালিয়া তো কখনো খাইনি। অ্যাঁ—এগুলো রসগোল্লা নাকি? তা হলে আর সুজির পিণ্ডি কাকে বলে?

কেই যদি বলে, আমাদের তো ভালোই লাগছে—কাষ্ঠগোপাল, তাকে ঠাট্টা করতে থাকেন। বলেন, পরের পয়সার যে খাচ্ছ হে! জুতোর সুখতলাও অমৃতের মতো হবে, মার্বেল খেতে দিলেও বলবে জনাইয়ের মনোহরা খাচ্ছি।

এই হলেন কাষ্ঠগোপাল। কিন্তু লোকে তাঁকে চটাতে সাহস পায় না। তার অনেক টাকা, আর পাড়ার অর্ধেক বাড়ির তিনি মালিক।

পাড়ায় নতুন বাড়ি করে এসেছেন মার্তণ্ডবাবু। রাশভারী চেহারার লোক। কী যেন সরকারি চাকরি করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন। প্রায়ই জবই-টই পড়েন আর সকালে-বিকালে একটা লাঠি হাতে নিয়ে দেশবন্ধু পার্কে বেড়াতে যান।

কাষ্ঠগোপাল গিয়ে হাজির হলেন তাঁর কাছে। নুতন লোক, আলাপ তো করা চাই। তা ছাড়া ফাঁক পেলে দুটো কড়াও কথাও বলে আসবেন।

মার্তণ্ডবাবু একটা মস্ত চামড়া-বাঁধানো ডেকচেয়ারে বসে প্রকাণ্ড একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। কাষ্ঠগোপালকে দেখে বইটা নামিয়ে বললেন, আসুন। বসুন।

—আলাপ করতে এলুম।

চশমার ভেতর দিয়ে তাঁকে ভালো করে দেখে নিলেন মার্তণ্ড। তারপর বললেন, বেশ। একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, এ পাড়ায় বাড়ি করলেন কেন?

—এমনি। ভালো লাগল।

—না মশাই, অতি নচ্ছার পাড়া। লোকগুলো খুব বাজে।

—তাই নাকি? হঠাৎ মার্তণ্ড জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনিও বুঝি খুব বাজে?

কথাটা শুনে একটা বিষম খেলেন কাষ্ঠগোপাল ঃ না———ইয়ে—আমি বাজে লোক নই। পাড়ায় একমাত্র ভালো লোক আমাকেই বলতে পারেন।

মার্তণ্ড বললেন, শুনে সুখী হলুম। তা কী খাবেন? চা না ঘোলের সরবৎ?

কাষ্ঠগোপাল বললেন, বড্ড গরম পড়েছে আজ। ঘোলের সবরৎই ভালো।

মার্তণ্ড ঘোলের সরবৎ আনতে বলে দিলেন চাকরকে । কাষ্ঠগোপাল ভাবতে লাগলেন, এইবার কী বলা যায়।

—অনেক খরচ করে বাড়ি করলেন মশাই, কিন্তু ভালো হয়নি।

মার্তণ্ড বললেন, ভালো হয়নি বুঝি? সবাই তো প্রশংসা করেছে বাড়ির।

—ও তো মুখের প্রশংসা মশাই। এ আবার বাড়ির একটা ডিজাইন নাকি? তা ছাড়া সব বাজে মাল-মশলা দিয়ে তৈরি মশাই, দেখবেন—এক বছরেই বাড়িতে ধরে যাবে।

—ফাট ধরে যাবে?

যাবেই তো? কন্ট্রাক্টাররা কী করে? যেমন তেমন করে কেবল পয়সা আদায়ের ফন্দি, যা তা একটা তৈরি করে দিলেই হল।

অ।—মার্তণ্ড আবার কাষ্ঠগোপালের দিকে তাকালেন : কিন্তু এ বাড়ি তো কন্ট্রাক্টার করেনি। আমার বড়ো ছেলে এন্‌জিনীয়র, সেই-ই দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছে।

ও—ও।—কাষ্ঠগোপাল একটু ঘাবড়ালেন : তা হলে মাল—মশলা ভালোই দিয়েছে। কিন্তু আপনি যা-ই বলুন, ডিজাইনটা ভালো হয়নি।

কপালকুঁচকে মার্তণ্ড কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কাষ্ঠগোপালের দিকে। আর এর মধ্যে চাকর ঘোলের সরবৎ নিয়ে এল।

চমৎকার সরবৎ। মশালা-টশলা দিয়ে অনেক যত্ন করে তৈরি—নিন্দে করার কিছু নেই। কিন্তু এক চুমুক খেয়েই নাক কুঁচকে উঠল কাষ্ঠগোপালের।

মার্তণ্ড বললেন, সরবৎ আপনার পছন্দ হয়নি বোধ হয়?

কাষ্ঠগোপাল বললেন, সত্যি কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। না—পছন্দ হয়নি।

মার্তণ্ড শান্ত গলায় বললেন, কি রকম আপনার পছন্দ?

—এই দই দোকান থেকে আনিয়াছেন তো?

—আর কোথায় পাব?

—তাই। আরে দোকানের দই কি আর দই মশাই, ও তো অর্ধেক চুনের গোলা।

বিনীত হয়ে মার্তণ্ড বললেন, তা হলে ভালো দই কোথায় পাব বলতে পারেন?

—বলছি, শুনন।—খুশি হয়ে কাষ্ঠগোপাল টেবিলে একটা চড় মারলেন : সেই দই সে ঘোল খেয়েছিলুম আমার পিসিমার বাড়িতে—হরিপালে। মানে তারকেশ্বর লাইনে যে হরিপাল আছে, সেখানে।

মার্তণ্ড বললেন, বলে যান।

—আগের দিন গোরু দোয়ানো হল। সেই টাট্‌কা দুধ ক্ষীরের মতো জ্বাল দিয়ে পাকের দই পাতা হল। সেই দই থেকে পরদিন দুপুরে যখন ঘোল তৈরি হল—

বাধা দিয়ে মার্তণ্ড বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমিই সে ঘোল খাওয়াতে পারি আপনাকে। একেবারে সেই জিনিস।

হকচকিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, সেই জিনিস।

—একেবারে। কোনো খুঁত পাবেন না।

বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মার্তণ্ড। কাষ্ঠগোপালকে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। কাষ্ঠগোপাল কেমন চমকে গেলেন।

—কোথায় যেতে হবে?

—আসুন বলছি।

বাপ্‌রে, কী গলার আওয়াজ মার্তণ্ডের। পিলে চমকে গেল কাষ্ঠগোপালের। মার্তণ্ড আবার সেই বাঘা স্বরে বললেন, আসুন শিগগির।

অগত্যা উঠে পড়লেন কাষ্ঠগোপাল। তাকে সোজা দোতলার নিয়ে গিয়ে একটা ছোট ঘরের দরজা খুলে দিলেন মার্তণ্ড। বললেন, ঢুকুন ওর মধ্যে।

—অ্যাঁ।—ওখানে কী?

—ঘোলের সরবৎ। আপনি যেমন চেয়েছেন। ঢুকুন।

প্রায় ঠেলেই কাষ্ঠগোপালকে ভেতর ঢোকালেন মার্তণ্ড। তারপর খট্—খটাং! বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

চেঁচিয়ে কাষ্ঠগোপাল, বললেন, একি ব্যাপার মশাই মার্তণ্ডবাবু! দোর বন্ধ করলেন কেন? খুলুন—খুলুন—

বাজের মতো আওয়াজ তুলে বাইরে থেকে মার্তণ্ড বললেন, আমার ঘোলের সবরং আমি স্পেশ্যাল মশলা দিয়ে তৈরি করি—যে খায় সে-ই শতমুখ প্রশংসা করে। আপনি তার নিন্দে করলেন! ঠিক আছে, আপনি যা চান, তাই খাওয়াব।

—কিন্তু এ ঘরে সরবৎ কোথায় মশাই! মিস্তিরিদের ক'টা চুনের টিন, ক'টা বাঁশ—

—আসবে, সরবৎ আসবে। আমি এখুনি হাটে লোক পাঠাচ্ছি, সন্ধ্যো মধ্যে সে লোক ফিরে আসবে। কাল দুধ দোয়ানো হলে—কাল সন্ধ্যো ক্ষীর তৈরি করে দই পাতা হবে। সেই দই থেকে পরশু দুপুরে ঘোল হবে। সেই ঘোল খেয়ে তবে আপনি এ ঘর থেকে বেরুবেন, তার আগে নয়।

বলে, মার্তণ্ড চলে গেলেন।

—ও মশাই—ও মশাই—এ কি রসিকতা! খুলে দিন বলছি—কাতরস্বরে চ্যাঁচাতে লাগলেন কাষ্ঠগোপাল। কেউ সাড়া দিল না।

ভাগ্যিস, ঘরের ছোট জানলাটার শিক-টিক কিছু ছিল না। প্রাণের দায়ে সেইটে দিয়েই ঝাঁপ মারলেন কাষ্ঠগোপাল—পড়লেন একটা পচা-ডোবার ভেতর। ঘোলের বদলে এক পেট কাদাজল খেয়ে তিনি উঠে পড়লেন, তারপর সেই যে ছুটলেন—

অলিম্পিকের দৌড়ও তার কাছে লাগে না!

গোপ্যার বউ

জসীম উদ্‌দীন

গোপপাকে লইয়া পাড়ার লোকের হাসি-তামাশার আর শেষ নাই। কেহ তাহার মাথায় কেরোসিন তৈল মালিশ করিতে ছুটিয়া আসে, কেহ তাহার গায়ে ধূলি দেয়। তবু তাহার গল্‌প থামে না। জোয়ারের পানির মতো তাহার মুখ হইতে সব সময় নানা রকম মিছা আজগুবি গল্‌প বাহির হইয়া আসিতে থাকে। 'আজ মাঠে যাইয়া দেখি এক আজদাহা সাপ! আমাকে দেখিয়া সাপ ত তাড়িয়া আসিল। আমিও দে ছুট —সাপও আমার পিছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম। পট-ফণা মেলিয়া সাপ আমাকে ছোবল দেয়ই আর কি! তখন আমি কি করি? তাড়াতাড়ি এক লাফে সাপের ফণার উপর চড়িয়া বসিলাম। সাপ তখন ছুটিয়া চলিল। আমিও ফণার উপর বসিয়াই আছি। ছুটিয়া যাইয়া সাপ ঢুকিল এক শাপলা-বিলে। আমি সাপের ফণার উপর বসিয়াই চারটি শাপলা ফুল ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। তারপর সাপের ফণাটা ঘুরাইয়া ধরিলাম বাড়ির দিকে। ওই আম-বাগানতক আসিয়া সাপ কোড়লে ঢুকিল আমি শাপলাফুল কয়টি লইয়া তোমাদের এখানে আসিলাম। তোমরা সাপের কথা সাঁচা না মনে করিলে আম-বাগানের ওখানে খুঁড়িয়া দেখিতে পার, আর আমার হাতের শাফলাফুল ত দেখিতেই পাইতেছ।' সুতরাং তাহার কথা সাঁচা না মানিয়া আর উপায় আছে? কে যাইবে সাপের খোঁড়ল খুঁজিতে!

এই গল্‌পের আর শেষ নাই। কোন দিন সে আসিয়া বলে, 'মৌমাছির চাক কুলগাছের উপর। তার উপরে যাইয়া বসিয়া পড়িলাম। অমনি মৌমাছির দল মৌচাক লইয়া আসমানে উড়িতে লাগিল। আমি ত চাকের উপরে বসিয়াই আছি। উড়িতে উড়িতে উড়িতে আসমানে চলিয়া গেলাম। সেখানে নীল মেঘ, কালো মেঘের দেশ। তারও উপরে সাঁঝ-মণির বাড়ি। চারদিকে সিনদূরের পাহাড়। সেখান হতে চলিয়া গেলাম সাত গাঙের ধারে। সেখানে রাজার মেয়ে জোনাকি ধরিয়া মালা গাঁথিতেছে। তাহারই কাছ হইতে তিনটি জোনাকি ধরিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।'

শুনিয়া সকলে বলে 'বাড়ি কেমন করিয়া ফিরিলে? আসমান হইতে লাফাইয়া পড়িলে নাকি?' গোপ্পা কোন জবাব দিতে পারে না। পাড়ার লোকেরা তাহাকে তাড়া করিয়া ফেরে। ছোটরা তবু গোপ্পাকে বড়ই ভালবাসে। হোক তার গল্প মিছা আজগুবি, তবুও শুনতে তো খারপ লাগে না!

গোপ্পার বউ বড় ভাল মানুষ। দেখিতেও খুব খুবছুরুত, আর তার কথা-কওয়া, চলন বলন আরও চশৎকার; তবুও সবাই তাহাকে দেখিলে বলে, 'এই যে গোপ্পার বউ আসিল।' গোপ্পা যেখানে যত মিছা আজগুবি গল্প বলে তাহাই নানা ভঙ্গি করিয়া লোকে গোপ্পার বউকে বলে; আর নানা রকমের হাসি তামাশা করে।

বেচারী কত আর সয়? সেদিন গোপ্পা বউকে খুশি করিবার আশায় মনে মনে একটি চমৎকার আজগুবি গল্প বানাইয়া আনিয়াছিল, বাড়ি আসিয়া বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বড়ই মনমরা হইয়া পড়িল। সে কহিল 'কি হইয়াছে বল তো?'

বউ ঠেস দিয়া উঠিয়া বলিল, 'কি হইয়াছে বুঝিতে পার না? এই যে পাড়ায় পাড়ায় মিছা আজগুবি গল্প বানাইয়া বলিয়া বেড়াও, লোকের টিট্‌কারিতে তো আমি ঝালাপালা হইয়া পড়িলাম। আমাকে যে দেখে সেই বলে, ওই যে গোপ্পার বউ আসিল।

বউয়ের দুঃখ দেখিয়া গোপ্পার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল। সে বউকে কহিল 'বল তো আমাকে কি করিতে হইবে?'

বউ বলিল, 'করিতে আর কি হইবে? তুমি তোমার ওই গল্পের ছালা কোথাও ফেলিয়া দিয়া আস।'

অনেকক্ষণ ভাবিয়া গোপ্পা বলিল, 'কাল সকালে আমি সামনের ওই পাহাড়টার ওখানে যাইয়া গল্পের ছালা ফেলিয়া দিয়া আসিব। সেখানে অনেক বাঘ-ভালুক থাকে, বড়ই বিপদের পথ। আর ফিরি কি না ফিরি কে জানে? তবু যাব সেখানে কাল।'

বউ বলিল, 'তুমি ফের না ফের তার ধার ধারি না। গলপের ছালা তোমাকে ফেলিয়া আসিতেই হইবে।'

রাগের মাথায় একথা বলিলে কি হইবে? সাঁচ তো মনে হয় না, তবু যদি সেখানে বাঘ-ভালুকের ভয় থাকে! বউ সকলে উঠিয়া ভালমত পাক করিয়া দুধ-ভাতে গোপ্পাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিল। খাইয়া-দাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পোগ্পা পল্পের বোঝা ফেলিতে আসিতে দূর পাহাড়ের পথে রওয়ানা হইল। পথে যাইতে এমন ভঙ্গি দেখাইয়া চলিল যেন কত বড় বোঝাটা সে মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

সাঁঝের বেলা গোপ্পা ফিরিয়া আসিল। বউ কহিল 'গল্পের ছালা একেবারে উজাড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছ তো?'

গোপ্পা বলিল, 'ফেলিতে কি পারিলাম? আমি তো ওই পাহাড়ের কাছে গিয়াছি, অমনি এই বাঘ আসিয়া দিল আমাকে তাড়া। আমি দৌড়! বাঘও আমার পাছে পাছে দৌড়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে পাহাড়ের গোড়ায় যাইয়া পড়িলাম।

পালাবার আর পথ নাই। বাঘও একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। জানের ভয়ে কি আর করি? সামনে দেখিলাম একটি কচু গাছ। তার ডাল ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। বাঘও আমার পিছে পিছে উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে আরও উঠিলাম আরও উঠিলাম। বাঘও উঠিতে লাগিল। আমি উঠিতেছি—বাঘও উঠিতেছে, আমিও উঠিতেছি—বাঘও উঠিতেছে। তারপর আমাদের দুইজনের ভারে কচুগাছের ডাল গেল ভাঙিয়া। পড়িত পড়ি একবারে তোমার ভাইদের বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িলাম। তোমার ভাই-এর বউ আজ মুরগি পাক করিয়াছিল, আর চিতই পিঠা। তাই খাইয়া বাড়ি ফিরিলাম!'

গল্প শুনিয়া গোপ্‌পার বউ হসি গোপন করিয়া বলিল ও-মা! তোমাকে পাঠাইলাম গল্‌পের ছালা ফেলিয়া দিয়া আসিতে, আর তুমি কি না, আর এক ছালা গল্প মাথায় করিয়া বাড়ি ঢুকিলে।'

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম

বিমল কর

চাকরি থেকে রিটায়ার করলে মানুষ কেমন হাঁসফাঁস করে প্রথম দিকটায়। কারও শরীর ভেঙে যায়, কারও ব্লাডপ্রেসার চাগায়, কেউ বা সারাদিন বড়-বড় ঢেঁকুর তোলে, কাউকে আবার দেখেছি রাত্রে শোবার আগে কবিরাজ তেল মেখে ঘুমের সাধ্যসাধনা করে। প্রথম ধাক্কাটা সামলানো খুবই মুশকিল, সব কেমন ওলট-পালট হয়ে যায় বলেই বোধ হয়। এক-একজন এই বিশ্রী অবস্থাটা কাটাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে কাশী হরিদ্বার-বৃন্দাবন ঘুরতে; কেউ বা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কারও বা নেশা ধরে তাস-পাশায়। গাছপালা-বাগান কুকুর-বেড়াল, এসব নিয়েও কেউ কেউ মেতে ওঠে। গোড়ার ধাক্কাটা একেবারে সামলে নিতে পারলেই হল, তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে যায়।

আমাদের মহাদেব জ্যাঠামশাইকেই প্রথম দেখলাম, যেদিন চাকরি থেকে মুক্তি পেলেন, তার পরের দিন থেকেই আহ্লাদে আটখানা। ধানবাদে আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। বাবার বন্ধুর মতন। বয়েসে সামান্য বড় বলে বাবা তাঁকে দাদা বলতেন। আমরা বলতুম, জ্যাঠামশাই। বেঁটেখাটো মানুষ, গোলগাল চেহারা, গায়ের রঙ ফরসা। মাথার মাঝমধ্যিখানে সিঁথি করে চুল আঁচড়াতেন। সাবেকী গোঁফ ছিল তাঁর। মাথার চুল, গোঁফ দশ আনাই সাদা হয়ে গিয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের।

আমরা থাকতাম ভাড়া-বাড়িতে। জ্যাঠামশাইদের বাড়িটা ছিল নিজেদের। পুরনো বাড়ি। দোতলা। সংসারে মানুষ বলতে ছিলেন জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা আর ঠাকুমা। মাঝে-মাঝে দুমকা থেকে রাধাদি আসত বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে।

জ্যাঠামশাই আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমাকে একটু বেশি। আমার বাবাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন মনে করতেন।

এই জ্যাঠামশাইকে দেখলাম, চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তুড়ি মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না গেলেন তীর্থধর্ম করতে, না বসলেন তাম-পাশার আড্ডায়। তাঁর শরীর ভাঙল না, রোগটোগ কাছে ঘেঁষল না, যেমন কে-তেমন চেহারা নিয়ে জ্যাঠামশাই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বাবা বললেন,'মহাদেবদার ধাতই আলাদা। ও-মানুষ কি সহজে ভাঙেন!'

জ্যাঠামশাই যে ভাঙার পাত্র নন, সেটা আমরাও জানতাম।

একদিন কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল।

জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে গল্পটল্প করে চলে যাবার পরবাবা হাঁক দিয়ে মাকে বললেন, "শুনেছ, মহাদেবদা আশ্রয় খুলবেন।"

আশ্রমের কথা শুনে মা যেন খুশিই হলেন। বললেন, "ভালই হল। আমাদের এদিকে আশ্রমটাশ্রম নেই, ওই এক শিবমন্দির। আশ্রম খুললে তবু দুদণ্ড গিয়ে বসতে পারব। ঠাকুরের গানটান হবে।"

বাবা বললেন, "সে গুড়ে বালি। মহাদেবদা চিত্তশুদ্ধি আশ্রম খুলবেন।"

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা কী? চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটা আবার কেমন জিনিস?"

"বুঝলাম না,"বাবা মাথা নেড়ে বললেন, "ভেঙে কিছু বললেন না; তবে তোমার ঠাকুরদেবতার জায়গা বোধ হয় ওই আশ্রমে হবে না। দেখো কী হয়।"

আমরা ছেলেমানুষ। বড়দের কথায় কথা বলতে নেই। কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বলাইদের পাড়ায় একটা আশ্রম আছে; সেখানে মাঝে মাঝে উৎসব হয়। উৎসবের দিন আশ্রমে গেলেই ভিজে ছোলা, গুড়, বাতাসা, কলা, দু-এক টুকরো বাতাবি লেবু, চিনির মণ্ডা পাওয়া যায়। জ্যাঠামশাই ওইরকম একটা আশ্রম খুললে মন্দ হত না। মাঝে-মাঝে কিছু পাওয়া যেত।

জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রম সম্পর্কে তেমন কোনো কৌতূহল আমাদের তখন আর জাগল না।

এর কয়েকদিন পরে দেখলাম, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির নিচের তলা সাফসুফ হচ্ছে। তারপর এল বালি, সুরকি দু—চার গাড়ি ইট। মিস্ত্রী মজুর খাটতে লাগল। নিচের তলার ব্যবস্থা বেশ পালটে ফেললেন জ্যাঠামশাই। গোটা দুই ঘর হল, উঠোনে জলকলের ব্যবস্থা করলেন; ভেতর বাড়ি আর বাইরের বাড়ির মধ্যে একটা পাঁচিল গাঁথা হল। চুনকাম-টুনকামও হয়ে গেল একদিন।

এরপর দেখি দড়ির খাটিয়া এল গোটা ছয়েক। ধুনুরী ডেকে পাতলা পাতলা তোশক-বালিশ বানানো হল। শেষে একটা ছোট সাইনবোর্ডও লাগানো হল বাড়ির বাইরের দিকে। তাতে লেখা থাকল ঃ চিত্তশুদ্ধি আশ্রম।

বাবা বললেন, "মহাদেবদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুনছি উনি নাকি যত চোর-বাটপাড়-পাগল এনে ওই আশ্রমে রাখবেন। বাড়ির মধ্যে কী কাণ্ড! বউদি চেঁচামেচি করছেন, মাসিমা কাঁদছেন। কী পাগলামি বল তো!"

আমরা ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম, একটা অদ্ভুত কিছু হতে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই যেমন-তেমন মানুষ নন, নিশ্চয় অনেক ভেবেচিন্তে কাজ নেমেছেন। লোকে তাঁকে পাগল বলুক আর যাই বলুক, তিনি যা ঠিক করেছেন তা থেকে নড়বেন না।

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম সম্পর্কে আমাদের রীতিমতো কৌতূহল জাগল। পাড়ার লোকজনও দেখলাম জ্যাঠামশাইদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে, তাকিয়ে-দেখছে সাইনবোর্ডটা, হাসাহাসি করছে। কেউ বলছে, দত্তমশাই উন্মাদ হয়ে গেছেন। কেউ বা রসিকতা করে বলছে, দত্তবাবু নিশ্চয় হোটেল খুলবেন।

যা যা খুশি বলুক, আমরা তিন ভাইবোন কিন্তু জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে দুবেলা, আসা-যাওয়া করতে লাগলুম। জ্যাঠামশাইর মুখ গম্ভীর; ঠাকুমা চুপচাপ। জ্যাঠামশাই আগের মতনই হাসিখুশি। নিচের ঘরে তিনি একটা টেবিল পেতেছেন, টেবিলের ওপর রুলটানা খাতা, কলম, লাল নীল পেনসিল, একটা মোটাসোটা রুল আর দু-একটা বই রেখে অফিস-ঘর সাজিয়েছেন।

আমরা রোজ ঘুরঘুর করি ও-বাড়িতে। একদিন জ্যাঠামশাই আমাদের ডাকলেন। ডেকে নিচে অফিসঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমি, কালু আর লতু বেঞ্চিতে বসলাম।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'তোরা নিচের ঘরটার সব দেখেছিস ভাল করে?" তিনজনেই মাথা নাড়লাম। দেখেছি।

জ্যাঠামশাই বললেন, "কালু দুপুর থেকে আমরা আশ্রম লোক আসতে শুরু করবে। বগলাকে চিনিস?"

আমাদের এদিকে তিনজন বগলা আছে। একজন বাড়ি-বাড়ি কলের জল দেয় খাবার জন্যে; একজন পোস্টাফিসের পিয়ন; আর একজন থাকে বাজারে। আমি বললাম, "কোন্ বগলা?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "বাজারের বগলা।"

বাজারের বগলার বড় দুর্নাম। সে ফলমূল বেচে। তার দোকান নেই। রাস্তায় বসে শশা, কলা, শুকনো কমলালেবু, শাক-আলু এইসব বিক্রি করে। গরিব লোক। অল্পস্বল্প যা জোগাড় করতে পারে তাই বেচে দিন চালায়। লোকটা ভীষণ মানুষ ঠকায়। ছেলেমানুষ দেখলে তো কথাই নেই, ফিরতি পয়সাও কম দেবে। অচল পয়সাও চালিয়ে দেয়।

বগলার নাম শুনে আমি আঁতকে উঠে বললাম, "বগলা তো চোর জ্যাঠামশাই।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "চোর নয় লোভী। দু পয়সার জিনিস বেঁচে পাঁচ পয়সা পকেটে ভরতে চায়। আমি ওকে শুধরে দেব। ওর চিত্তশুদ্ধি দরকার।"

কালু বলল, "বাজারে গণেশ আছে সে আরও চোর।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "আমি সব লিস্ট করে ফেলেছি। ঘুরে ঘুরে, দেখে দেখে দশজনের লিস্ট করেছি। বগলাকেই প্রথম আনব। বগলার পরে আনব পঞ্চাকে।"

পঞ্চার নামে লতু সিঁটিয়ে গেল। বলল, "ও জ্যাঠামণি, পঞ্চা ভীষণ পাজী। ওর একটা পোষা নেউল আছে আমাদের স্কুলে যাবার সময় ভয় দেখায়।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "পঞ্চার মাথায় ছিট আছে খানিকটা। একসময়ে স্টেশনে মুসাফিরখানায় পড়ে থাকত। মালপত্তরও সরাত। পুলিশের হাতে শিক্ষা পেয়ে শুধরেছে অনেকটা ; তবু পুরনো অভ্যেস পুরোপুরি যায়নি। ওরও চিত্তশুদ্ধি দরকার।"

আমরা তিন ভাইবোনে মুখ চাওয়া-চটাওয়ি করে উঠে এলাম। কিন্তু তোর আর বলতে পারি না জ্যাঠামশাইকে।

বাইরে এসে কালু বলল, "চিত্তশুদ্ধি কেমন করে হয়?"

আমরা কিছুই জানতাম না। চুপ করে থাকলাম।

পরের দিন থেকে জ্যাঠামশাইয়ের চিত্তশুদ্ধি আশ্রম চালু হয়ে গেল। সত্যি সত্যি বগলা এসে আশ্রমে ঢুকল। একটা ছেঁড়া গামছা, মাথায় ফলের ছোট ঝুড়ি, ডান হাতে এক পুঁটুলি—বগলা বেশ হাসতে হাসতে আশ্রমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

বিকেলে একবার তাকে দেখতে গেলাম। গরম কাল। কার্বোলিক সাবান মাখিয়ে জ্যাঠামশাই তাকে স্নান করিয়েছেন, নতুন একটা ধূতি আর গেঞ্জি দিয়েছেন পরতে। বগলা স্নান করে, ধূতি-গেঞ্জি পরে বিড়ি টানছিল। আমাদের দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল। জ্যাঠামশাইয়ের চিত্তশুদ্ধি আশ্রমে জনা চারেক লোক সপ্তাহখানেকের মধ্যে জুটে গেল। বগলা, হাবুল, গিরিধারীর আর কেষ্টা। একজন ঠগ, অন্যরা ছিঁচকে চোর, পাগল। পঞ্চাকে জ্যাঠামশাই ধরতে পারেননি তখন।

আমাদের বাড়িতে, পাড়ায় ততদিনে একটা হৈ-হৈ পড়ে গেছে। চোর, ছ্যাঁচোড়, পাগল, এনে-এনে জ্যাঠামশাই বাড়িতে পুরছেন, তারা দিব্যি বিনি পয়সার দুবেলা, ডাল-ভাত-তরকারি খাচ্ছে, দড়ির খাটিয়ায় তোশক পেতে ঘুম মারছে, এরপর তো এরাই পাড়ার বাড়িতে-বাড়িতে চুরি-চামারি করতে বেরুবে।

কেউ বলছে, পাড়ার মধ্যে এসব চলতে দেওয়া যায় না। কারও কারও মত হল, থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে এলে ভাল হয়। বুড়োর দলই বেশি হই-হই করতে লাগল—চুরি-চামারির ভয় ছাড়াও পাড়ার একটা ইজ্জত রয়েছে, জ্যাঠামশাই সেই ইজ্জত নষ্ট করে ছাড়লেন।

দু-পাঁচজন জ্যাঠামশাইকে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, নিষেধও করলেন। জ্যাঠামশাই কোনো পাত্তাই দিলেন না। বললেন, "তোমরা আমার চরকায় তেল দিতে এস না। আমার বাড়িতে আমি যা খুশি করব, কারও কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।" পাড়ার লোক জ্যাঠামশাইযের ওপর চটতে লাগল। বাড়িতে জ্যাঠামশাইও রাগে গরগর করতেন। ঠাকুমা অবশ্য হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতেও দেখতাম বাবা বেশ অসন্তুষ্ট। বলতেন—মহাদেবদার মাথা খারাপ হয়েছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে কতকগুলো রাস্তার চোর-জোচ্চরকে পুষছেন। পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করে না।"

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম মাসখানকের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। চারের জায়গায় ছয় হয়ে গেল আশ্রমের সদস্য। নতুন দুজন এল স্টেশনের ওপার থেকে। একজনের

নাম ঝন্টু, অন্যজনের নাম মিশির। আরও দু-একজন নাকি খাতায় নাম লিখিয়ে গেল, পরে আসবে।

আমি আর কালু জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রমের ব্যাপার-স্যাপারগুলো দেখতে যেতাম। সকালে বগলারা ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করত, মুখ ধুয়ে উঠোনে গিয়ে বসত আসন করে, জ্যাঠামশাই নিচে নেতে আসতেন। জ্যাঠামশাইয়ের সামনে হাত জোড় করে বসে ওরা একটা বিদঘুটে শ্লোক আওড়াতে। জ্যাঠামশাই শিখিয়ে দিয়েছিনে। ওদের মুখের কথা কিছু বোঝা যেত না। গলার স্বরও অদ্ভুত।

এরপর থাকত বগলাদের ছোলা-মুড়ি-গুড়ের ব্যবস্থা। খেয়ে নিয়ে ওরা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে অফিসরের এসে দাঁড়াত। বগলাকে জ্যাঠামশাই টাকা দিতেন, কোনোদিন পাঁচ, কোনোদিন সাত। বগলা চলে যেত বাজারে। ফল কিনে বেচাকেনা করে আবার বেলা ফিরে আসবে। চুরিমারি করবে না। লোক ঠকাবে না। ফিরে এসে হিসেব দিতে হবে জ্যাঠামশাইকে। বগলার টাকা নিত গিরিধারী। সে যাবে তিলকুট, রেওড়ি, তিলের নাড়ু বেচতে। বগলা মতন তাকেও ফিরে এসে হিসেবপত্র দিতে হবে। হাবলু আর কেষ্টর মধ্যে পালা করে একজন যেত জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাজারে, অন্যজন আশ্রমের ঘরদোর পরিষ্কার করত, পাঁড়ে ঠাকুর রান্না করতে এনে জলটল তুলে দিতে। আশ্রমের রান্না হত নিচেই।

সন্ধের দিকে জ্যাঠামশাই তাঁর আশ্রমের লোকদের ধর্মকথা শোনাতেন, সৎ শিক্ষা দিতেন, মন্দ কাজ করলে মানুষের কী হয় তার ফিরিস্ত শোনাতেন।

মোটামুটি এইভাবেই চিত্তশুদ্ধি আশ্রম চলছিল। আশ্রমের লোকেরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই চেহারা পালটে ফেলতে লাগল। সাজপোশাক সকলের একরকম ছিল না। কেউ কেউ ধূতি পেয়েছিল, গেঞ্জি পেয়েছিল, কাউকে কাউকে জ্যাঠামশাই খাকি হাফ প্যান্ট আর ফতুয়া দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য আশ্রমে গেলেই কার্বোলিক সাবানের গন্ধ পেতুম, কখনো দেখেছি—পাঁচড়ার, মলম, নিমতেলের গন্ধ ছাড়ছে বাতাসে। কেষ্ট পাগল মাঝে মাঝে পালিয়ে যেত আশ্রম ছেড়ে, জ্যাঠামশাই তাকে ধরে আনতে সারা শহর ঘুরে বেড়াতেন। আনতেনও ধরে।

কার কতটা চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে জানবার আগেই একদিন শুনলাম বগলা পালিয়েছে। শহর ছেড়েই উধাও। হাবুল বলল, 'বাবুর কাছে পাঁচ টাকা নিলে ও চার টাকার ফল কিনত এক টাকা আগেই মারত। চার টাকার ফল বেঁচে বাবুর কাছে সাড়ে পাঁচ টাকার হিসেব দিত। আট আনা তার নামে জমত লাভ বাবদ।'

আশ্রমে অনাদির জায়গা হয়ে গেল।

বগলা পালাবার সপ্তাহ খানেক পরে গিরিধারীও পালাল। অবশ্য শহর ছেড়ে চলে গেল না। ঘাপটি মেরে থাকল। আশ্রম তার পোষাচ্ছে না।

পাগল কেষ্ট একদিন খেপে গিয়ে হাবুলের সঙ্গে এমন মারপিট করল যে, কেষ্টর কনুইয়ের জোড়াটাই গেল ভেঙে। তাকে রেলের হাসপাতালে রেখে আসতে হল জ্যাঠামশাইকে, তার চিৎকার আর সহ্য হচ্ছিল না জ্যেঠাইমার।

আশ্রমে আসবে বলে যারা নাম দিয়েছিল, আগেই জ্যাঠামশাই তাদের খুঁজতে লাগলেন। কেউ আর এখন আসতে চায় না। খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া সব ফ্রি। তবু কেন যে ওরা আসতে চাইছে না, জ্যাঠামশাই বুঝতে পারলেন না।

আমাকে বললেন, 'হ্যাঁরে, কী হল বল তো? ব্যাটারা নিজেরাই বলেছিল আসব, এখন আমায় দেখলেই পালায়।'

আমি বললাম, 'ভয়ে।'

'ভয়ে? কিসের ভয়ে?'

'তা জানি না। এখানে এলেই নাকি দাগী হয়ে যেতে হয়।'

'দাগী?'

'তাই তো বলছিস একদিন গিরিধারী। বলছিস, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলে যেমন দাগী চোর হয়ে যেতে হয়, এখানে থাকলেও সেইরকম হয়।'

জ্যাঠামশাই একটু ভেবেচিন্তে বললেন, 'বুঝেছি। আমরা পেছনে এনিমি লেগেছে।'

এর দিন দশেক পরে একদিন সকালবেলায় জ্যাঠামশাই হন্তদন্ত হয়ে বাবার কাছে এসে বললেন, 'সত্য আমার গালে ওই ছোঁড়াটা চড় মেরে পালিয়েছে!'

বাবা বললেন, 'সে কী! কোন্ ছোঁড়া চড় মারল?'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ওই যে অনাদি। সুশীল মিত্তিদের বাড়ি থেকে এসেছিল। ছোঁড়াটা নিজেই এসেছিল। তার কথাবার্তা হাবভাব আমার ভাল লেগেছিল। দিন কয়েক দেখেশুনে তাকে বাড়ির কাজে লাগিয়েছিলাম। তোমরা বউদিও দেখতাম ছোঁড়াকে পছন্দ করছে। তখন কি জানতাম ছোঁড়ার পেটে-পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি!'

'কী করেছে ছোঁড়াটা?' বাবা আসল কথাটা জানতে চাইলেন।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আজ সকালে উঠে বাজার যাব; দেখি আমার পকেট-ঘড়িটা নেই। ও কি আজকের ঘড়ি। আমার বাবামশাই দিল্লি দরবারের সময় কিনেছিলেন। সোনা রয়েছে এতে। দামের কথা বাদ দাও, ওটা আমার বাবার স্মৃতি। ছোঁড়াটাকে আমি এত বিশ্বাস করলাম, আর ও কিনা আমার ঘড়ি চুরি করে পালাল।'

বাবা বললেন, 'থানায় গিয়ে খবর দিন। আর তো কিছু করার নেই।'

জ্যাঠামশাই হায়-হায় করতে করতে চলে গেলেন।

এর দিন তিনেক পরে আবার সে ঘটনাটি ঘটল সেটা আরও অদ্ভুত।

জ্যাঠামশাই রাতের দিকে আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে তাঁর চুরি-যাওয়া ঘড়িটা দেখালেন। ঘড়ি ফেরত পেয়ে জ্যাঠামশাইয়ের যতটা খুশি হওয়া উচিত ছিল, অতটা খুশি তাঁকে দেখাচ্ছিল না।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কেমন করে পেলেন ঘড়িটা?'

জ্যাঠামশাই পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে বাবার হাতে দিলেন। বললেন, 'সুশীল আমায় খুব একটা শিক্ষা দিয়েছে।'

চিরকুটটা পড়ে বাবা হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'সুশীলবাবুই তাহলে তাঁর চাকর অনাদিকে আপনার আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন ঘড়ি চুরি করতে।'

জ্যাঠামশাই চুপ করে থাকলেন।

বাবার হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে জ্যাঠামশাই দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিলেন বাইরে। তুলে দেখি, সুশীলকাকা বড় বড় করে লিখেছেন 'ঘড়িটা ফেরত নেবেন। আমাকে ক্ষমা করবেন। অনাদি চোর নয়। আমার কথায় চুরি করেছিল। আপনার চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটি রাখবেন না তুলে দেবেন ভেবে দেখবেন।'

জ্যাঠামশাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সাধের চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটি তুলেই দিলেন।

কাকাতুয়া

মোহাম্মদ নাসির আলী

আমরা ছিলাম তিন ভাই—আমি, টুলু ও নীলু। আর ছিল আমাদের দু'বোন,—লিলি ও জলি। এর ভেতরে নীলুই ছিলো সবচেয়ে ছোট। কিন্তু সে ছিলো ভারী লোভী। দুচোখে যা দেখতো তা-ই সে খেতে চাইতো। তার ভয়ে ঘরে কোন ভাল খাবার জিনিস রাখার উপায় ছিলো না। একবার খোঁজ পেলে একাই সে সব সাবাড় করে দিতো—আমাদের কথা একটিবারও তার মনে পড়তো না বাড়ির সবাই বলতো ঃ নীলু ভারী লজ্জা করতো। সে মিটমিট করে শুধু হাসতো। প্রতিবাদ করতো না।

কিন্তু একদিন তাকে বড় জব্দ হতে হয়েছিল। দুপুর বেলা; সবাই গেছে ইস্কুলে। নীলু পড়তো বাড়িতে মাস্টারের কাছে। কেন জানি না, মাস্টারও সেদিন আসে নি। একা একা বেচারা নীলুর আর ভাল লাগছিলো না। মায়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো, মাও ঘুমিয়ে আছেন। গরমের দিনে দুপুর বেলাটা নীলুর কাছে ভারী বিশ্রী লাগে। একলা সময় কাটে না, শুলেও ঘুম পায় না।

এদিক ওদিক ঘুরে চুপি চুপি সে গিয়ে ঢুকলো খাবার ঘরে। তাকে উপর জমা রেখেছিলো এক থোকা লিচু। বেশ পাকা বড় বড় লিচু। নীলুর তো কথাই নেই, সবারই খেতে ইচ্ছা হয়। নীলুর মনে হলো, লিচু যেমন তার মুখে ভাল লাগে এমন আর কারো মুখে নয়। কিন্তু অত উঁচু তাক তো সে নাগাল পাবে না। তাই একটা চেয়ার টেনে টেনে তার উপর দাঁড়িয়ে একটি লিচু সে পেড়ে খেলো। যা মনে করেছিলো ঠিক তাই,—খেতে বেশ লাগে। প্রথমে মনে করেছিলো শুধু বড় দেখে বেছে একটিই সে খাবে। কিন্তু আরেকটি খেলে কি-ই বা এমন দোষের হবে। সে আরও একটি খেলো, তারপরও আরও একটি এমনি করে আরও—

এমন সময়, হঠাৎ নীলুকে ডাক দিয়ে ঘরের কোণ থেকে কে যেন বলে উঠলো। ঃ গেট ডাইন নটী ক্যাট। গেই ডাউন নটী ক্যাট।

হঠাৎ ভয় পেয়ে নীলু চেয়ার থেকে প্রায় পড়েই গিয়েছিল আর কী। পেছনে চেয়ে দেখলো, কেউ তো নেই—শুধু রয়েছে, আমাদের কাকাতুয়াটা।

কিন্তু এই কাকাতুয়াটি সহজ পাত্র ছিলো না। সে দিব্যি মানুষের মতই কথা বলতে পারতো। দুচারবার তাকে কথাটা শিখিয়ে দিলেই হলো। তারপর অনায়াসে সে তা অনুকারণ করতো।

আগে আগে মা নীলুর জন্য বাটিতে করে দুধ রেখে দিতেন তাকের উপর। বাড়ির মিনি বিড়ালটা প্রায়ই এসে সবটুকু দুধ চেটেপুটে খেয়ে জিভ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে করতে সাধুর মতো বেরিয়ে যেতো। মা একদিন যেতো। মা একদিন টের পেয়ে এক ফন্দি করলেন। কয়েক দিন বলে বলে কাকাতুয়াটাকে শিখালেন।—গেট ডাউন নটী ক্যাট। তার ফল হলো মিনিকে তাকের কাছে যেতে দেখলেই কাকাতুয়াটা বলে উঠতো ঃ গেট ডাউন নটি ক্যাট। তার চেঁচামেটি শুনে মা অনেক সময় ছুটে আসতেন। কোন দিন মিনি আর আগে ভয়ে পালতো।

তারপর—আজকে। আজকে এতদিন পরে নীলুকে তাকের উপর দেখে তার পুরোনো সেই শেখানো কথা মনে পড়ে গেছে। নীলু ভাবলো ভারী পাঁজী তো পাখিটা। মাকে বলে সব মাটি করে দেবে নাকি?

সে নেমে গিয়ে কাকাতুয়ার সঙ্গে ভাব করতে গেলো। আদর করে বললো ঃ দু-উ-উর বোকা পাখি! আমি কি ক্যাট? ক্যাট মানে তো বিড়াল। নটী ক্যাট মানে দুষ্ট বিড়াল। আমি তো এ বাড়ির নীলু—বুঝলি? কিছুক্ষণ ভেবে আবার বললো ঃ নীলু লিচু খেলো, মাকে বলো না।

নীলু জানতো, দুচার বার বলে দিয়েই কাকাতুয়াটি সে কথা বেশ মনে রাখতে পারে। তাই তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে সে আবার বললো ঃ নীলু লিচু খেলো, মাকে বলো না, এমনি করে কয়েকবার মনে করিয়ে দিয়ে সে এক মনে মিনি বিড়ালের মত মুখ মুছে বেরিয়ে গেল।

আমরা ইস্কুল থেকে ফিরে এলাম বেলা চারটের সময়। আধ ঘণ্টা পর মা সবাইকে ডেকে পাঠালেন টিফিন করতে। একযোগে সবাই গিয়ে খাবার ঘরে হাজির হলাম। নীলু কিন্তু গেল একটু পরে। আজ ওঘরে যেতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছিলো তার। অবশেষে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে সে ঘরে ঢুকলো। ভয়ে সে তাকের লিচুগুলোর দিকে চাইতে পারছিলো না। তবু আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলো, তেমনি পড়ে আছে সেগুলো কারো নজর সেদিকে পড়ে নি।

এমন সময় ঘটলো এক বিপদ। সে বিপদের কথা কখনও নীলু ভাবে নি। কাকাতুয়াটা এতক্ষণ বোধ হয় চুপচাপ ঘুমিয়ে ছিলো। হৈ চৈ করে এক সঙ্গে সবাই ঘুমে ঢুকতেই সে সজাগ হয়ে' উঠলো। তারপর নীলুকে তার দিকে চাইতে দেখেই সে এক কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ঃ নীলু লিচু খেলো, মাকে বলো না। নীলু লিচু খেলো, মাকে বলো না।

লজ্জায় নীলুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। বোকা কাকাতুয়াটার কি একটাও বুদ্ধি নেই; যা বলতে এত করে মানা করা হলো তাই বলছে। রক্ষা, আর কেউ ওর দিকে খেয়াল করে নি। কিন্তু এ বাড়ির কিছুর মার চোখ আর কান এড়াতে পারে না। নীলু ভয়ে ভয়ে একবার চোখে তুলে মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। দেখলো, যা

দেখেছিলো ঠিক তাই। মার মুখে-চেয়ে হাসি। একবার তিনি তাকের দিকে তাকাচ্ছেন, আরেকবার চাইছেন নীলুর মুখের দিকে। মায়ের কিছুই আর বুঝতে দেরী হয় না।

লজ্জায় আর অপমানে বেচারা নীলু কেঁদেই ফেললো। কেঁদে মায়ের পিঠে গিয়ে মুখ লুকানো। বুলু টুলুরা এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারে নি। এবার বুঝতে পেরে তারাও হাসতে লাগলো। মা সবাইকে ধমকে দিয়ে বললেন ঃ বেশ তো, তাতে, আর কি হয়েছে। নীলুর জন্যেই তে লিচুগুলো রাখা হয়েছিল। তা ছাড়া ও তো আর জানে না যে কাকাতুয়াটা এমনি করে ওর সঙ্গে নেমকহারামি করবে। নিজেরা তোমরা খেতে পাও নি বলে হিংসে করে হাসছো। নীলু আমার লক্ষ্মী ছেলে।

নীলুর কিন্তু এ পরাজয়ের লজ্জা কিছুতেই গেলো না। অনেকক্ষণ অবধি সে মাথা নিচু করেই রইলো।

এরপর নীলু কোনো দিনও আর লোভ করে নি। কিন্তু বদনামটা তবু তার সহজে ঘুচলো না। কারণ, পাজী কাকাতুয়াটা কিছুদিন পর্যন্ত তাকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠতো ঃ "নীলু লিচু খেলো, মাকে বলো না। নীলু লিচু খেলো, মাকে বলো না।"

যৌবনের অপ্সরী

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন

এক গাদা প্রেমপত্র। কাঠখোট্টা ইঞ্জিনিয়ার আমি, ইট কাঠ আর লোহা লক্কড় নিয়ে কারবার। ছাত্র জীবনে চুটিয়ে প্রেম করা দূরে থাক, দু'চারটা টসটসে প্রেমের গল্প পড়ারও সময় পাইনি। দিনভর ইমরাত আর রাস্তাঘাটের ওপর বই পুস্তুক নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফল। সে আমি লোকটার সামনে এখন প্রায় শ' সাতেক প্রেমপত্র। সবগুলো সুন্দর ভাবে একটা মোটা খামে পুরে সযত্নে রাখা বক্স রুমটার উঁচু তাকের ওপর। প্রথমদিকে চোখে পড়েনি আমার। ঘরদোর গোছাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে। হঠাৎ সেদিন গোটা কয় বাক্স পেটরা তাকটার ওপর উঠিয়ে রাখতে গেছি। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে পা উঁচিয়ে দেখি পুরু মোড়কটা। অনেকদিন ধরে ধূলো জমেছে ওটার ওপর।

নামিয়ে খুলে চিঠিগুলো দেখে আমার চোখজোড়া তো ছানাবড়া। দৃষ্টি গুর মত আটকে থাকলো সুন্দর হাতে গুছিয়ে লেখা অতিদীর্ঘ, কি সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলোর ওপর। প্রেমের সে কি গভীর আকুতি। ইনিয়ে বিনিয়ে ভালবাসা প্রকাশের সে কি দক্ষ প্রয়াস!

সারা দুপুর ধরে পড়েও শেষ করতে পারলাম না চিঠিগুলো। বিকেলের চা খাওয়া বাদ, বন্ধু ইবরাহীমের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো—সেটাও ক্যান্সেল করে দিলাম। গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে যখন শেষ চিঠিটা পড়ে শেষ করলাম, ঘড়িতে তখন রাত বারোটা দশ। রাতের খাবার ডাইনিং টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে ঘুমতে নিচে চলে গেছে বুড়ো বাবুর্চি।

কি বিচিত্র সব সম্বোধন চিঠিগুলোতে। কোনটায় 'প্রেয়সী আমার' কোথাও 'হে কবিতা মম', কোথাও 'প্রাণাধিকা প্রিয়া আমার' আবার কোথাও ছোট্ট করে 'মণি' কিম্বা লম্বা করে 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যে'।

এক নিশ্বাসে প্রায় গোটা পনেরো দামী নীল কাগজে লেখা চিঠি পড়ে ফেললাম। কোন কোনটি এক দিনের ব্যবধানে লেখা, আবার কোন কোনটিকে একই দিনের তারিখ—মানে ভালবাসার ব্যাকুলতায় প্রেমিক, একই দিনে একাধিক চিঠি লিখে পাঠাচ্ছে তার মানস প্রিয়াকে। 'মানস প্রিয়া' কথাটা আমার মত রসকসহীন ছোবড়া মার্কা শালীর মাথায় আসবে না। ওটা 'আমার শালিক পাখিকে' লেখা প্রেমপত্রগুলো থেকেই চয়ন করা।

প্রেম আর ভালবাসার এতো যখন আকুতি, তখন পত্র প্রেরক ও প্রাপকের নামধাম জানবার জন্য কৌতূহল আমার বাড়তে থাকলো লিপিগুলো পড়তে কিন্তু এদের দু'জনের আসল পরিচয় নেই যে কোথাও।

যাক। পাওয়া গেলো শেষটায়। প্রথমে রমনীয় নামটা। ওকে 'আমার আরাধ্য রাধা' বলে সম্বোধন করেছে পত্র লেখক। মেয়েটা ত' হলে হিন্দু? চার পৃষ্ঠায় দীর্ঘ চিঠির শেষপ্রান্তে লেখা 'তোমার প্রেমপূজারী গোপাল।' ও! ছেলেটাও তাহলে মেয়েটার জাতভাই?

ধ্যেৎ! আরো চিঠির ব্যবধানে দেখি, 'ওগো আমার স্নিগ্ধ অধরা জুলিয়েট।' এক পাতার লিপি। শেষটায় লেখা 'তোমার প্রসাদের ব্যালকনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা রোমিও।' তা'হলে? হিন্দু নয় ওরা? খৃষ্টান তবে? বাঙ্গালী খৃষ্টান—জুলিয়েট আর রোমিও।

চুপ করে ভাবতে থাকি কিছুক্ষণ। রাধাকৃষ্ণের ওপর কীর্ত্তন শুনেছিলাম সেই স্কুল জীবনে বৈরাগীর আখড়ায় গিয়ে। দারুণ লেগেছিলো সারারাত জেগে রাধা আর গোপীবালাদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী শুনতে। একটু একটু করে মনে পড়লো, কৃষ্ণের আরেক নাম গোপাল না? মাঠে গরু চরাতে চরাতে বাঁশী বাজাতো গোপাল, আর সে বাঁশীর মূর্চ্ছনায় আকুলি-ব্যাকুলি হয়ে উঠতো রাধার মনপ্রাণ। গোপীবালাদেরও।

বুঝেছি, আমার এ প্রেমিকপ্রেমিকা হিন্দু নয়, খৃষ্টানও নয়। আরো কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলি মনে মনে। শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েটের কেচ্ছা শুনেছিলাম এক রুমমেটের কাছে। ও ব্যাটা সিনেমায় গিয়ে ছবিটা দেখে এসেছে পড়া ফাঁকি দিয়ে। আমরা যখন একটা বিল্ডিংয়ের ডিজাইন নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলাম, ও-ছোঁড়া তখন তির-চার ঘণ্টা রূপমহলে কাটিয়ে এলো। পরীক্ষায় তিন কাঠি পেয়েছিলো ও, আর আমি সগৌরবে এক কাঠি। সে অন্য কথা, বন্ধুটির কাছে শোনা শেক্সপিয়ারের কথা মনে পড়ে গেলো। আসলে ওরা খৃষ্টানও নয়। ভাবাবেগে নাটকটির প্রিয়াকে জুলিয়েট আবার মাঝের প্যারাগ্রাফগুলোতে জুলি বলে সম্বোধন করেছে প্রেমিক, আর নিজেকে পরিচয় দিয়েছে রোমিও হিসেবে।

'তোমার সেবাদাস রোমিও মরে যাবে যে তোমাকে না পেলে' ইত্যাদি।

ভুলটা পুরোপুরি ভাঙলো, যখন পরের একটা চিঠিতে দেখলাম, সম্বোধনে রয়েছে 'আমার সোনামানিক লাইলী,' আর শেষে রয়েছে 'ভালবাসার চিরকাঙাল মজনু।' বুঝলাম, চিঠির ভেতরটা স্লো মোশনে বার বার পড়ে, 'লাইলীর মোহব্বতে

দেওয়ানা মস্তানা হয়ে গেছে ওর প্রেমের ভিখারী কায়স। প্রকৃতপক্ষে মেয়েটা লাইলীও নয়, আর তরুণটা মজনুও নয়। এখানেও ছদ্মনাম দু'জনের।

ঢাকা থেকে বদলি হয়ে এসেছি এ বিভাগীয় শহরটায়। এখানেও কঠিন সমস্যা বাসস্থানের। মাসেক কাল রেস্ট হাউসে রেস্টলেস অবস্থায় কাটিয়ে অনেক চেষ্টাতদ্বির করেও যখন কোন সরকারি কোয়ার্টার জোটাতে পারলাম না, তখন বাধ্য হয়ে শহরের শেষ মাথায় এ পড়ো বাড়িটা ভাড়া করলাম। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের নীল কুঠি মার্কা বাড়ি, মালিকটাও একটা আশি বছরের পূরাকীর্তি। দন্তহীন মাড়ি বের করে কেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। খালি পড়ে ছিলো বাড়িটা প্রায় ছয় মাস। চামচিকে আর আরশোলা তাড়াতেই আমার একশ টাকার ডি-ডি-টি পাউডার লেগে গেলো।

তবুও বেশ ভাল লাগলো বাড়িটার নিরিবিলি পরিবেশ। সামনের খোলা চত্বরে পাখপাখালির কিচিরকিমির শোনো, দেশী ফুলের গন্ধ সোঁকো, আর রাত হলে অন্ধকার বারান্দায় বসে আকাশে জোৎস্নার ঢল দেখো। বুড়ো বাবুর্চিটাও সামাল দিচ্ছিলো বেশ ওর তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে মনিবকে।

প্রেম পত্রগুলোতে ফিরে আসা যাক। দীর্ঘ সাত বছর ধরে লেখা সাত শ'র ওপর চিঠি। সবগুলো তারিখ অনুযায়ী সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা মোটা সুতো দিয়ে বেঁধে। বেশির ভাগই নীল কাগজে লেখা, কিছু কিছু গোলাপী কি কচি কলা পাতা রং কাগজে ইনিয়ে বিনিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে লেখা। কয়েকটা চিঠির দু'পাতার মাঝখানে গোলাপের পাপড়ি সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়ে আছে আজ এতটা বছর পরও। শুধু রং আর গন্ধটাই মিইয়ে গেছে দীর্ঘকালের ব্যবধানে। শুকিয়ে গেলেও চেনা যায় যে ওগুলো গোলাপেরই পাপড়ি।

প্রায় চিঠিই মুক্তোর মত গোলগোল হস্তাক্ষরে সুন্দর করে লেখা। মাঝে মাঝে দু'চারটা কেবল সংক্ষিপ্ত আর লেখাগুলো যেন কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং। শার্লক হোম্‌স্‌য়ের গল্পের কথা মনে পড়ে গেলো, দ্রুতগামী ট্রেনে বসে লেখা অক্ষরগুলো হিজিবিজি আর অসমঞ্জস হয়ে যেতে বাধ্য। পড়ে দেখলাম, আমার অনুমান একদম ঠিক, মেল ট্রেনে বসে কাঁপা হাতে প্রেয়সীকে লিখেছে প্রেমিক, তাকে সদ্য ছেড়ে আসা বিরহে বেচারার সে কি তড়পানি! টাংগা বড়শিতে গেঁথে যাওয়া মাছের মত মহাছটফটানি হতভাগ্য রোমিও কি কৃষ্ণ কি মজনুর। চলন্ত মেইল ট্রেনে বসেও লিখে ঠিক ঠিক জংশণ স্টেশনে পোষ্ট করেছে টানা হাতে লেখা চিঠি।

অর্ধেকের মত চিঠি পড়া হয়ে গেলে বুঝলাম, দীর্ঘ তিন বছর ধরে গভীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে দু'জন। প্রেমিকাটির চিঠির গাদা প্যাকেটটায় না থাকলেও বুঝতে বাকী রইলো না আমার, শ্রীরাধিকার পত্রগুলোও ছিলো ভালবাসার রসে টইটম্বুর। তারপর বিয়ে হয়েছে দু'জনের প্রজাপতির আশীর্বাদে! কিন্তু কার্যোপলক্ষে স্বামীটিকে চলে যেতে হয়েছে ঢাকা শহর ছেড়ে সিলেটে। সেখানে দীর্ঘ দেড় বছর থাকতে হয়েছে, 'সোনা আর মানিক আমার' কে ছেড়ে। তারপর, 'তোমার দাসানুদাস'

মিলিত হয়েছে ভার্সিটির পড়া শেষ করা 'বক্ষপ্রিয়ার' সঙ্গে। মিলনটা মাত্র ছয় মাসের চিঠির তারিখ মত, 'বিরহের হোমানলে জ্বলে পুড়ে ছাই হওয়া' দীর্ঘ দু'বছরের অন্যে।

প্রাক্‌বিবাহকালীন চিঠিগুলো দারুণভাবে রোমান্টিক। অনেকটা প্লাটোনিক লাভে পীড়িত ছিলো প্রেমিক। প্রিয়ার সান্নিধ্য, তার দীর্ঘ আলুলায়িত কেশের সুরভি, তার হরিণ চোখের চকিত চাউনি, চম্পক অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শ, বুলবুলির গানের রেশভরা কণ্ঠস্বর, সমস্ত মনপ্রাণ ভরে তুলতো দয়িতের, রাতভর ছটফট করতো বেচারা বিনিদ্র শয্যায়।

দু'বছরের মাথায় একটু একটু সাহস বাড়তে থাকলো তরুণটিরও বোধ হয়। কারণ এখন থেকে দেহজ প্রেমের মৃদু আভাস আসতে থাকলো লেখাগুলোতে। প্রথমে প্রিয়ার 'পাপড়ি কোমল চোখের পাতায় অধীর ঠোঁটের মৃদু স্পর্শ' দিয়ে শুরু, তার কিছুকাল পর ওর 'কমলার কোষের মত রসটসটসে অধরপুটে অধীর চুম্বনের, 'উল্লেখ। সাদীর আগখানটায় দয়িতাকে 'অক্টোপাশের মত কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে' ওর 'কপোল-কপাল নাক-চোখ, ওষ্ঠ-চিবুক, কণ্ঠা-গ্রীবা' সবটাতে 'লক্ষ কোটি চুম্বনের বৃষ্টিপাত।'

কণ্ঠা তকই পত্র লেখক। বিয়ের আগখানটায় আর নিচে নামেনি।

ওটুকুই কি কম ডোজ নাকি আমার মত পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কুমার যুবকের জন্য? পড়ছি আর অপূর্ব পুলকে শিউরে উঠছি। পড়ছি বলা ঠিক হবে না, কখনো গোগ্রাসে গিলছি আবার কখনো বানান করার মত করে স্লোমোশনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ছি। শুরু করেছিলেম বিছানায় শুয়ে গা এলিয়ে দিয়ে, কখন যে উত্তেজনার চোটে ওঠে বসেছি, নিজেই টের পাইনি।

হায় ভগবান! বিবাহ-উত্তর চিঠিগুলো একদম মলাটহীন। দেহজ কামনা বাসনার সে কি উচ্ছ্বাস স্বামীটার! আদিরসের সে কি ছড়াছড়ি প্রতি ছত্রে চিঠিগুলোর। এখন আর 'সোনামনি লক্ষ্মীটি আমার' সম্বোধন নয়, 'ওগো বিবস্ত্রা দ্রৌপদী মম' দিয়ে শুরু। ভুরুর বর্ণনা ছেড়ে উরুর সে কি রসাল ব্যাখ্যান। 'শৃঙ্গারে তুমি বৃষ্টিস্নাত বৃন্দাবনে পুলকিত ময়ুরী' স্মৃতিচারণ করছে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ছেড়ে আসা হতভাগা স্বামীটা, 'মিলন শেষে তুমি বাত্যাবিধ্বস্ত চারণভূমি।' মাঝখানেনর বর্ণনাগুলো যেন দীর্ঘ, তেমন অশালীন। ভাবতেই শিরা-উপশিরা আমার শিরশির করে উঠলো।

'যক্ষ প্রিয়ার' বক্ষদেশের উপমা নির্বাচনেও দারুণ পারঙ্গম স্বামীটা। কোন চিঠিতে সে দুটো বাংলাদেশের জোড়া কচি ডাব,কোটাতে স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকলি সে অমূল্য রত্নদ্বয়, কোথায়ও তার উপমা কান্দাহারের পরিপক্ক দাড়িম্ব।

প্রিয়তমা স্ত্রীর তলপেটে মাথা রেখে শুয়ে আছে ক্লান্ত স্বামী। কান পেতে শুনছে তার নাড়ির স্পন্দন, চঞ্চল হাত দিয়ে স্পর্শ করছে নাভিসন্ধি। ইচ্ছে করছে, ওটার ছিদ্রপথ ধরে এলিসের যাদুর দেশে হারিয়ে যায় প্রেমরোগে পীড়িত স্বামী, আহরণ করে আনে দয়িতার দেহের রহস্যপুরী থেকে অমুল্য সব রত্নরাজি।

স্ত্রীর দেহের গোপন পরিচ্ছদটার ব্যাপার স্যাপার এতোই গোপনীর ও ব্যক্তিগত যে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করতে ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছে আমার। বারবার পড়েছি অবশ্য সে সব অংশগুলো অসম্ভব রকম কৌতূহল নিয়ে। কি খোলামেলা সব কথাবার্তা। দেহজ কামজ প্রেমের সে কি অপূর্ব ধারা বর্ণনা!

পত্রলেখকের দেহের দান যেন ছড়িয়ে পড়লো আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার ভালবাসা খেলাখেলির কথা পড়তে পড়তে। হাত-পা'র তালু যেন দুপুর বেলাকার সাহারা মরুভূমির বালুরাশি, পুড়ে যাচ্ছে সেগুলো। নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে ড্রাগন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছাড়ছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ আমার। কত বার যে ঠাণ্ডা পানি খেলাম মাটির ঘড়া থেকে, মনে নেই ঠিক। বরফ পেলে মাথার তালুতে আইস ব্যাগ চেপে ধরতাম।

কে এই মহাপ্রেমিক? কেই বা তার রূপসী বাংলা?' দু'জনের আসল নাম তো প্রায় সাড়ে ছয়'শ চিঠি পড়েও পাওয়া গেলো না।

কৌতূহল আমার তুঙ্গে। এবার পড়া ছেড়ে পরবর্তী চিঠিগুলোর পাতা উল্টাতে থাকলাম। ইউরেকা! হঠাৎ চোখের সামনে একখানা ইংরেজিতে খেলা লিপি। ইংরেজিতে সম্বোধন 'মাইডিয়ার মনোয়ারা', শেষ প্রান্তে ইওর্স ইত্যাদি সাইদ আহমদ।

ধুত্তুরি ছাই। কি বেমানান নাম মহিলার। মনোয়ারা! একদম দু'শ বছর আগেকার দাদীনানীর নামে নাম রাখে কোন মর্ডান বাপ-মা? সে হিসেবে বরং পুরষটার নামটা বেশ আধুনিক। সাইদ আহমদ—চমৎকার নাম।

একটু যেন হোঁচট খেলাম। ইংরেজীতে রেখা চিঠিখানা পড়ে ফেললাম এক নিশ্বাসে! রসকসহীন সংক্ষিপ্ত একটা ছোবড়া যেন পত্রখানা। পর পর চারখানা চিঠি লিখেও বিবির কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে অভিমানী স্বামী রাগ প্রকাশ করে বিজাতীয় ভাষায় জানিয়েছে, ভাষায় জানিয়েছে, 'এ আমার শেষ চিঠি। যদি আগামী তিন দিনের মধ্যে তোমার কোন সাড়া না পাই, তা হলে এক ডজন ঘুমের বড়ি মুড়কি মুড়ির মত চিবিয়ে খেয়ে...'

আর পড়তে পারি না। ভয়ে আঁতকে ওঠে আমার সারা শরীর। শেষকালে আত্মহত্যা করলো নাকি বেচারা স্বামীটা?

ধেৎ! মরবে কেন ও? মরে গেলে ফাইলে এর পরেও অত্তোগুলো চিঠি থাকবে কেন?

পরের চিঠিটা পড়ে বুঝলাম, ডাকের গোলযোগের জন্য 'স্ত্রীর মণির' তিনখানা চিঠি দেরীতে একসঙ্গে এসে পৌছেছে স্বামীটির কাছে। আর সেগুলো পড়ে 'আনন্দে পুলকে আত্মহারা হয়ে' তরুণ পুরুষটি 'চুম্বনের বৃষ্টিবর্ষণ' ভরে দিয়েছে 'অনন্তযৌবনা চিরনবীনা প্রেয়সীর সারা শরীর।'

'অনন্তযৌবনা চিরনবীনা প্রেয়সী'—সংস্কৃত মন্ত্রের মত বারবার আওড়াতে বেশ মজা লাগলো আমার—কুমার বরকতউল্লাহর। 'তিলোত্তমা' কে স্বচোখে দেখার জন্য উৎসাহে ছটরফটর করতে লাগলাম।

ক'দিনের মাথায় একটা সরকারি কাজ ফেলে ঢাকায় চলে এলাম। আমার বাড়িওয়ালা বুড়োর কাছ থেকে সহজেই সাইদ আহমদের ঠিকানা পাওয়া গেলো। পুরাকীর্তি মহলটায় ভাড়াটিয়া ছিলেন উনি স্থানীয় কলেজে যখন সরকারি অধ্যাপক ছিলেন। এখন অধ্যাপক হয়ে প্রমোশন পেয়ে ঢাকায় বদলি হয়ে গেছেন। বাংলার অধ্যাপক অমুক কলেজে। পত্রে যোগাযোগ রয়েছে এখনো বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে সাইদ পরিবারের।

হ্যান্ড ব্যাগে আমার চিঠির মোড়কটা বাক্সবন্দী। কলিং বেল টিপতেই খোলা দরজাটা ফাঁক করে এক ভদ্রলোক বলেন 'কাকে চান?'

'প্রফেসর সাইদ আহমদ কি আছেন?'

'জ্বী। আমিই সাইদ আহমদ।'

'আমার নাম বরকতউল্লাহ। রাজশাহী থেকে এসেছি। আপনার সঙ্গে—'

'আসুন। ভেতরে আসুন।'

মাঝ বয়েসী ভদ্রলোক। মাথার চুল দশ আনা পেকে গেছে। চোখে পুরু চশমা। বেশ রাশভারী চেহারা। চা খাচ্ছিলেন। সোফায় বসে সস্ত্রীক। উল্টো দিকে উপবিষ্ট মহিলাকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, ইনই মিসেস সাইদ আহমদ।

কিন্তু! কিন্তু এ মহিলা তো সে মহিলা নয়। এ যে এক ভুটকি মুটকি বাঁটকু রমণী। স্বামীর পাশে বেমানানভাবে খাটো আর স্থূল, চেহারাটা পাকা চালতার মত এবড়োথেবড়ো, বলদের মত হাবাগোবা চোখজোড়ায় অর্থহীন চাউনি, পানের রসে গিল্টিকরা অসমঞ্জস দন্তরাজির নিচে একটা হ্রস্ব রসা, মেদের ভারে ঘাড়টা ফুলে গর্দান হয়ে গেছে। ঠোঁটজোড়া ট্রাকের টায়ারের মত শক্ত।

চোরা চোখে মহিলাকে দেখে হতাশ হয়ে গেলাম। তবে কি প্রথমা স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের এন্তোকালের পর মাঝ বয়েসী প্রফেসর একাকীত্বের ভার সইতে না পেয়ে এ তাড়কা রাক্ষসীর পাণি গ্রহণ করেছেন? মাথায় আমার জিগস পাজ্‌লের জট। ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিনা চা গিলতে গিলতে। ইন্নালিল্লাহ পড়লাম মনে মনে প্রফেসরের জান্নাতবাসিনী স্ত্রীর জন্য।

আপ্যায়ন শেষ হলে বললাম, 'প্রফেসর সাহেব। আপনার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা ছিলো। সেজন্যই আপনার বাসা তক আসা।'

'ও-তাই!' স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করেন সাইদ আহমেদ, 'মনো, তোমাকে একটু ভেতরে যেতে হয়। উনি—'

মনো! মনো স্ট্যাণ্ডস ফর মনোয়ারা। তা হলে? এই কি সেই চিঠির রমণী? দীর্ঘ সাত বছর ধরে এ মহিলার—এ আগ্‌লি অসুন্দর নারীর প্রেমে উন্মাদ হয়ে রয়েছিলো সাইদ আহমদ? কলাগাছের মত মোটা দু'হাত, তালের কোসা নৌকার মত ভরাট দু'পা—এ কেমন করে 'মোনালিসা হাসি' হেসে পাগল করে ফেলতো ভদ্রলোককে?

স্টেঞ্জ! লাইফ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। হতাশ হয়ে হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেতর ঘরের পর্দার দিকে চেয়ে থাকলাম আমি। ছেলেমেয়েদের কোলাহল

সেখানে। মনোয়ারা বেগম ভেতরে উঠে গেলে চিঠির পোলাটা ব্রিফ কেস থেকে বের করে সাইদ আহমদের সামনে রেখে বল্লাম, 'এগুলো বোধ হয় আপনাদের প্রাইভেট চিঠিপত্র। ভুলে রাজশাহীর বাসাটায় ফেলে এসেছিলেন।'

মোড়কটা টেনে নেন প্রফেসর, 'জ্বী জ্বী। সরি। থ্যাঙ্ক ইউ। কষ্ট করে ও-গুলো এতদূর বয়ে আনলেন আপনি। অনেক ধন্যবাদ।'

মুখে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বললেও মনে হলো ভদ্রলোক একটু যেন রুষ্ট হলেন। পুরনো চিঠিগুলো ফেলে টেলে দিলেই বোধ হয় খুশি হতেন।

অপ্রয়োজনীয় বলেই কি ও-গুলো ছেড়ে এসেছেন মনোয়ারা বেগম?

উঠি উঠি করেও উঠতে পারলাম না। শেষটায় শুকনো ঠোঁট চেটে আমতা আমতা করে বললাম,'আমাকে মাপ করতে হবে। একটা ব্যাপারে—'

কথা শেষ করতে দেন না সাইদ আহমদ, 'বুঝতে পেরেছি। আপনি কৌতূহলের বশে চিঠিগুলো সব পড়ে ফেলেছেন—'

'জ্বী। আই এ্যাম সরি—'

'আর ভাবছেন হতাশভাবে, 'আমাকে আপাদমস্তক দেখেন অধ্যাপক, 'আর ভাবছেন এ অসুন্দর রমণীর জন্যে এতো প্রেম কোত্থেকে এলো আমার ভেতরে।'

'হেঁ হেঁ। জ্বী জ্বী।' লজ্জায় মুখ রাঙ্গা শশা হয়ে ওঠে আমার। মনের অবস্থাটা ধরে ফেলেছেন ভদ্রলোক।

'যৌবন! মিষ্টার বরকতউল্লাহ, যৌবন!' গালে ভাঁজ ফেলে এক মুখ হাসির বোম ফাটান প্রফেসর, 'যৌবনে কুক্কুরীকেও অপ্সরী মনে হয় যে সাহেব।'

৪-৬.১০.১৯৮৬

সিনিয়র এপ্রেনটিস

সৈয়দ মুজতবা আলী

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরোনো হয় তাদের কদর ততই বেড়েয় যায়। নতুন যুগের লোক যেসব গ্রন্থ থেকে নতুন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা আর সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ওই একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল—কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়তো অনেকেই জানেন—তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারি এপ্রেনটিস, মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকপাকি চাকরি, মাইনে সব কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়োবাবু সেটা নিয়ে দিলেন তাঁর শালির ছেলেকে, সে কখনো এপ্রেনটিস করেনি। বড়োবাবু গণেশকে ডেকে বললেন, বাবা গণেশ, কিছু মনে কোরো না। এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।

কাকস্য পরিবেদনা আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়োবাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেনটিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়োবাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের-দু এক গাছায় পাক ধরল, পরনের ধূতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনোগতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাস করে দেয়, আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড়ো সাহেব একদিন বড়োবাবুকে দোতলার ডেকে বললেন, আমায় একটা জরুরি রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্‌টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।

দারোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়োবাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, কিন্তু মনে কোরো না, বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হইহই রইরই। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কোপ্পিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে বার্থ—ডে-সুট'—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ, পাগল করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড়ো সাহেবের ঘরে। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও গিয়ে ঢুকছে বড়োসাহেবের ঘরে। চিৎকার চ্যাঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং -টিল্‌টিং চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি তাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস!

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সায়েব তো রেগে কাঁই। বড়োবাবুকে ধরে তো এই-মার কী তেই-মার লাগান আর কী। বলেন, তুমি একটা ইডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমারই মতো একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায়, সে ডাকো তাকে। গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সাহেব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইউ প্রাইজ ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?

গণেশ বড়ো বিনয়ী ছেলে। বললে, আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেনটিস। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাব কী করে?

সাহেব তো সাত হাত পানিমেঁ। বললেন, হোয়ারু, মিন বাই দ্যাট?

গণেশ বলল, হুজুম, আমি তিন বছর ধরে এ আপিসে এপ্রেনটিস করছি। খেতে পাইনে, পরতে পাইনে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই তাই যখন এঁকে দেখলুম আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেনটিস। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেনটিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেনটিস হয়েছেন।

অপরূপ কথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মস্ত বড়ো রাস্তা—

একালের নয়, সেকালের। সুতরাং লোকলশকর সৈন্য—সামন্ত হাতি-ঘোড়া বিস্তর, তার আর লেখাজোখা নেই।

রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যেতে সারাদিন লেগে যায়। অবশ্য একটু বেলা করে বেরোতে হয়। মাঝে ঘন্টা আষ্টেক জিরিয়েও নিতে হয় বই কী!

হাতিশালে হাতি...হাতি ছিল আপাতত মরে গেছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া কিন্তু আছে, বুড়ো হয়ে বাতে আর চলতে পারে না, কিন্তু তা হোক চিঁহি চিঁহি করে ডাকে—খাবার না পেলে।

লোকলশকর তো বলেছি খেলাজোখা নেই। হাঁক দিলে অমন পিলপিল করে চার-পাঁচজন বেরিয়ে পড়তে পারে, সব সময়ে অবশ্য বেরোয় না। মাস কয়েক মাইনে না পেয়ে একটু বেয়াড়া হয়ে পড়েছে। সুতরাং মস্ত বড়ো রাজা।

রাজার জমকালো দরবার। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র-মিত্র, প্রহরী প্রভৃতি রাজাকে ঘিরে আসর জমিয়ে বসে থাকে। প্রভৃতি অবশ্য একজন ছোকরা চাকর। তাকে নিয়ে হল ছয়-জন।

মন্ত্রী সবসময় থাকতে পারেন না, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে তাঁকে বাজার-টাজার করে আনতে হয়। কোটাল রান্না চড়িয়ে সময় পেলেই কিন্তু এসে বসেন। পাত্র-মিত্র ঠায় বসে থাকেন। তাঁদের একজনের বাত আর একজনের হাঁপানি দরবারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করলে বাড়ে।

রাজসভায় রাজকার্য চলে সারাদিন।

গোমড়া মুখে সবাই বসে থাকেন। রাজা থেকে থেকে পিঠের জামা তুলে ডাকেন, মন্ত্রী!

ব্যস, আর কিছু বলতে হয় না। মন্ত্রী বজ্রগম্ভীর হাঁক দিয়ে ডাকেন, প্রহারী! প্রহরী এসে লম্বা কুর্নিশ করে ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে দেয়।

মন্ত্রী রাজার পিঠ চুলকে দেন।

খানিক বাদে রাজা বলেন, হুঁ!

মন্ত্রী চুলকানো থামিয়ে প্রহরীর হাতে ঝিনুক ফিরিয়ে দেন। প্রহরী আবার কুর্নিশ করে ঝিনুক ট্যাঁকে গুঁজে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

আবার সব চুপচাপ। খানিক বাদে রাজা মন্ত্রীর দিকে কটকট করে তাকিয়ে বলেন, মন্ত্রী!

কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রী বলেন, হুজুর!

তোমার গর্দান যাবে জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

কেন জান?

রাজা ধমক দিয়ে বলেন, কী? জান না?

মন্ত্রী শশব্যস্ত হয়ে বলেন, আজ্ঞে জানি।

বলো কেন?

মন্ত্রী আমতা আমতা করেন।

রাজা ধমক দিয়ে বলেন, অকর্মণ্য। গাধা! এত বড়ো একটা রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কেন তোমার গর্দান যাবে তা তুমি বলতে পার না?

মন্ত্রীর হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়। বলেন, হুজুর, এত বড়ো রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে এই সামান্য কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব? এ হলো কোটালের কাজ!

রাজা বলেন, 'হুঁ, ঠিক বলেছ। বলো কোটাল!

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে কোটাল থপ করে বসে পড়ে।

কোটাল কানে একটু খাটো। শুনতে পায় না। মাথা নিচু করে নিজের মনে বিড়বিড় করে।

রাজা আবার হাঁক দেন, কোটাল!

এবার কোটাল শুনতে পায়, লাফ দিয়ে উঠে কুর্নিশ করে বলে, হুজুর!

কেন মন্ত্রীর গর্দান যাবে?

কিন্তু তাতে হয় না। অগত্যা কোটালের কানটা ধরে তার কাছে টেনে মন্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলতে হয়, কেন আমার গর্দান যাবে রাজা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন।

এক গাল হেসে এবার কোটাল বলে, আজ্ঞে, এর আগেই যাওয়া উচিত ছিল, ওর মুখখানা যা বিশ্রী।

মন্ত্রীর চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

রাজা বলেন, চোপ, হল না।

রাজা বলেন, বলতে পারবে তাঁর বকশিশ মিলবে, ভুল হলে গর্দান।

সবাই সবার মুখে পানে চায় কেউ রা করে না।

রাজা এক-এক করে জিজ্ঞাসা করেন। কেউ কথা না। সব শেষে ডাক পড়ে ছোকরা চাকরের।

ছোকরা চাকর একা একাই মেঝেয় বসে তাস নিয়ে পেটাপিটি খেলে। রাজার ডাকে মুখ না তুলেই বলে, আজ্ঞে চুলকানো বেশি হয়েছে, আপনার পিঠ জ্বালা করছে।

ঠিক।

সবাই মাথা নেড়ে বলে, ঠিক হতভাগা আগে না বললে আমরাও বলতে যাচ্ছিলাম।

রাজা বলেন, নাও বকশিশ!

ছোকরা চাকর মাথা না তুলেই বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়। রাজা এক-পকেট ও-পকেট খুঁজে শেষকালে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আস্ত টাকা আর করে দেয়।

ছোকরা চাকর সেটা ঠং করে মাটিতে ঠুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, এটা অচল।

রাজা টাকাটি আবার পকেটে পুরে বলেন, আচ্ছা কাল নিয়ো।

তারপর আবার চুপচাপ।

রাজার স্মরণশক্তি অত্যন্ত বেশি। ঘন্টা কয়েক বাদে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন, তোমার না গর্দান যাবে?

আজ্ঞে যাবে বই কী! তবে আজকে তো আর হয় না, আজ কোথাও যাত্রা নাস্তি।

বেশ, কাল যেন মনে থাকে!

খানিক বাদে রাজার হাই ওঠে। রাজা বলেন, ব্যস, আজকের মতো সভা ভঙ্গ।

এমনি করে রাজ্যশাসন চলে। রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। অবশ্য বাঘ জল ছাড়া আরও কিছু খায়। চোর ডাকাত রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। তাদের মজুরি পোষায় না।

এহেন সুখের রজে একদিন বিপদ ঘটল।

রাজা সভায় বসে আছেন। মন্ত্রী গেছেন বাজারে, কোটাল রান্নাঘরে; ছোকরা চাকর এসে পৌঁছয়নি। এমন সময় কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বললে, হুজুর দূত এসেছে।

রাজার ঘুম এসেছিল। চোখ বুজে বললেন, গর্দান নাও।

হুজুর দূত!

রাজা বললেন, দুত্তোর!

মন্ত্রী ততক্ষণে বাজার-টাজার সেরে পোঁটলা হাতে সভায় এসে পৌঁছেছেন।

ব্যাপার বুঝে একটু গলা চড়িয়ে বললেন, দূত যে অবাধ্য!

অবাধ্য হলে তো আর কথাই নেই, আগে মাথা নাও!

রাজার বিদ্যের বহর স্মরণ করে মন্ত্রী বললেন, আজ্ঞে দূতকে যে মারতে নেই শাস্ত্রে বলে—আর তা ছাড়াও যে রামনগরের দূত।

রাজার ঘুমুটুম উবে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে সভয়ে বললেন, এ্যাঁ রামনগরের দূত, কোথায়? শুনতে-টুনতে পায়নি তো! রামনগরের রাজাটা যা গোঁয়ার আর চোয়াড়, এক্ষুণি যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসবে, একটা ছুতো পেলে হয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, শুনেছি, তাঁর পুরোনো তরোয়ালটায় শাণ দেবার পর থেকে তিনি সেটার ধার পরীক্ষা করবার জন্যে উশখুশ করছেন।

তাই নাকি, আর তোমরা তার দূতকে রেখেছ বসিয়ে? দেখো আবার কী ফ্যাসাদ বাধিয়েছে।

ছোকরা চাকর ততক্ষণে এসে পড়েছে। দূতকে ডেকে এনে সেই হাজির করে দিলে।

দূত এসে কুর্নিশ করে বললে, হে রাজন!

রাজা আঁতকে উঠে বলে ফেললেন, এ্যাঃ!

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যে তার কানে কানে বলে দিলেন, আজ্ঞে ভয় নেই, ওদের ওইরকম বলাই দস্তুর।

দূত তখন বলে চলেছে, শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত পরম পরাক্রান্ত সসাগরাধরণীর অধিপতি স্বর্গ-মর্তা-পাতাল ত্রিলোকের পালক, চন্দ্র-সূর্য যাঁহার মার্বেল গুলি, নক্ষত্রমণ্ডলী—

রাজা ফ্যালফ্যাল করে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি কানে কানে বললেন, একটু সবুর করুন মহারাজ, আর একটুখানি বাকি।

—যাহারা ঝাড়লণ্ঠন, হিমালয় যাঁহার ইটের পাঁজা, নদী-সমুদ্র যাঁহার নালা-ডোবা, সেই মহামহিম অজর অজেয় অমর রামনগরের মহারাজের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই পত্র আপনাকে প্রদান করিলাম।

দূত রাজার হাতে একটি চিঠি দিলে।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল, বললেন, তাই বল, চিঠি এনেছ, আমি ভাবি কী না ব্যাপার!

তারপরেই রাজা মুখ গম্ভীর করে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে বললেন, এই যাঃ, চশমাটা তো ফেলে এসেছি। নাও তো হে মন্ত্রী! মন্ত্রী এর মধ্যে বাজারের পোঁটলা হাতসাফাই করে সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে ফেলেছেন। চিঠি হাতে নিয়ে তিনিও একবার এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে, আজ্ঞে আমিও দেখছি চশমাটা আনিনি। পড়ো হে কোটাল, তো খুব চোখের জোর।

মন্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে কোটালকে বাধ্য হয়ে চিঠিটা নিতে হয়। তারপর উলটেপালটে, একবার কাছে একবার দূরে, নানা রকমে ধরেও কোটালের চিঠি পড়া আর হয় না।

রাজা ধমক দিয়ে বললেন, কই হে পড়ো না, ভারী তো একটা চিঠি, তাই পড়তে দিন কাটাবে নাকি! নেহাত চশমাটা ফেলে এসেছি, থাকলে দেখিয়ে দিতাম!

কোটাল কাঁচুমাঁচু হয়ে বললেন, আজ্ঞে পড়তে তো এক্ষুণি পারি, কিন্তু এর যে আগাগোড়া ব্যাকরণ ভুল। এমন অশুদ্ধ ভাষা কেমন করে মুখ দিয়ে বার করব!

ছোকরা চাকর এতক্ষণ এক ধারে দাঁড়িয়ে পান চিবুচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা টেনে নিয়ে বললে, থাক কাউকে পড়তে হবে না।

মন্ত্রী অমনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ো তো বাবা, এই তো তোমাদের পড়বার বয়স!

কোটাল সায় দিলে বললেন, আর তোমাদের তো অত শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার নেই। পড়লেই হল।

ছোকরা চাকর চিঠিটা মনে মনে পড়ে ফেলে বললে, রামনগরের মহারাজ আপনার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। তিন দিনের ভেতর রাজপুত্র নিয়ে বিয়ের জন্যে রওনা না হলে রামনগর থেকে সাত হাজার সেনা তাঁকে নিতে আসবে।

এবার সভাসুদ্ধ সকলের মুখ শুকিয়ে গেল।

রাজা ঢোঁক গিলতে গিলতে বললেন, সাত হাজার! ঠিক পড়েছে তো হে, সাত হাজার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সাত হাজার পদাতিক আর তিন হাজার ঘোড়সওয়ারের কথাও আছে।

আবার ঘোড়সয়ার আছে! রাজার প্রায় ভিরমি যাবার অবস্থা।

ভিরমি যাওয়া আশ্চর্য নয়। প্রথমত রাজার ছেলেই হয়নি তো রাজপুত্র পাঠাবেন কেমন করে? আবার না পাঠালে সাত হাজার সৈন্যের নিতে আসা মানে যে কী তাও আর বোঝা শক্ত নয়। সেকালে যুদ্ধ—টুদ্ধ অমনি করেই হত কিনা।

রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকান, মন্ত্রী তাকান কোটালের দিকে। পাত্র-মিত্র মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

এখন উপায়!

রাজা বার কয়েক ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললেন, ওহে দূত ওর মানে কী! বুঝছ কি না—অর্থাৎ ওই যে কী বলে—বলো না হে মন্ত্রী!

এই যে বলি মহারাজ, মন্ত্রী একবার বেশ করে গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে শুরু করলেন, ওহে দূত, ওর মানে কী বুঝেছ কি না...

দূত এতক্ষণ পর্যন্ত কিঞ্চিৎ জলযোগের আশায় থেকে থেকে এইবার তার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে চটে গিয়েছিল, বললে, যা বলবার তাড়াতাড়ি সেরে নিন মশাই, আমার তো আর সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, খাওয়া-দাওয়া তো আছে।

কিন্তু এত বড়ো ইশারাটাও মাঠে মারা গেল। রাজা বললেন, নিশ্চয়ই! বলো না হে মন্ত্রী যা বলবার।

ছোকরা চাকর এবার এগিয়ে এসে হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললে, ওহে বাপু দূত!

দূত চটে উঠে বললে, ওহে বাপু কী হে!

আচ্ছা, না ওহে বাছা দূত, তোমার রাজাকে গিয়ে বোলো যে রাজপুত্র গেছেন শিকারে, শিকার থেকে ফিরেই তিনি যাবেন বিয়ে করতে।

সভাসুদ্ধ সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দূত রাগে গসগস করতে করতে বলে গেল কিন্তু বেশি দেরি হলে আমরা নিতে আসব, মনে থাকে যেন।

তারপর একমাস যায়, দু-মাস যায়।

রামনগর থেকে দূত এসে জিজ্ঞাসা করে, কই রাজপুত্র শিকার থেকে ফিরল?

ছোকরা চাকরই জবাব দেয়, ফিরবে বই কী, এই ফিরল বলে!

কিন্তু এখন করে আর কতদিন চলে? রাজপুত্র আর না পাঠালে নয়!

ছোকরা চাকর বলে, মহারাজ রাজপুত্র খুঁজুন।

রাজা বলেন, ঠিক বলেছ। প্রহরী, রাজপুত্র খুঁজে আনো।

প্রহরী এসে কিন্তু মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না চড়ে না।

মন্ত্রী বলেন, মহারাজ, রাজপুত্রের চেহারাটা কীরকম হবে একটু আঁচ না পেলে ওই বা খোঁজে কেমন করে!

রাজা বলেন, কেন? এই আমার মতো চেহারা!

মন্ত্রী রাজার চেহারার দিকে আর কয়েক তাকিয়ে মাথা চুলকোতে থাকেন!

রাজা চটে উঠে বলেন, চুপ করে আছ যে বড়ো! আমার চেহারাটা বলতেও চাও খারাপ!

আজ্ঞে মহারাজ, তা কী বলতে পারি! তবে কিনা আপনার মতো সুপুরুষ এ রাজ্যে আর কোথায় পাবে তাই ভাবছি!

রাজা খুশি হয়ে দন্ত বিকশিত করে বলেন, তা বটে, তা বটে! তবে কী হবে!

মন্ত্রী বলেন, এই ধরুন আমাদের, এই না হয় আমারই মতো। কোটাল কানে খাটো হলেও এ কথাটা শুনতে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে প্রতিবাদ করতে যায়। কিন্তু দরকার হয় না। রাজা তার আগেই হো হো করে হেসেন উঠে বলেন, পাগল হয়েছে! রাজকন্যা ভয় পেয়ে মুর্ছা যাক আর কি!

মন্ত্রী মুখ-চোল লাল করে গম্ভীর হয়ে যান।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় রাজার মতো চেহারাই দরকার, তবে অতটা ভালো না পেলে ক্ষতি নেই।

চেহারা মেলে কিন্তু রাজপুত্র হতে কেউ রাজি হয় না। রামনগরের মেয়েদের বড়ো বদনাম। তারা নাকি বড়ো বেশি লেখাপড়া জানে, ফট করে যদি কিছু শুধিয়েই বসে!

এদিকে রামনগরের আর তর সয় না। এবার রাজপুত্র না গেলে তারা নিতে আসবেই, দূত বলে গেল।

অগত্যা রাজাকে বরযাত্রী নিয়ে বেরোতেই হয়।

বরের পালকি খালিই চলে। রাজা বলেন, ওহে মন্ত্রী; চোখ দুটো একটু সজাগ রেখো। তেমন দেখলেই তুলে নেবে!

কিন্তু তেমন আর মেলে না, বরযাত্রীর দল কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে রামনগরে ঢোকে!

লোকজন ছুটে আসে, বর কই, বর কই বলে।

রাজা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, মন্ত্রী, এবার যে গেলুম!

ছোকরা চাকর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সকলকে হাঁকিয়ে দেয়, বিয়ের আগে আমাদের বর দেখাতে নেই।

রাজা বলেন, ঠিক ঠিক, মনে ছিল না।

মন্ত্রী বলেন, ঠিক বটে, মনে ছিল না।

কিন্তু বিয়ের দিন তো আর চালাকি চলে না। রামনগরের লোক এসে বলে, বর কই?

রাজা চান মন্ত্রীর মুখে।

মন্ত্রী চান রাজার মুখে।

ছোকরা চাকর বলে, আমাদের বিয়ের নিয়ম আলাদা।

কী নিয়ম?

আমাদের বর সভায় বসে ছদ্মবেশে! রাজকন্যাকে খুঁজে বার করে মালা দিতে হয়।

তারা বলে, আচ্ছা, তই সই।

মস্ত বড়ো বিয়ের সভা। লোকজন গিজগিজ করে। সভাজুড়ে বরযাত্রীর দল বসে থাকে। রাজকন্যা মালা হাতে করে সভায় ঢোকেন। এদিক-ওদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মালা পরিয়ে দেন ছোকরা চাকরের গলায়।

রাজা চমকে উঠে বলেন, য়্যাঁ, ও যে—

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁর গা টেপেন। রামনগরের রাজা চোখ পাকিয়ে বলেন, ও যে মানে?

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বললেন, আজ্ঞেও যে নয় ওই যে।

তবু কটমট করে তাকিয়ে রামনগরের রাজা বলেন, ওই যে কী?

আজ্ঞে মহারাজ বলতে যাচ্ছিলেন এই যে আমাদের রাজপুত্র।

রামনগরের রাজা হেসে বলনে, তাই বল। সে আর কে না জানে!

রাজা বর কনে নিয়ে ঘটা করে দেশে ফেরেন। রামনগরের রাজদরবারে হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। রামনগরের রাজা বলেন, আচ্ছা বোকা বানানো গেছে, কী বল মন্ত্রী?

রামনগরের মন্ত্রী বলেন, আজ্ঞে যা বলেছেন।

রাজা বলেন, একেবারে বোকার দেশ, কী বল! রাজকন্যা আর মন্ত্রীকন্যার তফাত বুঝতে পারল নাা। ছ্যা ছ্যা!

কথাটা মন্ত্রীর ভালো লাগে না। তবু রাজার সঙ্গে হাসতে হয়। হাসতে হাসতে বলেন, কিন্তু রাজপুত্রের চেহারাটা ভালো। রাজা হলে মানাবে।

রামনগরের রাজা চট করে চটে উঠে বলেন, তার মানে?

ডগি অ্যালসেশিয়ান নয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডগি মানে কুকুর, ডগি মানে একটি কুকুরের নাম। আর—বএশূন্যর, ত আর দন্ত-ন-রতন?

যে রতন মানে দামি পাথর, হিরা পান্না মণি মুক্তা, সে রতন, অর্থাৎ রত্ন নয়। রত্ন মানে একটি ছেলে বা রতন নামে একটি ছেলে, ছেলে মানে নেহাত নয়। ১৯-২০ বছরের হবে—কলেজে পড়ে; ইঞ্জিনিয়ার হবে। ভালো ক্রিকেট খেলে। সে একদিন কলেজ থেকে পড়ে, না মাঠ থেকে খেলে ফিরছিল বাড়ি, হঠাৎ পথের মধ্যিখানে একজন লোক একটু আড়াল থেকে ডেকে বলল, বাবু।

রতন ভুরু কুঁচকে বলল, কী?

একঠো অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা লিবেন?

লোকটার দিকে তাকাল রতন। একজন হিন্দুস্থানি, পা জামা কামিজ টুপি পরা, তার বগলে একটা কিছু কুঁইকুঁই শব্দ করছিল।

বাবুর্চি-টাবুর্চি হবে। লোকটার নাকে একটা আর্চিল। সে বললে, অ্যালসেশিয়ান দেখি। দূরম একে নেড়ি মনে হচ্ছে।

নেহি বাবু, নেড়ি নেহি। বহুত উঁচা জাতের অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা! ভালো অ্যালসেশিয়ান যখুন ছোটা থাকে তখুন এমনি থাকে বাবু! যত ভালো জাত হবে তত খারাপ দেখতে হবে ছোটার সময়।

অবাক হয়ে রতন তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তাই তো বটে। নেড়ি কুকুরের বাচ্চা যখন ছোটো থাকে তখন মোটা-সোটা নাদুসনুদুস থাকে। বড়ো হলেই হাড় জিরজিরে হয়। অ্যালসেশিয়ান ঠিক তার উলটো ঠিক কথা। নেড়ি চুরি করে খায়, বাঁধলে কাঁদে রাস্তায় রাস্তায় ময়লা মাটি যা পায় চেটে বেড়ায়। অ্যালসেশিয়ান ঠিক তার উলটো।

লোকটা বলল, এর যেটা মা আছে সেটা খাস জার্মানির একটা কাউন্টের কুত্তার বাচ্চা; মা-টা ছিল ফেরাঙ্গের। বাবার বাবাটা না—সিটা ছিল যুদ্ধের সিপাহি কুকুর বাবু। হাঁ চার বার মেডেল পেরেছিল বাবু। ইটা আমার মনিবের কুত্তার বাচ্চা। পাঁচটো বাচ্চা হয়েছে, বাবু হকুম দিলেন, দুটো রেখে, বাকি মেরে দে গরম জলে ফেলে। ইটা বহুত তেজি আছে। আমি পিয়ার ভি করি! তাই মারতে পারলাম না বাবুজি!

ভারী লোভ হচ্ছিল রতনের।

রতন আমাদের লোকটি ভালো। কিন্তু বড়ো সরল। আবার ভীষণ রাগী বটে। রাগল তো ভীষণ রাগল, হাঁকডাক করে চ্যাঁচাল, ইচ্ছে হল যার ওপর রাগ হল তাকে মেরেই ফেলে। তারপরই ইচ্ছে হল নিজের মাথায় নিজেই একটা ডান্ডা মেরে সে মরে যায়, যার ফলে খুব দুঃখ হোক ওই লোকটার যার সঙ্গে তার ঝগড়া হচ্ছে। তারপরই মনে হয়, চলেই যাবে সে যেদিকে, খুশি, ঘরেই থাকবে না, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। তারপর ঘন্টা দুয়েক পর রতন গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, মনে মনেই ভাবে, আঃ, ছি, ছি, কী অন্যায়টাই না সে করেছে। ছি ছি ছি। তার কিছুক্ষণ পর এসে তার কাছে দাঁড়ালে। বলল, খুব খারাপ কাজ হয়ে গেছে। মাফ করো তুমি। গুরুজন হলে হাত জোড় করল। ছোটো হলে তাকে কোলে করল। এইরকম লোক।

আরও আছে—নিজে সে নিজের বিচারমতো মন্দ কাজ করে না—মিথ্যো সে বলে না। এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য লোকেও তাই। তাই লোকটা মিথ্যে কথা বলছে, এ ভাবতেই পারল না। সে বলল, কী দাম চাও, বলো! নেব আমি। হ্যাঁ! নেব। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

যতবার সে হ্যাঁ বলল, প্রতিবারেই তার বিশ্বাস হয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর এবং আরও দৃঢ়তার, সবশেষে প্রায় দৃঢ়তম হয়ে উঠল।

অ্যালসেশিয়ান, নিশ্চয় তাতে সন্দেহ নেই।

তার ভারী সখ অ্যালসেশিয়ানের। কিন্তু বাড়িতে আছে আচ্ছা এক দিদি, তার বাবার মা, এই এতটুকু বেঁটে, দিনরাত পুজো করে, তার জন্যে এসব আর পুষবার উপায় নেই। না-হলে পাশের দে মশায়দের বাড়িতে খাসা একটা অ্যালসেশিয়ান আছে, নাম বাঘা। শুভতোষদের বাড়িতে আছে একট। রত্নাদের বাড়িতে রত্নার বাবার একটা আছে। তার নাম রানি। রানির বার দুই-তিন বাচ্চা হল, বিক্রি করে খুব সম্ভব বেশ টাকা পেয়েছে রানির বাবা। সুকুমার ডাক্তারের একটা অ্যালসেশিয়ান আছে। সেই তাদেরই বাড়িতে।

তবু সে ভাবছিল।

রতন ভাবছিল, ডাক্তার ভট্টাচার্যের একটা অ্যালসেশিয়ানের কথা। খুব ভালো জাতর কুকুর ছিল সেটা।

ডাক্তারখানায় ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে শুয়ে থাকত। একদিন সে তার বাবার সঙ্গে ডাক্তারখানায় গিয়েছিল। একজন এমনি হিন্দুস্থানি সেলাম করে ডাক্তারববুর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

সেলাম ডাগ্‌ডরবাবু। কী পহছানতে পারছেন?

কে, বলো তো?

ততক্ষণে ডাক্তারবাবুর অ্যালসেশিয়ানটা উঠে একেবারে সামনের পা দুটো তার কাঁধে তুলে দিয়ে মুখ চাটতে লেগে গেছে।

ডাক্তার বাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, জন, জন। নাম নাম।

জন নামল। মুখ ফিরিয়ে সবিনয়ে কাঁউ কাঁউ করে কিছু বলল।

লোকটা তার গলা জড়িয়ে ধরে হেসে উঠল। ডাক্তারবাবু বললেন, কাটবে কাটবে। কামড়াবে!

নেহি ডাগ্‌ডরবাবু। উ লোক বেইমান নেহি। উ হামাকে পহছানে নিলে। আপনি হুজুর পহছানতে পারলেন না, উ পহছানলে। হামি হুজুর বুলাকিরাম—জমাদার।

আঃ বুলাকিরাম। আচ্ছা।—আচ্ছা! কেমন আছ? কবে এলে?

প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ানটা তখন চারদিকে ঘুরছে আর ল্যাজ নারছে। মধ্যে মধ্যে বাচ্চা কুকুরের মতো কুঁইকুঁই শব্দ করে লম্বা কালো জিভটা দিয়ে তার মুখে চেটে দিচ্ছে।

এই লোকটার নেহাত বাচ্চা অবস্থায় এই কুকুরটাকে ডাক্তারবাবুকে দিয়েছিল। ডাক্তারবাবু তার ছেলেকে চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। সেও এখানে নয়, এলাহাবাদে। ডাক্তারবাবু দু-মাস তখন ছিলেন সেখানে। সেই সময়। সে আজ পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে। কুকুরের বাচ্চটা তখন মাস খানেকের কী মাস দেড়ের ছিল; এতদিনন পরেও কুকুরটা সেই দেড় মাস বয়সের সকৃতজ্ঞ স্মৃতি মনে করে রেখেছে, তাকে দেখবামাত্র চিনেছে। তার কাঁধে পা দিয়ে উঠে, তার মুখে চেপে চেপে কুঁইকুঁই শব্দ করে জানিয়েছে, মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে। ভালো আছ? তুমি ভলো আছ?

অন্তত রতনের তাই মনে হল। রতন সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেট খুঁজে যা ছিল ঝেড়েঝুড়ে বের করে বলল, আমরা কাছে এই আছে, এই নিয়ে দেবে তো দাও!

চার টাকা তিরিশ পয়সা!

নেহি বাবু। পাঁচাশ টাকায় মিলবে না। চার টাকা! নেহি বাবু!

তবে আর কী করব?

আপকা কলমঠো দিজিয়ে।

কলম?

বেশি দাম অবশ্য নয়। দেশি পাইলট। কিনেছিল সস্তায়। তার একটা ভালো কলমও আছে। একটু ভেবে সে দিয়ে দিল কমলটা। এবং বিনিময়ে সেই নেড়ি-কুকুরের বাচ্চার মতো একটা মরা-মরা ধরনের বাদামি-কালচে কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে বগলের কাছে তুলে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও বার দুই রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছুঁকছুঁক করে শুঁকে তার ছোট্ট জিভখানা বাড়াল রতনের মুখখানা চাটতে।

রতন বলে উঠল আপন মনেই, আনন্দ সে আর সামলাতে পারল না। বলে উঠল, মার দিয়া কেল্লা! ঠিক সেই ডাক্তারবাবুর অ্যালসেশিয়ানটার মতো মুখ চাটঠে। শুঁকছে। ফার্স্ট ক্লাস।

অতঃপর একটা ভীষণ যুদ্ধ।

যুদ্ধ বই কী। দিদির সঙ্গে যুদ্ধ। ভাই-বোনদের সঙ্গে যুদ্ধ। চাকর-বাকরদের সঙ্গে যুদ্ধ। কারণ সবাই বলে, নেড়ির বাচ্চা। রতন বলে, কভি নেই—অ্যালসেশিয়ান। আনো মুখও ওর কাছে। দেখো, ঠিক, তোমার মুখ চেটে দেবে।

তা ডগি দিত।

ডগ মানে কুকুর। 'ডগি' হল রতনের কুকুরের নাম।

দিদি, দিদি মানে ঠাকুমা, সে বুড়ি—বাবার মা, অনেক ঝগড়া করে হাল ছাড়ল। বাবা মা সবাই। সবাই বলল, নেড়ি। রতন বলল, না। অ্যালসেশিয়ান। আরও বলল, লাগবে না তোমাদের বাড়ির ভাত। আমি আমার ভাত খাওয়াব। আদ্ধেক দেব। না হয় ভিক্ষে করে এনে খাওয়াব। বাড়ির একপাশে একটা জায়গায় তাকে বাঁধল। বলল, কেউ যেন খুলে না দেয়। বাঁধা অভ্যাস করতে হবে। একেবারে ছাড়া পেতে দেবে না। নানারকম নিয়ম করল রতন। সকালে বেড়িয়ে আনা। মাত্র একবার খাওয়া, তাও এক জায়গাতে এবং একটি পাত্রে এবংবিধ আরও অনেক প্রকার।

ডগি কিন্তু বাঁধলেই কাঁদতে লাগল। সে কী কান্না। সে কী কান্না! সকরুণ কান্না। হৃদয়বিদারক কান্না হয়, বিলাপ। এবং তার সঙ্গে এমনভাবে যখন তখনই ওই স্থানটাকে ময়লা করতে লাগল যে, বাড়িটা, দুর্গন্ধে ভরে উঠল। জমাদার সাফ করতে চাইত না। রতন তাতেও দমেনি, রতন নিজেই সাফ করতে লাগল। এবং ডগিকে শাসন করতে লাগল। কান মলে, ছড়ি দিয়ে পিটে, লাথি কষিয়ে, হাতের চড় মেরে রতন কুকুরটার কাছে দুষ্টুছেলে শাসন করা স্পেশাল স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে উঠল। ফলে রতনকে দেখবামাত্র চিত হয়ে শুয়ে দুটো বা চারটে পা-ই উপর দিকে তুলে চিৎকার করতে লাগল, যার মানে হয়, মেরো না, মোরো না, মোরো না, তোমার পায়ে পড়ি, নয়, ওগো আর করব না গো, তোমার পায়ে পড়ি গো, এই দুটোর একটা ছাড়া অন্য কিছু করা যায় না।

মাস তিনেক হতে ডগি বড়ো হল। কিন্তু চেহারায় অ্যালসেশিয়ানত্ব একটুও ফুটল না; তার লোমগুলো গায়ে সেঁটে বসে যেতে লাগল ল্যাজটা সরু হয়ে উপর দিকে খণ্ৎ-এর মতো হয়ে চন্দ্র সূর্য তারাকে ডোন্টকেয়ার করতে লাগল। কেবল রতনকে দেখলে সেটা নত হয়ে দুই পায়ের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে যেত। এবং মাথাটা বিচিত্রভাবে বেঁকিয়ে কুঁইকুঁই করে মিনতি করত। বোধ হয় বলত, প্রভু, আমি অ্যালসেশিয়ান নই। আমি নেহাইত নেড়ি, কুকুরের ব্যাটা নেড়ি কুকুর, বুদ্ধি আমার মোটা, লাঠি পেটা করলে আমি মরে যাব কিন্তু অ্যালসেশিয়ান হতে পারব না।

কিন্তু সে কথা কিছুতেই শুনতে প্রস্তুত নয় রতন। সে বলে, তোকে অ্যালসেশিয়ান হতেই হবে। ঠেঙিয়ে তোকে আমি অ্যালসেশিয়ান করবই।

এবং চপেটাঘাতে, কর্ণ মর্দন বা হালকা ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাকে শিক্ষা দিতে শুরু করল—ডগি, সিট ডাউন। ডগি।

ডগি ভয়ে বেঁকে গিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তার ঘাড় বেঁকিয়ে মিনতি করে বলতে লাগল, আঁউ উঁ-আঁউ! উঁ! মেরো না! হে দয়ালু প্রভু! হে করুণাময়। সিট ডাউন হতে পারছি না। দয়া করুন।

রতন অতঃপর তার সেই হালকা লিকলিকে বেতটা দিয় সপসপ শব্দে পিটে তাকে বসাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ডগি তখন না বসে একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, চারখানি পা উপরের দিকে তুলে জোড় পা করে মিনতি করে বলে, প্রভু, মেরে ফেলো, কেটে ফেলো। কিন্তু বসতে আমি পারছি না। কারণ বসলেই হয়তো আমি জাত হারিয়ে অ্যালসেশিয়ান হয়ে যাব।

তবু রতন পেটে।

গাধ পিটে ঘোড়া হয়।

'হিতোপদেশ'—এর গল্পে আছে ইঁদুর থেকে বেড়াল, বেড়াল থেকে কুকুর হয়, কুকুরকে বাঘ পর্যন্ত করা যায়। এ তো নেড়ি থেকে অ্যালসেশিয়ান। রতন বদ্ধপরিকর।

এদিকে ডগিও কৃতসঙ্কল্প। হয়তো জন্ম থেকে শপথবদ্ধ। নেড়ি সে নেড়িই থাকবে। তা ছাড়া আর কিছু হবে না। এবং এর জন্য সে রতনের সাড়া পেলেই পালাতে শুরু করল, গন্ধ পেলেই সরে পড়তে লাগল। খাটের তলায় সিঁড়ির তলায় ছাদের সিঁড়িতে, আর ফটাকটা খোলা পেলে সোজা রাস্তায়। যত হাড় মাছের কাঁটা কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়ে বেড়ায়। এবং এটা ওটা সেটা চেটে চেটে বেড়ায়, শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। তার ওপর সঙ্গ হল আরও দুটো নেড়ি কুকুরের!

রতনদের বাড়ি কলকাতার উত্তর প্রান্তে। বাড়ির সামনে একটি মাঠ আছে, সেখানে কাদা আছে, ধুলো আছে, ময়লা আছে, মাটি আছে, ডাস্টবিনে এঁটোকাঁটা আছে, চিংড়ির খোসা আছে। ডগি রাস্তায় বেরিয়ে মাঠে পড়েই ছুটোছুটি করে আরও দুটো কুকুরের সঙ্গে। একটা আধা বিলিতি, একটা আধা দেশি। একটা সাদা কিন্তু গায়ে কালো কালো গোল দাগের ছড়া আছে, ল্যাজে ঘন রোঁয়া আছে, দুই কানেও দু-গাছা বড়ো কালো রোঁয়া আছে। আর একটা, সেটা আট কেলে অর্থাৎ সাদায় কালোয় মেশনো। কবে এবং কখন কীভাবে যে ওদের সঙ্গে ওর ভাব হয়েছিল কেউ দেখেনি, তবে একদিন হঠাৎ দেখা গেল ওদের তিনটিতে ভাবী ভাব। ওরা দুজন বয়সে বড়ো, ডগি ছোটো; তা হোক, ওরা ডগিকে চমৎকার করে নেড়িবৃত্তি শেখায় কেমন করে মারামারি করতে হয়, এটাই হল তার মধ্যে বেশি। কামড়াকামড়ি, পায়ে পায়ে লাফিয়ে পিছন পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানো। এ যখন ঘাড়ে কামড়ে ধরে, ও নিচু দিক থেকে এর সামনের পায়ে কামড়ে ধরার কায়দা আবিষ্কার করে। দুজনে লড়াই করে একজন দাঁড়িয়ে দেখে, ঠিক যেন হাসে; বাঃ। বেশ রেফারির মতো গম্ভীরভাবে দেখে কার ফাউল হল। তারপর তিনজনেই দৌড়ায় পাড়ায় এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত। মোটর আসে, হর্ন দেয়, ওরা সরে যায়, মোটর বেরিয়ে গেলে পিছনে পিছনে ঘেউ ঘেউ করে, তাড়া করে যায়। আবার ফিরে আসে।

ডাস্টবিনে খাবার পড়ে; তিনজনেও ছুটে আসে। ঝগড়া করে না, যে যা পারে কেড়ে খায়; কখনো কখনো কাকেরা বিরক্ত হয়ে ঠোকরায়, ওরাও কাকেদের তাড়া করে। কখনো কখনো কাকদের সঙ্গে খেলাও করে।

কাক দুটো উড়ে এসে ডগির দু-দিকে নেমে বসে; একটা বসে আগে, একটা বসে পেছনে। ডগি ঘাড় বেঁকিয়ে আড় চোখে তাকিয়ে যখন সামনেরটাকে দেখে তখন পিছনের কাকটা এসে ডগির লম্বা ল্যাজটা ধরে টান মারে। এবং পিছনের দিকটার কাকটাকে যখন সে তাক করে তখন সামনের কাকটা এসে মাথায় ঠোকরায়। তবে পিছনে সমস্যাটাই প্রবল। পিছনের কাকটা ডগির ল্যাজ ধরে মধ্যে মধ্যে এমন টেনে দেয় যে, ডগি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ না হয়ে পারে না এবং বেশ কয়েকবার অর্ধবৃত্ত হয়ে বনবন করে ঘোরে তার নিজের ল্যাজটাকে ধরার জন্য। যেটা সমানে তার মুখের সঙ্গে সমান দূরত্ব রেখে ঘুরপাক খায়।

এরই মধ্যে দূর থেকে শব্দ আসে—ডগি।

রতনের গলা। রতন আসছে কলেজ থেকে। ব্যস, রণে ভঙ্গ দিয়ে ডগি দিল ছুট। ছুট তো ছুট। রামছুট। অনেক দূর গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কারণ তার পিছনে থেকে ক্রমাগত ক্রমশ উত্তপ্ত এবং উচ্চ ডাক শোনা যাচ্ছে—ড-গি! ডগি। ড-গি। ড-গি—।

ডগির রামছুটে স্পিড কমতে থাকে।

রামছুট স্পিড কমে লক্ষণছুট, তা থেকে ভরতছুট, ভরতছুট থেকে কৈকেয়ীছুট, কৈকেয়ীছুট থেকে মন্থরাছুট। অতঃপর পা দুটো একেবারে থেমে যায় এবং সে সকরুণ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়। তারপর ফেরে, জোরে ছুটে এসে একেবারে রতনের সামনে চিত হয়ে পড়ে পা চারটে তুলে মাটিতে ল্যাজ আছড়ায় আর হাসে নির্লজ্জের মতো। সম্ভবত বলে, দেখো প্রভু, দেখো, কেমন আমি ছুটে পালাতে পালাতে থমকে দাঁড়ালাম এবং কেমন এক ছুটে এসে তোমার কাছে ল্যাজ নাড়ছি, দেখো।

কিন্তু প্রভু রতন হলেন পাকাপোক্ত কড়া একটি ভবি; সে কোনোমতেই ভুলবার পাত্র নয়; বাঁ হাতে ডগির একটি কর্ণ শক্ত হাতে চেপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাড়িতে এনে ওই বেত্র দিয়ে নিদারুণ প্রহার দিয়ে ছেড়ে দেয়।

ডগি প্রথম প্রথম তারস্বরে চ্যাঁচাত—আঁউ-আঁউ-আঁ আঁ। অর্থাৎ গেলামরে মরলামরে-বাবারে-মারে মা-মা! তাতে রতন বেশি চটে যেত এবং নির্দয়তরভাবে পিটত। ডগি সেটা বুঝতে পেরেছে, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে এবং মার খাবার পদ্ধতিটি আমূল পালটে নিয়ে এখন শুধু সকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, পা চারখানাকে গুটিয়ে-গাটিয়ে পড়ে পড়েই মার খায়, সাধ্যমতো চ্যাঁচায় না, শুধু অসহ্য হলে অস্ফুটস্বরে উঃ উঃ করে—যার মানে হয়, আর না, আর না, আর না; নয় তো, মারুন, মারুন আরও মারুন। চ্যাঁচায় না বলে রতন তাকে অল্পেই ছেড়ে দেয় এবং একটু পরে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, ডগির সামনের পা দুটো ধরে তাকে খাড়া করে

তুলে বলে, ইউ আর ফ্রম সাম হাই ফ্যামিলি মাই ডগি, হোয়াই ডু ইউ বিহেভ লাইফ এ নেড়ি ফ্যামিলি সান? এ্যাঁ? উচ্চ বংশের সন্তান না হলে স্থান তোমাকে দেব না।

অতঃপর দাঁতে দাঁত ঘষে, তাহলে তোমাকে মেরে ফেলব। আজকালকার দিন, জান তো? সেদিন একটা পিকপকেটকে ধরে মারতে লাগল তো মারতে লাগল, লোকটা মরলে তবে ছাড়ল, হ্যাঁ।

ডগি এতে খুব খুশি, মুখ দেখলেই বোঝা যায় হাসছে, জিভটা তার বেরিয়ে ঝুলে পড়ে এবং তার থেকে টপ টপ করে লালা ঝরে।

রতন তাকে ছেড়ে দিয়েই সে আর দুই লাফ মেরে সেই লম্বা জিভটা সাপের মতো বের করে রতনের মুখ চেটে দিতে চায়; রতন ধমক দিয়ে বলে, খবরদার। কী না কী খেয়েছিস তুই। রাস্তায় গোবর চাটিস, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি! মেরে ফেলব আমার মুখে জিভ ঠেকালে।

মুহূর্তে হাই ফ্যামিলির ছেলে ডগি রতনের গায়ের তলায় গড়িয়ে পড়ে সেই জিভ দিয়ে পা চেটে দিয়ে, তার ল্যাজ দিয়ে রতনকে পটপট শব্দে আঘাত করে বেত্রাঘাতের শোধ নেয়।

ঘর থেকে বের হতে পেলেই সটান বাড়ির বাইরে রাস্তায়। এবং রাস্তা পার হয়ে সেই কুকুর দুটোর কাছে। তারা ওর মুখে চেটে দেয়, গা চেটে দেয়। ও-ও তাদের মুখে চাটে, গা চাটে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটি কুকুরের চিৎকারে পাড়া চকিত হয়।

অ্যালুমিনিয়ম বাসনওয়ালাকে লেগেছে—লোকটা এ্যাঁ-কাঁ্যা—এ্যাঁ-এ্যাঁ বলে বিকট স্বরে চিৎকার করে। নয় তো গোয়ালদের কোনো মহিষকে লেগেছে কিংবা কারোর বাড়ির বেড়ালকে লেগেছে অথবা বিশাল পাগড়িপরা কোনো কাবলিওয়ালাকে সে তেড়ে গেছে, নয় তো ফাঁকা জায়গায়টার ওপর কোনো কুকুরকে দেখে চ্যাঁচাচ্ছে।

ডগির কণ্ঠস্বর চেনা যায়। নেহাতই ফংফঙে কণ্ঠস্বর; আদৌ গুরুগম্ভীর ধ্রুপদি নয়, যা শুনে লোকে ভয় করে, চোরটোরেরা পাঁচিল পার হতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। গম্ভীর কাঁসরে বাজনার কাছে ছোট্ট একটা ঘটিতে কাঠি দিয়ে বাজালে যেমন ফংফঙে মনে হয়, তেমনি মনে হয় পাশের বাড়ির অ্যালসেশিয়ান বাঘার ডাকের কাছে।

রতনের দাদা হিমাদ্রি বলে, কোত্থেকে যে আনলি একটা নেড়ির বাচ্চাকে, ডাকছে দেখ দেখি! চোর-এল ওর গলার আওয়াজই বের হবে না, দেখবি।

কক্ষনো না। দেখিস।

দেখিস। তুই দেখিস!

ঠিক তাই হল। একেবারে তাই। বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। ডগি বাড়িতেই ছিল কিন্তু একবার চ্যাঁচাল না। চোরটাই চিৎকার করে উঠল।

আরে বাপরে! জান গেইল রে বাবা! বলে পাঁচিলের ওপর থেকে একেবারে ধপাস করে ওপাশে পড়ে গেল। চোরের উপদ্রব কিছুদিনই এ পাড়ায় চলছে। সেদিন

রতনের বাড়ির কম্পাউন্ড ওয়ালে চড়ে বাড়ির ভেতরে নামবার জন্যে চোর যেই এক পা বাড়িয়েছে অমনি ডগি লাফ দিয়ে উঠে তার গোড়ালিটার সজোরে দাঁত বসিয়ে কামড়ে ধরেছে। এমন করে ধরেছিল যে, সে দাঁত বসিয়ে তার জোরে ঝুলতে সক্ষম হয়েছিল। লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে পাখানাকে ঝেড়ে ডগিকেও ঝেড়ে ফেলেছে বটে কিন্তু চোরের গোড়ালির খানিকটা মাংস কেটে নিয়েছে ডগি!

ডগি চ্যাঁচায়নি। সে যখনই শব্দ শুনেছিল, বুঝতে পেরেছিল চোর পাঁচিল ডিঙিয়ে নামতে চাচ্ছে, তখনই সে পাঁচিলের ধারে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা পাঁচিল থেকে যেই একটা পা ঝুলিয়ে নামতে চেষ্টা করেছে অমনি ডগি লাফ মেরে খপ করে কামড়ে ধরেছে।

চোরটাই চ্যাঁচামেচি করে লোক জাগিয়েছিল। এবং তাতেই ধরা পড়ল। ধরলে তাকে আরও দুটো কুকুর। তারা এমন চিৎকার করল যে, বিটের পুলিশ পর্যন্ত ছুটে এল। চোরটার তখন দু-দিকে দুটো কুকুর।

রতন চোরটাকে দেখে সবিস্ময়ে বলল, তুমি কে, বলো তো? তোমাকে তো আমি চিনি? তোমার নাকের ওই আঁচিলটা তো আমার খুব চেনা হে! কই, তোমার টুপি কই? পাজামা-কামিজ কই? এ্যাঁ—!

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামাল, নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কুকুরটা একদম শয়তানের জাত। ওঃ, একদম চিল্লায় না! ওঃ, কেটে নিয়েছে গোড়ালিটা। আঃ!

রতন বলল, নেড়ি যে মিয়া। ওর তো ওই স্বভাব! অ্যালসেশিয়ান তো না। জার্মান কাউন্টের কুত্তা, বাপের বাচ্চা তো নেহি! এটার বাবার বাবা যুদ্ধের সিপাহি কুকুরও ছিল না। মেডেল-টেডেলও পায়নি এর চোদ্দোপুরুষ। এ হল নেড়ি, বেইমানের জাত! কী এমন করে তাকাচ্ছ কেন মিয়া? চিনতে পারছ না আমাকে? ওটাকে তো তুমিই আমাকে দিয়েছিল অ্যালসেশিয়ান বলে। সেই পুলের ধারে। চার টাকা তিরিশ পয়সা নগদ। আর আমার পাইলট পেনটা। দেখো, অ্যালসেশিয়ান হলে কুকুরটা ঠিক তোমাকে চিনে ফেরত। ভাগ্য, ডগি আমার নেড়ি!

লোকটা মুখ নামাল।

রতন ডগিকে কাছে টেনে বলল, মাই—ডগি-ডগি। ইই আর ফ্রম সাম হাই ফ্যামিলি অব নেড়ি ডগ্‌স।

ডগি কানমলা খেয়েই চিত শুয়ে পড়ে পা চারটে উপর দিকে তুলে জোড় পা করল, সামনের রাস্তায় ওপর অন্য কুকুর দুটো বসে বসে ডগির আদর দেখছিল। এবং সম্ভবত হাসছিল অন্তত তাই মনে হচ্ছিল দেখে।

রতনের বোন লীলা বিস্কুট নিয়ে এসে বলল, মেজদা মামণি দিল, কুকুরগুলোকে দাও।

জেনারেল ন্যাপলা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাংরা কাঠির আগায় একটি আলু বিঁধে দিলে যেরকম দেখতে হয়, নেপালের চেহারাটি ছিল ঠিক সেইরকম। স্কুলসুদ্ধ ছেলে তাকে প্রথমে ন্যাপলা বলে ডাকত। কিন্তু পরে সে নাম বদলে গিয়েছিল।

নেপাল স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ত। তার বয়স ছিল দশ কী এগারো বছর। কিন্তু ভারী রোগা বলে তার বয়সও আরও কম মনে হত। একটা ফড়িংয়ের পায়ে যে জোর আছে, সেটুকু জোরও তার ছিল না। কিন্তু তবু সে ক্রমে স্কুলের ছেলেদের স্নেহ আর সম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছিল। কী করে এই হেঁড়ে-মাথা ন্যাল্-ন্যালে ছেলেটা এমন অসাধ্য সাধন করলে?

হিরু নামে স্কুলে একটা ভারী দুষ্ট ছেলে ছিল। সে একদিন নেপালের মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলেছিল, এই তালপাতার সেপাই, তুই কি ভাত খাস না? অমন কাঠিন মতন চেহারা কেন?

হিরুর গায়ে জোর বেশি। নেপাল কোনো উত্তর দেয়নি। চাঁটিও বেবাক হজম করে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরদিনই এমন এক ব্যাপার ঘটল, যাতে হিরু একবারে কাবু হয়ে পড়ল।

হিরু মাস্টারদের চেহারা বর্ণনা করে কবিতা লিখত, আর লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেদের পড়ে শোনাত। সেকেন্ড মাস্টার হরিবাবুর মাথায় একগাছিও চুল ছিল না, কিন্তু গোঁফ ছিল প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। তিনি ক্লাসে এসে রোল কল করেই ঘুমিয়ে পড়তেন। ছেলেদের বলতেন, 'এসে' লেখো কিংবা তর্জমা করো। তারপর ক্লাসের শেষে ছেলেদের খাতা পরীক্ষা করে ঘণ্টা বাজলেই উঠে চলে যেতেন। হিরু তাঁর নামেও এক পদ্য লিখেছিল।

সেদিন হরিবাবু ক্লাসে এসেই দেখলেন তাঁর টেবিলের উপর একটা খাতা পড়ে রয়েছে। খাতায় কারুর নাম লেখা নেই। তিনি পাতা উলটে দেখলেন তার ভেতর কবিতাটি লেখা রয়েছেঃ

মাস্টার বাবু হরি ঘোষ
মাথায় টাক কী ভীষণ!
গোঁফ দেখে হয় পরিতোষ
যেন রে সুন্দরবন।
গোঁফে যদি যেত টাক ঢাকা
কী শোভা হত মরি মরি!
ঘুমুলেই শুরু নাক ডাকা
ঘড়র ঘোঁত—হরি হরি!

কবিতা পড়েই হরিবাবু একেবারে অগ্নিমর্শা হয়ে উঠলেন। গর্জন করে বললেন, কে লিখেছে এ পদ্য? শিগগির বল, নইলে ক্লাসসুদ্ধ রাসটিকেট করব।

হরিবাবুর মূর্তি দেখে ছেলেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভয়ে ভয়ে কবিতাটি দেখতে চাইল কিন্তু তিনি দেখালেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, এ ক্লাসে কে পদ্য লেখে?

সবাই হিরুকে দেখিয়ে দিল। হিরুর মুখ চুন হয়ে গেল! তুব সে সাহস করে বলল, কী হয়েছে স্যার?

হরিবাবু তার চোখের সামনে খাতায় ধরে বললেন, এ পদ্য তুই লিখেছিস?

হিরু ঢোক গিলে বলল, আজ্ঞে স্যার—আমি স্যার—

শুয়োর পাজি, বলে হরিবাবু ঠাস করে তার গালে এক চড় বসালেন। তারপর কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে হেডমাস্টারের ঘরে নিয়ে গেলেন।

হেডমাস্টার হিরুকে শাস্তি দিলেন, সাতদিন কান ধরে বেঞ্চিতে দাঁড়াবে, আর স্কুলের সমস্ত ছেলের সামনে তাকে বেত মারা হবে।

নেপাল ভালো মানুষের মতন চুপ করে সব দেখল, শুনল। কিন্তু সেই পদ্য লেখা খাতাটা হরিবাবুর টেবিলে কে রেখেছিল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। নেপাল সে ক্লাসের ছেলে নয়, তাই তার ওপর হিরুর সন্দেহ হলেও প্রমাণের অভাবে সে কিছু করতে পারলে না। তা ছাড়া নেপালের কুটবুদ্ধি দেখে স্কুলের ছেলেরা সবাই তাকে সমীহ করে চলতে লাগল। সে রোগা বলে তার গায়ে হাত তোলবার সাহস আর কারুর রইল না।

শুধু তাই নয়, মাস্টাররাও নেপালের গায়ে হাত দিতে ভয় পেতেন। নেপাল লেখাপড়ায় ভালোই ছিল। কিন্তু তবু বাংলার টিচার বলাইবাবুর হাত থেকে কারুর নিস্তার ছিল না। বলাইবাবু সর্বদাই ছেলেদের ঠেঙাবার ছুতো খুঁজে বেড়াতেন। ক্লাসের যারা ভালো ছেলেরা তারাও মাঝে মাঝে তাঁর খপ্পরে পড়ে যেত। বলাইবাবু যখন ক্লাসের পড়ায় কোনো ছেলেকে ঠকাতে না পারতেন, তখন তাকে অভিধান থেকে শক্ত শক্ত কথা বেছে মানে জিজ্ঞাসা করতেন। কেউ না পারলে অমনি এক মুখ হেসে তাকে প্রহার আরম্ভ করতেন।

নেহাত রোগা পটকা বলে নেপাল এতদিন বলাইবাবুর নজরে পড়েনি। কিন্তু একদিন তাঁর শোনদৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ল। তার মাথায় গাট্টা মারবার জন্যে

বলাইবাবুর হাত নিশপিশ করতে লাগল। তিনি তার পড়া জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন।

নেপাল ঠিক ঠিক জবাব দিতে লাগল। একটাও ভুল করল না। তখন শিকার ফস্কার দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, বলো, অকুতোভয় মানে কী?

নেপালী ভারী মুশকিলে পড়ল। কথাটা সে শুনেছিল বটে কিন্তু ঠিক মানে জানত না। কিন্তু উত্তর না দিলেও রক্ষে নেই। তাই সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, অকুতোভয় মানে কুকুরকে যে ভয় করে না।

বলাইবাবুর মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, হুঁ, ঠিক বলেছিস। এদিকে আয়।

নেপাল তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি যেন ভারী আদর করে চার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে মুঠি শক্ত করে বললেন, খাসা ছেলে! সোনার চাঁদ ছেলে! এবার তোকে একটা সোনার মেডেল দেব। বলে চুল ধরে নাড়া দিলেন।

কারুর বুঝতে বাকি রইল না যে বলাইবাবু আজ নেপালকে বাগে পেয়েছেন, সহজে ছাড়বেন না। বেড়াল যেমন আধমরা ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, তিনি তেমনি তাকে নিয়ে খেলা করছেন। কিন্তু গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। চুলে তার বিষম লাগছিল, কিন্তু সে একটু মুখবিকৃতি পর্যন্ত করল না।

বলাইবাবু মুধ-ঢালা সুরে বললেন, আচ্ছা, এবার বল তো নেপাল 'ইরম্মদ' মানে কি?

ইরম্মদ শব্দের মানেও নেপাল জানত না; কিন্তু সে ঠকবার পাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ইরম্মদ মানে ইরান দেশের মদ।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক গাট্টা। নেপালের মাথাটি আর একটু হলেই ফেটে হাঁড়ির মতন ফুটো হয়ে যেত। বলাইবাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন, তবে রে পাজি, এই বিদ্যে হয়েছে? ইরান দেশের মদ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা। দাঁড়াও আজ তোমার ইরান দেশের মদ বার করছি। এই বলে আর একটি গাঁট্টা মারলেন। ঠকাস করে শব্দ হল।

নেপাল দ্বিতীয় গাঁট্টা খেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল, দু-বার গোঁ গোঁ শব্দ করল, তারপর চুপ।

বলাইবাবু খানিকক্ষণ চড় বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু যখন দেখলেন নেপাল অনড় হয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নাম নেই, তখন তাঁর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, এই ন্যাপলা—ওঠ।

নেপাল নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে, নড়নচড়ন নেই। ক্লাসের ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। একজন বলল, স্যার, বোধ হয় মরে গেছে।

বলাইবাবু ধমক দিয়ে বললেন, মরবে কী? গাঁট্টা খেলে কেউ কখনো মরে?

একটা ছেলে, সে কিছুক্ষণ আগেই গাঁট্টা খেয়েছিল, বলল, ও নিশ্চয় মরে গেছে। আপনার গাঁট্টা কী সহজ স্যার, ওর মাথায় খুলি ছেঁদা হয়ে গেছে।

বলাইবাবু একেবারে সাদা হয়ে গেলেন। নেপাল উপুড় হয়ে পড়েছিল, তাকে চিত করে দেখলেন তার চোখ কপালে উঠে গেছে, দাঁতে দাঁতকপাটি। বলাইবাবু

কাঁপতে কাঁপতে একটা ছেলেকে বললেন, ওরে, যা শিগগির একঘটি জল নিয়ে আয়।

ওদিকে আর একটা ছেলে হেডমাস্টারকে খবর দিতে ছুটেছিল। বলাইবাবু কী করেন, নেপালের দাঁতকপাটি ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দাঁতকপাটি কিছুতেই ছাড়োনো যায় না। অনেক কষ্টে নেপালের মুখ একটু হাঁ হল। বলাইবাবু তার মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিলেন।

অমনি আবার দাঁতকপাটি! আর, সে কী ভীষণ দাঁতকপাটি! বলাইবাবু প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগলেন, ওরে ছাড় ছাড়—ন্যাপলা, গেলুম, ওরে তোর গুষ্টির গায়ে পড়ি, ছাড়—

কিন্তু নেপাল অচৈতন্য। বলাইবাবুর চিৎকার শুনতে পেল না। দাঁতকপাটির ঝোঁকে সে তাঁর আঙুল চিবোতে আরম্ভ করল।

এমন সময় হেডমাস্টারমশায় এসে উপস্থিত হলেন। নেপালের মাথায় জল ঢালা হতে লাগল; কেউ তাকে বাতাস করতে লাগল। তারপর বহুকষ্টে অনেকক্ষণ পরে নেপালের জ্ঞান হল।

বলাইবাবু যখন তার মুখে থেকে আঙুল বার করলেন তখন আঙুলটা ডাঁটা-চচ্চড়ির সজনে ডাঁটার মতন ছিবড়ে হয়ে গেছে।

সেই থেকে বলাইবাবু ছেলেদের গাঁট্টা মারা ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য মাস্টারেরাও কেউ নেপালের গায়ে হাত তোলেন না। কে জানে আবার যদি তার দাঁতকপাটি লাগে? বলা তো যায় না।

কিন্তু আসল গল্পটা এখনও আরম্ভই করা হয়নি। নেপালের নাম কী করে জেনারেল ন্যাপলা হল, তারপর সে কী করে নেপেলিয়ন বোনাপার্টি খেতাব পেল সেই কথাই আজ বলব।

শহরে দুটো স্কুল ছিল। একটা টাউন স্কুল, যাতে নেপাল পড়ত, আর একটা মিশন স্কুল। এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি—মারপিট লেগেই থাকত। ফুটবল হকি খেলা নিয়ে তাদের চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই রাস্তায়, মাঠে গঙ্গার, ধারে কোথাও দু-দল ছেলের দেখা হলেই প্রথমে কথা কাটাকাটি তারপর মারামারি বেঁধে যেত।

মারামারির জন্যে সর্বদা তৈরি হয়ে দু-পক্ষ রাস্তায় বেরুত; দু-পকেটে ঢিল ভরা থাকত, আর হাতে থাকত বেতের ছড়ি কিংবা খেজুরের ডাল। দূরে থেকে প্রথমে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি চলত, তারপর পকেটের ঢিল ফুরিয়ে গেলে ক্রমশ দুই পক্ষ এগিয়ে এসে ছড়ি চালাতে আরম্ভ করত। তাতেও যদি এক পক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করত তখন হাতহাতি, আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করে যুদ্ধের অবসান হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নেপালের স্কুলের ছেলেরা এসব খণ্ডযুদ্ধের বড়ো একটা জিততে পারত না। প্রায়ই মার খেয়ে তাদের চম্পট দিতে হত। তার কারণ মিশন স্কুলের ছেলেদের মধ্যে খুব বেশি একতা ছিল, আর ছিল তাদের কতকগুলো সাঁওতাল ক্রিশ্চান ছেলে। তাদের গা এত শক্ত যে তারা ঢিল-কিল গ্রাহ্য করত না,

একেবারে বাঘের মতন বিপক্ষদের মধ্যে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। যাহোক, সুখের কথা এই যে, বারবার হেরে গিয়েও টাউন স্কুলের ছেলেরা দমে যায়নি, সমানভাবে যুদ্ধে চালিয়ে আসছে।

একদিন দুপুরবেলা টিফিনের সময় ছেলেরা স্কুলের মাঠে এখানে-ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। এমন সময় ফুটবল হাফব্যাক সমরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে থেকে এসে হাজির হল। সে বাজারে পেনসিল কিনতে গিয়েছিল, তাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে সবাই বুঝলে একটা কিছু হয়েছে। সকলে উদগ্রীব হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল, সে তখন ব্যাপারটা বলল। বাজারে পাঁচজন মিশন স্কুলের ছেলেরা সঙ্গে তার দেখা হয়; তারা তাকে দেখে একসঙ্গে এতখানি জিভ বার করে ভেঙচাতে আরম্ভ করে। সে যেখানে যায় তারাও জিভ বার করে তার পিছন পিছন যায়। সমরেশ একা, তারা পাঁচজন, তাই সে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে সাহস করল না। শেষে দূর থেকে তাদের দু-হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, আজ বিকালে দেখে নেব, বলে সে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে।

গল্প শুনে সকলেরই রক্ত গরম হয়ে উঠল। বাজারের মধ্যে জিভ বার করে পিছন পিছন ঘুরে বেড়ানোর দারুণ অবমাননা সকলের মর্মে গিয়ে বিঁধল। দু-চারজন ছেলে তখনই গিয়ে তাদের শাস্তি দেবার জন্যে তৈরি ছিল, কিন্তু এই সময় ঘন্টা পড়ে যাওয়াতে প্রতিহিংসা সাধন আপাতত মুলতুবি রাখতে হল। স্থির হল, ছুটির পর দেখে নেওয়া যাবে।

স্কুলের ছুটির পর যথাসময়ে দুইপক্ষের দেখা হল এবং যুদ্ধ শুরু হল। ফল কিন্তু আশানুরূপ হল না। মিশন স্কুলের ছেলেরা জিভ বেঙচানোর খবর জানত, তারা তৈরি হয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দেখা গেল, যারা প্রতিহিংসা নিতে গিয়েছিল, তাদের হাতের চেয়ে পা বেশি চলছে এবং বিশ্বাসঘাতক পাগুলো সেইদিকেই চলছে যেদিকে শত্রু নেই।

সেদিন সন্ধেবেলা টাউন স্কুলের ছেলেরা ভারী মনমরা হয়ে নিজেদের খেলার মাঠে বসেছিল, ফুটবলে লাথি মারবার উৎসাহও ছিল না। এই দারুণ দুর্দিনে ছোটো-বড়োর ভেদজ্ঞানও ঘুচে গিয়েছিল, নিচু ক্লাসের ছেলে, উঁচু ক্লাসের ছেলে সবাই বিমর্ষভাবে এক জায়গায় বসে নিজেদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভাবছিল।

লালুর কপাল ঢিবি হয়ে ফুলে উঠেছিল, সে তাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠল, আমরা কি একবারও ওদের হারাতে পারব না? চিরকালই কেবল হেরে মরব?

সকলের মনে ওই কথাটাই ঘুরছে, তাই কেউ আর জবাব দিল না।

সুধা বলে একটি ছেলে, সে নেপালের বন্ধু, বোধ হয় সকলকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই বলল, সেদিন ন্যাপলা কিন্তু ওদের একটা ছেলেকে খুব জব্দ করেছে।

গিরীন ফুটবলের ক্যাপ্টন, বয়সেও সকলের চেয়ে বুড়ো, সে জিজ্ঞাসা করল, কী করেছে ন্যাপলা?

সুধা বলে উঠল, উঃ, সে ভারী মজা। ন্যাপলা করেছে কী একটা টিনের কৌটোয়—;এই ন্যাপলা, তুই নিজে বল না।

নেপাল কাছেই ছিল, গম্ভীরভাবে বলল, স্কুলে আসার পথে রোজ ও স্কুলের একটা হুমদো ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হত; সে আমাকে দেখলেই তাড়া করে মারতে আসত। আমি দৌড়ে পালিয়ে আসতুম। সেদিন একটা টিনের কৌটোয় কতকগুলো জ্যান্ত বোলতা পুরে নিয়ে আসছিলুম, ছেলেটা আমার তাড়া করল। আমি কৌটোটা ফেলে পালিয়ে এলুম। সে কৌটো তুলে নিয়ে যেই তার ঢাকনি খুলেছে, অমনি বোলতাগুলো বেরিয়ে তার মুখে কামড়ে দিল। দু-মিনিটের মধ্যে তার মুখ ফুলে একেবারে ফুটবল হয়ে গেল।

সকলের মুখেআ হাসি ফুটে উঠল। গিরীন জিজ্ঞাসা করল, তুই কৌটোয় বোলতা পুলি কী করে?

নেপাল যেন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন—কৌটোয় তলায় চিনি ছড়িয়ে বোলতার চাকের কাছে রেখে দিয়েছিলুম। তারপর চার-পাঁচটা বোলতা যখন চিনি খাবার জন্যে ভেতরে ঢুকল অমনি ঢাকনা বন্ধ করে দিলুম।

সবার হেসে উঠল। নেপালের বুদ্ধির পরিচয় তারা আগেও কিছু কিছু পেয়েছিল, এখন আবার নতুন করে পেয়ে বেশ খুশি হয়ে উঠল।

গিরীন অনেকক্ষণ নেপালের মুখের দিকে চেয়ে রইল; তারপর বলল, ন্যাপলা, তোর তো খুব বুদ্ধি, ওদের হারাবার কোনো ফন্দি বার করতে পারিস?

নেপাল তৎক্ষণাৎ বলল, পারি। এমন ফন্দি বার করতে পারি যে, ওরা হেরে ভূত হয়ে যাবে। আর কক্ষনো আমাদের সঙ্গে লড়তে আসবে না।

সকলে নেপালকে ঘিরে ধরল, কী ফন্দি! কী ফন্দি! ন্যাপলা, শিগ্‌গির বল, সকল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নেপাল বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলল, এখন বলব না, বললে সব মাটি হয়ে যাবে। গিরীনদা, তোমাদের তিন-চারজনকে চুপিচুপি বলতে পারি। আমি মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছি।

তখনই একটা কমিটি তৈরি হল, তার নাম হল 'সমর-সমিতি'।

গিরীন, নেপাল, লালু, সমরেশ, এই চারজন হল সেই সমিতির সভ্য। স্থির হল, এরা যা বলবে সেই মতে সকলকে চলতে হবে। কেউ যদি হুকুম অমান্য করে, তার শাস্তি হবে।

অতঃপর সমর-সমিতির সভ্যরা আড়ালে গিয়ে পরামর্শ করতে বসল। নেপাল তখন তার মতলব প্রকাশ করে বলল। শুনে সকলে একবাক্যে নেপালকে সেনাপতি করল। তার নাম হল জেনারেল ন্যাপলা।

মিশন স্কুলের ছেলেরা তাদের মাঠে বসে গল্পগুজব করছিল, এমন সময় সমরেশ একটা সাদা পতাকা হাতে করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সেনাপতি কে?

সমরেশ ফুটবল খেলোয়াড়, তাকে সকলেই চিনত। সাদা পতাকা নিয়ে তাকে এসে দাঁড়াতে দেখে সবাই ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল; এরকম ব্যাপার আগে কখনো ঘটেনি। একজন জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথা থেকে আসছ? কী চাও?

সমরেশ বলল, আমি টাউন স্কুল সমর-সমিতির দূত। তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিশন স্কুলের ছেলেরা চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তাদের খুব উৎসাহ হল। কিন্তু সেনাপতি তো তাদের কেউ নেই! এতদিন এলোপাতাড়ি যুদ্ধ চলেছে।

সেনাপতি নিযুক্ত করার কথা তাদের মনেই আসেনি। তারা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

কিন্তু সেনাপতি যে তাদের নেই একথা স্বীকার করতে পারে না। তাদের ফুটবলের ক্যাপ্টেন প্রতাপ সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, আমি সেনাপতি।

এই নতুন ধরনের খেলা পেয়ে মিশন স্কুলের ছেলেরা ভারী খুশি হয়ে উঠল। এ যেন জার্মানির সঙ্গে ফরাসির যুদ্ধ বাঁধবার উপক্রম হচ্ছে। দূতকে তারা খুব খাতির করে বসাল। কারণ দূত শুধু অবধ্য নয় তাকে অসম্মান করাও ঘোর অসভ্যতা।

সমরেশ আর প্রতাপ সামনা-সামনি বসল। প্রতাপ সেনাপতির উপযুক্ত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে, শত্রুর দূত, এবার তোমার কী বক্তব্য আছে বলো।

সমবেশ বলল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এসেছি।

সেনাপতি প্রতাপ বলল, উত্তম কথা। তোমাদের সেনাপতির কে?

সমরেশ বলল, আমাদের সেনাপতির নাম জেনারেল ন্যাপলা। নেপালকে এরা কেউ চিনত না, ভাবলে নিশ্চয় খুব জবরদস্ত সেনাপতি। গায়ে ভীষণ জোর।

সমরেশ বলতে লাগল, এখন আমাদের সমর-সমিতির বক্তব্য, শোনো। আমাদের আর তোমাদের মধ্যে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলে আসছে, কিন্তু সে যুদ্ধই নয়, ছেলেখেলা। আমরা চাই, একদিন রীতিমতো যুদ্ধ হোক। তোমাদের দলে ত্রিশজন যোদ্ধা থাকবে, আমাদের দলেও ত্রিশজন থাকবে। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে লড়াই হবে। তারপর এই লড়ায়ে যে পক্ষ হারবে চিরদিনের জন্যে তাদের হার স্বীকার করে নিতে হবে। তোমার রাজি আছে?

সব ছেলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, রাজি আছি, রাজি আছি।

সেনাপতি প্রতাপ হাত তুলে বলল, তোমরা চুপ করো, সেনাপতিকে বলতে দাও। তারপর কিছুক্ষণ মুখ ভীষণ গম্ভীর করে ভুরু কুঁচকে বসে থেকে বলল, আমরা তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত আছি। যুদ্ধ কবে হবে?

রবিবার বিকেলে তিনটের সময়।

আপত্তি নেই। কোথায় হবে?

আমরা স্থির করেছি, গঙ্গায় ধারে পশ্চিম দিকে যে বালির চড়া আছে সেইখানে যুদ্ধ হবে; কারণ সেখানে ওসময় বাইরের লোক কেউ থাকে না। কিন্তু তোমরা যদি অন্য কোথাও লড়তে চাও আমাদের আপত্তি নেই।

প্রতাপ বলল, না না, চড়াতেই যুদ্ধ হবে—সেই উপযুক্ত স্থান। কিন্তু হারজিত কী করে বিচার হবে?

সমরেশ বলল, যুদ্ধক্ষেত্রের দু-দিকে দুটো কাশের ঝোপ আছে, তাদের মাঝখানে যুদ্ধ হবে। যে দল কাশের সীমানা পার হয়ে পালিয়ে যাবে তাদেরই হার। রাজি আছ?

প্রতাপ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, রাজি আছি। রবিবার বেলা তিনটের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুত থেকো। হর হর মহাদেব।

সমরেশও যুদ্ধনিনাদ শিখে এসেছিল, সেও পতাকা তুলেল ধরে বলল, জয় চামুণ্ডে!

তারপর সেনাপতিকে ফৌজি কায়দায় স্যালুট করে সমরেশ ঝান্ডা কাঁধে করে চলে গেল।

দু-দিকে সমরসজ্জা চলতে লাগল। মিশন স্কুলে বাছাই করে ত্রিশজন ষন্ডা ছেলেকে সৈনিক দলভুক্ত করা হল। তারা চিরদিন জিতে এসেছে তাই তাদের মনে কোনো ভয় ছিল না, তারা চারদিকে বড়াই করে বেড়াতে করে বেড়াতে লাগল, এবার টাউন স্কুলের ছেলেদের মেরে পস্তা উড়িয়ে দেব।

নেপালের দলও যুদ্ধের জন্যে তৈরি হল। নেপাল ত্রিশজন খুব চালাক আর মজবুত যোদ্ধা বেছে নিল। ঢিল ছোড়া, লাঠি চালনার কুচকাওয়াজ চলতে লাগল। নেপাল বাঁশি বাজিয়ে তাদের পরিচালনা করতে লাগল।

শনিবার রাত্রে সময় সমিতির চারজন সভ্য চুপিচুপি যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। অন্ধকার ঘন্টা দুই ধরে তারা কী করল। তারপর চুপিচুপি ফিরে এল, কেউ জানতে পারল না।

রবিবার তিনটে বাজতে না বাজতে, দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হল; সকলের হাতে খেজুর ডালের ছড়ি, পকেটে ঢিল ভরা। যুদ্ধক্ষেত্রটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা, চওড়া ত্রিশ গজ। নেপালের দল দক্ষিণ দিকে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াল। মিশন স্কুলে উত্তর দিকটা অধিকার করল।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে নেপাল তার সৈন্যদের এক বক্তৃতা দিল, ভাই সব, ধীরেভাবে যুদ্ধ করবে, ঘাবড়াবে না। সেনাপতির হকুম শোনবামাত্র পালন করবে। বাঁশির সংকেত মনে আছে তো। এক ফুঁ আক্রমণ করবে, দুই ফুঁ দিলে পিছু হটবে, আর তিন ফুঁ দিলে—মনে আছে তো! ব্যস, বলো জয় চামুণ্ডে!

যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দুই পক্ষ প্রথমে নিজেদের কোটে থেকে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। নেপালের দল তিন সারিতে সাজানো ছিল, প্রত্যেক সারে দশজন করে। তারা বেশ ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই সব ঢিল তাদের গায়ে পড়ল না। মিশন স্কুলের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়ায়নি, এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কাজেই সব ঢিল তাদের মাথায় গিয়ে পড়ছিল।

মিশন স্কুলের ছেলেরা যার যখন ইচ্ছে ঢিল ছুঁড়ছিল, কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলছিল না। কিন্তু নেপালের দল জেনারেলের হুকুম শুনে ঢিল ছুঁড়ছিল। নেপাল হুকুম দিচ্ছিল, ফার্স্ট র‍্যাঙ্ক, ফায়ার। অমনি দশটা ঢিল একসঙ্গে শত্রুর মাথায় গিয়ে পড়ছিল। সেকেন্ড র‍্যাঙ্ক ফায়ার। অমনি আর একঝাঁক ঢিল ছুটছিল।

ক্রমে দুই দল পরস্পরের বিশ গজের মধ্যে এসে পৌছুল। মিশন দলের ঢিল তখন ফুরিয়ে গেছে, তারা চায় ছড়ি নিয়ে হাত হাতি যুদ্ধ করতে। কিন্তু নেপালের দল তখনও সমানভাবে ঢিল চালিয়ে যাচ্ছে। মিশন দল আর এগোতে পারছে না; তাদের দলের কয়েকজন জখম হয়ে পেছিয়ে গেল।

নেপাল যখন দেখল তার দলের ঢিল ফুরিয়ে আসছে তখন সে বাঁশিতে ফুঁ দিল—পিঁ।

অমনি তার দল জয় চামুণ্ডে বলে ছড়ি নিয়ে বিপক্ষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। মিশন স্কুলের ছেলেরাও এই চায়। হাতাহাতি লড়াই করতেই তারা বেশি মজবুত। তারা হর হর মহাদেও বলে মহা উৎসাহে লেগে গেল।

আজ কিন্তু নেপালের দলের বুকে ভীষণ সাহস, সেনাপতির বুদ্ধির ওপর তাদের অফুরন্ত বিশ্বাস। তারা জানে আজ তারাই জয়ী হবে, তাই মহা আনন্দে তারা আক্রমণ করল। যুদ্ধে দুই পক্ষই আহত হতে লাগল; কারুর পা কেটে গেল, কারুর কপাল ফুলে উঠল; কিন্তু কুচকাওয়াজের এমনি গুন যে নেপালের দলের একটি ছেলেও আজ যুদ্ধ ফেলে পালাল না।

পাঁচ মিনিট এইভাবে যুদ্ধ চলবার পর নেপালের বাঁশি বাজল—পিঁ—পিঁ।

নেপালের দল তখন পিছু হটতে আরম্ভ করল। যারা সামনে ছিল তারা যুদ্ধ করতে করতে ধীরে ধীরে পিছু হটতে আরম্ভ করল, যারা পেছিয়ে ছিল তারা নিজের কোটে ফিরে এসে দাঁড়াল। মিশন দলের ছেলেরা দেখল নেপালের দল রণে ভঙ্গ দিতে আরম্ভ করছে তখন তারা ভাবল, আর কী! মেরে দিয়েছি। যদিও তারা খুব হাঁপিয়ে পড়েছিল, তবু তারা দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুর কোটে ঢুকে পড়ল।

নেপালের দলের সবাই কোটে ফিরে এসেছে। শত্রু সামনে বিশ হাত দূরে। এমন সময় আবার নেপালের বাঁশি বাজল—পিঁ পিঁ পিঁ—

সঙ্গে সঙ্গে নেপালের দল এক আশ্চর্য কাজ করল। হাতের ছড়ি ফেলে দিয়ে বালির ওপর হাত রেখে তারা হাঁটু গেড়ে বসল; আবার যখন তারা উঠে দাঁড়াল তখন তাদের প্রত্যেকের দু-হাতে দুটি ঢিল। নেপাল হুকুম দিল, 'ফায়ার।' অমনি একঝাঁক ঢিল দিয়ে শত্রুর মাথায় পড়ল। তারা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, জয় চামুণ্ডে!

মিশন স্কুলের ছেলেরা হতভম্ব হয়ে গেল; ঢিল তো সব যুদ্ধের শুরুতেই ফুরিয়ে গেছে, তবে আবার ঢিল আসে কোথা থেকে?

তারা কী করে জানবে যে কাল রাত্রে সমর-সমিতির সভ্যরা এসে বালির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হাজার হাজার ঢিল পুঁতে রেখে গেছে। আর, আজ ঠিক সেই জায়গাতেই তারা গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপারটা যখন তারা ভালো করে বুঝতে পারল তখন তাদের বুক দমে গেল। তবু তারা একবার প্রাণপণে চেষ্টা করল সেই জায়গাটা দখল করতে। কিন্তু কার সাধ্য সেদিকে এগোয়। ত্রিশজন ছেলে মুহূর্তে মুহূর্তে বন্দুকের ছর্‌রার মতন ঢিল বৃষ্টি করছে।

তাদের হাতের ছড়ি কোনো কাজেই লাগল। না। বিশ হাত দূর থেকে ছড়ি আর কী কাজে লাগবে? এদিকে শিলাবৃষ্টির মতন ঢিল এসে পড়ছে। মিশনের ছেলেদের করুণ নাক থেঁতো হয়ে গেল, কারুর মাথা ফুলে উঠল, কেউ বা পায়ে জখম হয়ে ন্যাংচাতে আরম্ভ করল।

ক্রমে তারা যখন দেখল এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মার খাওয়া ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না—তখন তারা একে একে পালাতে আরম্ভ করল। নেপাল চিৎকার করে হুকুম দিল, জোরসে ভাই। আর একবার। ফায়ার!

আর মিশন স্কুলের দল দাঁড়াতে পারল না; প্রথমে তাদের সেনাপতি প্রতাপ চোয়ালে এক ঢিল খেয়ে দৌড়ে মারল। তারপর আর সকলে যে যেদিকে পারল চম্পট দিল। নেপালের দল মার মার করে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে খেদিয়ে দিয়ে এল।

স্কুলের খেলার মাঠে ফিরে এসে, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে গিরীন আর সমরেশ কাঁধে তুলে নিল। স্কুলসুদ্ধ ছেলে একসঙ্গে গর্জন করে উঠল—

জেনারেল ন্যাপলা কী জয়! নেপোলিয়ন কী জয়!

ভোম্বলদা

বনফুল

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা।

দেখা হইলেই মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া ওঠে। হাতে এক টিপ নস্য লইয়া এবং নাকের আশপাশে নস্য লাগাইয়া ভোম্বলদা সকাল হতেই রাস্তার মোড়টিতে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং পরিচিত পথিমাত্রকেই হাস্যমুখে সম্ভাষণ করেন।

ইহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য।

'মাতুল যে, মাছ কত করে কিনলে? গ্র্যান্ড মাছ তো? ছ'আনা সের? বল কি!'

'বাজার দর অবশ্য আট আনা, আমি পেয়েছি ছ'আনাতে।'

ভোম্বলদা সবিস্ময়ে বললেন—'ড্যাম চীপ্!'

সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারেন বলিয়া মাতুলের অহঙ্কার আছে। কেহ সে কথার উল্লেখ করিলে তিনি খুশি হন। মাতুলের কিন্তু দাঁড়াইবার সময় ছিল না—আপিস আছে। তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

'ভূতো যে রে, মাছ কিনেছিস দেখছি—কত করে পেলি? ছ'আনা সের? ভ্যাম—'

ভোম্বলদাদার কথা শেষ করিতে না দিয়াই ভূতো সক্ষোভে বলিয়া উঠিল—'আর বল কেন ভোম্বলদা! আমাদের মত লোকের লোটা-কম্বল নিয়ে বেড়িয়ে পড়াই উচিত হয়েছে এবার! ছ'আনা সের মাছ? কিনে খেতে পারি আমরা!'

ভোম্বলদা চক্ষু কপালে উঠল।

'ছ আনা সের! বলিস কিরে! গলা কাটছে বল!'

ভূতো বলিতে লাগিল আধসের কিনেছি—এই দেখ না—বড়জোর পাঁচ পিস হবে—তিন গণ্ডা পয়সা অর্থাৎ টুয়েলভ পাইস কিন্তু সাফ হয়ে গেল।'

'দিনকাল বড় খারাপ পড়ল—সত্যি।'

বলিয়া ভোম্বলদা সশব্দে নস্যটা টানিয়া লইয়া নস্যাতিভূত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিন্তান্বিত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

'এক টিপ আমাকেও দাও ভোম্বলদা! আমার নাকেই ঢুকিয়ে দাও—দুটো হাতই জোড়া আমার—'

ভোম্বলদা এক টিপ নস্য ভূতোর নাসারন্ধ্রে ধরিলেন।

ভূতো যথাসম্ভব টানিয়া চলিয়া গেল।

অদূরে অক্ষয়বাবু দেখা দিলেন।

অক্ষয়বাবু কংগ্রেস সেবক এবং উগ্র খদ্দরধারী। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির পাণ্ডা সেই সূত্রে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

কাছে আসিতেই করতল হইতে নস্য ঝাড়িতে ভোম্বলদা সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

'অক্ষয়বাবু, কাল আপনার বক্তৃতাদি সত্যই চমৎকার হয়েছিল—যাকে বলে হৃদয়গ্রাহী। আরে, এ যে পাঞ্জাবি করিয়েছেন—খদ্দর নাকি? দেখি,দেখি—বাঃ—'

পাঞ্জাবির কাপড়টা হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ভোম্বলদা বলিলেন—'বাঃ এ প্রায় সার্জের মতন। চমৎকার জিনিস তো!'

চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া মোটা গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করার মতন ধরনে অক্ষয়বাবু বলিলেন,—'সাজই হোক আর চটই হোক, খদ্দরই এখন আমাদের একমাত্র গতি—উপায় নেই এ ছাড়া—'

বলিয়া চক্ষু দুইটি হঠাৎ ছোট করিলেন। ইহা তাহার নিজস্ব কায়দা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদা বলিলেন—'সে কথা আবার বলতে! দেশের জন্য আপনারা প্রাণপাত করেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দেশের বুকে। স্যাক্রিফাইস না হলে কিছু হয়! খদ্দরটা বেশ কিন্তু চমৎকার। খাপির ওপর বেশ ইয়ে কত করে গজ?'

'দেড় টাকা বোধ হল। ঠিক মনে নেই।'

'দামেও তো এমন কিছু বেশি নয়—বাঃ।'

'ছাড়, একবার নিবারণ ঘোষালের কাছে যেতে হবে। লোকটা শুনেছি অ্যান্টিকংগ্রেস প্রেগাপান্ডা করছে!'

ভোম্বলদা পাঞ্জাবির কাপড়টা দেখিতেছিলেন, ছাড়িয়া দিলেন। দেখা দিলেন দয়াময় খুড়ো। খুড়ো রাস্তার ওপাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ভোম্বলদা হাঁকিলেন—খুঁড়ো, পাশ কাটাচ্ছে যে! খবর সব ভাল তো?'

খর্বকায় বালাপোষ আবৃত খুড়ো রাস্তা পার হইয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—'খবর আর কি? সূর্যচন্দ্র এখনও উঠছে, ভালর মধ্যে এই। সারা বাজারটা ঢুঁড়ে বিলিতে গরম মোজা একজোড়া পেলাম না হে!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ হে। আগে সেই যে সাদা—একটু হলদেটে-গোছের একরকম মোজা আসত! একজোড়া কিনলেই নিশ্চিন্দি! পরেও আরাম—টেকে অসম্ভব। গত বছরের আগের বছর কিনেছিলাম একজোড়া। ঠেসে—মেড়ে এক বছর পরেছি। এ বছর কিন্তু আর পাচ্ছি না। ঐ যে মোড়ে এক ডেঁপো ছোকরা কাটাকাপড়ের দোকান

করেছে—সে তো লম্বা এত লেকচার ঝেড়ে দিলে—বিলিতি কেনা উচিত নয়। সে কি আমাকে শেখাবি তুই? কিন্তু ওরকম মোজা বার করুক দিকি দিশি—দেখাক দিকি আমাকে!'

বলিয়া রোগা দয়াময় খুড়ো সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দক্ষিণ হস্তটি চক্রাকারে নাড়িয়া দিলেন।

ভোম্বলদা সহাস্যমুখে কিছুক্ষণ দয়াময় খুড়োর দিকে তাকাইয়া রইলেন। তাহার পর কৌটা হইতে এক টিপ নস্য লইতে লইতে চাপা কণ্ঠে চুপি চুপি বলিলেন—'সব কথা চেঁচিয়ে বলতে নেই আজকাল খুড়ো—এইমাত্র অক্ষয়বাবু গেলেন। বিলিতি জিনিসের তুলনা আছে? যাকে বলে মার নেই। কাকে বলি বলুন! আজকাল অক্ষয়বাবুদের পোয়া বারো। দিনকাল যা পড়ল ভাল জিনিস মেলাই দুর্ঘট।'

ভোম্বলদা এমন একটা মুখভাব করিলেন যেমন মনের গোপন কথাটি দয়াময় খুড়োর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিয়া তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

খুঁড়ো বলিলেন—ঐ যে বললাম আজকাল ভালোর মধ্যেই এই যে চন্দ্রসূর্য এখনও উঠছে। যাই, দেখি, মাড়োয়ারীদের দোকানগুলো খুঁজি একবার। থাকলে ঐ ব্যাটাদেরই ওখানে থাকবে। শীতও বেজায় পড়েছে হে।

'কই আর কিছু হল!'

খুড়ো গেলেন।

আসিল ফণী।

চর্তুদশবর্ষীয় একটি বালক—স্থানীয় পড়ে।

তাহার সহিতও ভোম্বলদা ফুটবল খেলা লইয়া আলোচনা করিলেন, তাহাকেও এক টিপ নস্য দিলেন। তাহাদের স্কুলের টীম সেদিন ম্যাচ গোলে হারিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ যে, রেফারির পক্ষপাতিত্ব, সে বিষয়ও তাহার সহিত একমত হইলেন।

ফণী চলিয়া গেলে আসিলেন টেকো ভট্টাচার্ড।

ভট্টাচার্য মহাশয় আধুনিক ছেলেছোকরাদের নিন্দাবাদে সর্বদাই শত মুখ। তিনি আসিয়াই আধুনিক ছেলেমেয়েদের ধর্মহীনতা ও স্লেচ্ছাচার প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং ভোম্বলদার আন্তরিক অনুমোদন পাইলেন।

একটু পরেই অতি আধুনিক ছোকরা বিমল আসিল এবং ধর্মই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং সস্তায় মধ্যে মুরগির ডিমই যে নির্ভোজাল শ্রেষ্ঠ খাদ্য—ইহা লইয়া আলোচনা করিল এবং সেও ভোম্বলদার সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল।

এইরূপ অনেকে আসিল এবং গেল।

নস্যের টিপ হাতে ভোম্বলদা সারা সকালটা মোড়ে দাঁড়াইয়া সকলের সহিত সকল বিষয়েই একমত হইলেন।

ভোম্বলদার মনটি যেন জলবৎ—যখন যে পাত্রে রাখা যায় তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এই জন্যেই সম্প্রতি তাঁহার চারকরিটি গিয়েছে।

আপিসে বড় বাবুর কাছে ছোটবাবুর সম্বন্ধে এবং ছোটবাবুর কাছে বড়বাবুর সম্বন্ধে এমন সব কথা সারল্যভাবে ভোম্বলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে উভয়েই তাঁহার উপর মর্মান্তিক চটিয়া যায়—ফলে চাকরিটি যায়।

ভোম্বলদা সকলের মন রাখিয়া কথা বলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কখনও কাহারও মন পান না। সকলেই সকাল কথায়, সায় দেন, কিন্তু কেহই যেন তাকে আমল দেয় না। এমন কি নিজের গৃহিণীও নয়। বাড়িতে সকলপ্রকার আচরণের সহিত সায় দিতে গিয়ে এবং পরস্পর বিরোধী কথা বলিয়া ফেলিয়া গৃহিনীর নিকট প্রায় প্রত্যহই বকুনি খান এবং অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে ইহা লইয়া এত অশান্তির সৃষ্টি হয় যে ভোম্বলদা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

তখন ভোম্বলদার মুখখানি দেখিলে সত্যই কষ্ট হয়। তাঁহার তরল মনটি কিছুতেই যেন কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না। অসহায় বিপন্ন মুখচ্ছবি।

দূরে গঙ্গায় ওপারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। সরল গোলগাল মুখখানি বিমর্ষ। হাসি নাই।

ওভারকোট

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিকেলবেলা, গ্রে স্ট্রিটের ধারে এক চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম ওদিকে ফুটপাথে আমাদের পাড়ার ভূতনাথবাবু। চায়ের পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে রাখলাম। বুঝলাম রাতের খাওয়া আজ আর জুটছে না।

ভূতনাথবাবুদের কাঠের কারবারে অনেক পয়সা। তা ছাড়া অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি বন্ধক রেখে উঁচু সুদে টাকা ধার দেওয়া তাঁর আর এক ব্যবসা। যারা ঠিক সময় ধার শোধ করতে পারে না, তাদের বাড়ি—ঘর তিনি আত্মসাৎ করেন। তারপর দেন বেঁচে। এই করে তিনি জমিয়েছেন বিস্তর, কিন্তু এমন কৃপণ ভূ-ভারতে আর দেখা যায় না। খান চুনো মাছ আর পুঁই চচ্চড়ি, নাপিতকে পয়সা দিতে হবে বলে এক মুখ দাড়ি আর একমাথা চুল তাঁর কায়েমি হয়ে আসে। বয়সে বুড়ো, পায়ে তালপাতার চটি, গায়ে একটা গরম ওভারকোট। শীত-গ্রীষ্ম মানেন না, ওভারকোটেই তাঁর গাত্রাবরণ। ওজনে সের পাঁচেক হবে। এ-পিঠে ও-পিঠে কম-সে-কম পঁচিশটা পকেট! কাঠের কারবারের লাভের প্রথম টাকা দিয়ে চোরাবাজার থেকে দু-তিন হাত ফেরতা ওই কোটটি তিনি কেনেন সস্তা দামে। সে আজ বত্রিশ বছর হল। সেই থেকে ওই কোটটা তিনি গা থেকে আর নামাননি। খালি রবিবার তিনি জামা খুলে স্নান করেন, কেন না সেদিন দোকান তাঁর বন্ধু থাকে। ঘুমোবার সময় কোটটিকে কখনো করেন লেপ, কখনো মাথায় বালিশ, কখনো বা মাত্র তোশক, অর্থাৎ কোটটা তাঁর গায়েই থাকে। কোটটার সর্বাঙ্গেই তালি আর সেলাই। ভূতনাথবাবুর ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খালি তাঁর পকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে।

ওই ওভারকোটটি দেখলে সেদিন আর খাওয়া জোটে না, এমনি একটা প্রবাদ ও পাড়ায় প্রচলিত ছিল। ওর বাড়ির নম্বর হচ্ছে ১১৩ ম্যাট্রিকে নবীনের রোল নম্বর ১১৩ ছিল বলেই নাকি সে আর পাস করতে পারেনি। অন্তত আজকে আমার চা খাওয়া যে বন্ধ হল তাতে আর সন্দেহ কী? ভূতনাথবাবু নিচু হয়ে রাস্তার ধুলো কাঁকর ঘাঁটতে

ঘাঁটতে রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে আমরাই কাছে একে হাজির হলেন দেখছি। আমাকে দেখেই তাঁর ভেউ ভেউ কান্না, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, হিরু। একেবারে পথে বসিয়েছে, একেবারে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললাম, কী কী হল? মোটর চাপা? গাঁটকাটা? এমন করছেন কেন? একটা গাড়ি ডেকে দেব? বসে পড়লেন কেন ধুলোর ওপর? মাথা ঘুরছে? হাওয়া করব একটু? কী হয়েছে বলুন না ছাই। মৃগী আছে নাকি? পাহারাওয়ালা ডাকব?

পাহাড়ারওয়ালার নাম শুনেই বোধ হয় বুড়োর জ্ঞান এল। অমনি আমার হাত দুটো চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন, আমাকে একেবারে গাছতলার ভিখিরি করে ছাড়লে। একটা জ্বলজ্যান্ত একশো টাকার নোট হাত থেকে হাওয়ার উড়ে গেল।

হাওয়ার উড়ে গেল? বলেন কী?

হ্যাঁ ভাই! জানই তো টাকাকড়ি আমি আমার পকেটে রাখি না; ব্যাটারা টের পেয়ে কখন ঠিক পকেট মেরে দেবে। সেই ভয়ে সব সময়ে রাখি হাতের মুঠোয়! সকালে আজ আমাদের মিনি বেড়ালটার বাচ্চা হয়েছে তারাই দুটো পকেটে ছিল। সে দুটোর কোনো সাড়াশব্দ নেই দেখে পকেটে কখন অজান্তে হাত ঢুবিয়ে দিয়েছি, অমনি দেখি হাতের মুঠোয় নোট নেই।

বললাম, আর বাচ্চা দুটো?

ভূতনাথবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, দুত্তোর বাচ্চা। আমার গেল একশোটা টাকা, ছ-হাজার চারশো পয়সা, আর তোমার কাছে বেড়ালের বাচ্চা দুটো বড়ো হল? কলেছের ছোকরা, বাপের পয়সায় চা খাও, তোমাদের কী?

অপরাধীর মতো মুখ করে বললাম, কিন্তু আমাকে কী করতে হবে?

লোকের উপকার করতে কী তোমরা এগোও? সে ছিল আমাদের সময়, পরের জন্যে বিষ খেতে পারতাম। একশোটা, টাক, বারো হাজার আটশোটা আধলা, আমার কী হবে হিরু? আমার সঙ্গে একবারটি এসো না ভাই। পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম সেই কালীতলার কাছে, সেখান থেকেই ফুটপাত ধরে খুঁজে খুঁজে আসছি। খালি একটা ফুটপাত দেখা হয়েছে, তুমি একবারটি ওদিকটা দেখতে দেখতে এগোবে ভাই?

অবাক হলে বললাম, বলেন কী! কালীতলা পর্যন্ত?

আমার পিঠে হাত রেখে ভূতনাথবাবু বললেন, যদি খুঁজে পাও হিরু, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়ি ফিরে যাবার ট্রাম-বাড়া দেব। ডবল এক কাপ চা! তুমি তো পকৌড়ি খুব ভালোবাস।

অগত্যা ফুটপাত ধরে খুঁজতে খুঁজতে এগোতে লাগলাম। আমি ডাইনের ফুটপাতে, উনি বাঁয়ে। হঠাৎ এক সময়ে চেয়ে দেখি ভূতনাথবাবু এক রাজ্যের পথ পিছে পড়ে আছেন, আমি চলেছি তাড়াতাড়ি, উনি শামুকের মতো। ফিরে গিয়ে ওঁকে ধরলাম। দেখি একটা ডাস্টবিনের মধ্যে মুখ নামিয়ে উনি হাত দিয়ে ময়লা ঘাঁটছেন। তাঁর ওভারকোটে এক টান মেরে বললাম, এ করছেন কী?

ভূতনাথবাবু মুখ তুলে বললেন, বলা তো যায় না, কোনো ছোটো ছেলে হয়তো কুড়িয়ে পেয়ে এইখানে ফেলে গেছে। সবাই তো আর নোট চেনে না। তুমি পেলে না এতক্ষণেও? তুমি কিছু কাজের নও, হিরু। পার খালি চা গিলতে। ওদিকটা তা হলে কিন্তু দেখা হয়নি? আমি যাই ওপারে, তুমি এদিকটা দেখতে দেখতে এগোও।

ভূতনাথবাবু ওদিকের ফুটপাতে চলে গিয়ে এক পা এগোন আর হেঁকে ওঠেন, হিরু পেলে? চোখ যদি এতই খারাপ, তবে চশমা নাও না কেন? অন্ধকারে দেখতে না পেলে একটা দেশলাই কিনে নাও শিগগির! মোটে একটা তো পয়সা। পরের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতে পার না? তোমাদের বয়সে আমরা—ও কী, হিরু?

পাশের একটা গলি গিয়ে সরে পড়ছিলাম, ভূতনাথবাবু পেছন থেকে কখন ছুটে এসে ঘাড় চেপে ধরলেন। বললেন, কোথায় পালাচ্ছ?

বললাম, নোটটা তো আপনার উড়ে এসে এই গলিতেও পড়তে পারে, কী বলেন? এ দিকেই বরং একটু খুঁজে দেখি না।

ভূতনাথবাবু অসহায়ের সুরে বললেন, তার চেয়ে আমার বাড়ি চলো, হিরু। বাড়িতেই না হয় খুঁজি গে।

অবাক হয়ে বললাম, এই না বললেন নোটটা রাস্তার মাঝে হাত থেকে উড়ে গেছে, বাড়িতে পারেন কী করে?

বলা কী যায়? ওটার পেছনে পেন্সিল দিয়ে আমার নাম ঠিকানা লেখা ছিল যে। কেউ পেয়ে পুলিশের ভয়ে হয়তো শেষকালে আমার বাড়িতেই ফিরিয়ে দিতে গেছে। শিগগির চলো, হিরু, বেশি দেরি করলে লোকটার হয়তো দেখা যাব না।

হেসে বললাম, আমার গিয়ে কী হবে?

না না চলো, লোকটার দেখা না পেলে কাল সকালে বরং রাস্তায় আবার খোঁজ যাবে। কাল যদি খুঁজে পাও হিরু তো তোমাকে ঠিক একখানা একসারসাইজ খাতা কিনে দেব। রুল-টানা খাতা তো? আচ্ছা। চলো বাড়িটার তেতালার ছাতে শুনেছি নাকি ভূত আছে। তুমি তো শুনেছি খুব সাহসী, লণ্ঠনটা নিয়ে ছাতটাও একবার খুঁজে আসবে।

বললাম, হ্যাঁ কারও ঘুড়ির ল্যাজের সঙ্গে নোটটা আপনার হাতে উড়ে আসতে পারে।

গম্ভীর হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, আশ্চর্য কী?

মজা দেখতে অগত্যা তাঁর বাড়িতেই এসে হাজির হলাম। ট্রামে বাসে তিনি চাপবেন না; যে পথে তিনি আগে হাঁটেননি, সেই পথেও ধুলোবালি তিনি হাতড়ে চলেছেন। বললাম, এখানে আপনার নোট কী করে আসবে? এই পথে তো আসেনইনি আগে। হারিয়েছে তো সেই কালীতলার কাছে।

ভূতনাথবাবু একটা কাঠি দিয়ে রাস্তার কতগুলো আবর্জনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, এখানে তো হারাতে পারে নোটটা। আশ্চর্য কী? এক জায়গায় হারালেই হল—হাসব না কাঁদব কিছু ভেবে পেলাম না।

বাড়ি এসে ভূতনাথবাবু এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনি বউ-ঝি সবাইকে ডেকে জড়ো করে বাড়ির চতুর্দিকে আনাচেকানাচে নোট খুঁজতে পাঠালেন। না পেলে কাউকে আর তিনি আস্ত রাখবেন না। ছেলের বউদের বললেন, শিগগির ট্রাঙ্ক প্যাঁটরা খুলে আর করো নোট; নাতি-নাতনিদের বললেন, নিয়ে আর তোদের বই—খাতা, কার ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিস? ভূতনাথবাবু একেবারে খেপে গেছেন। এবার তোশক বালিশ সব ফাড়তে শুরু করেছেন। কারও বারণ তিনি কানে তুলবেন না। বাধা দিয়ে বললাম, নোট আপনার বিছানা বালিশের মধ্যে ঢুকবে কী করে?

ভূতনাথবাবু বললেন, তুমি জান না হিরু, এ নোট যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। এক জায়গায় পেলেই হল। তুমি একবারটি নর্দমাটার হাতে ডুবিয়ে দেখো না ভাই। পেলে এবার তোমাকে ঠিক একটা ঘড়ির ব্যান্ড কিনে দেব। এ বছর ঘড়ির ব্যান্ড হলে আসছে বছর নিশ্চয়ই একটা আস্ত ঘড়ি হবে।

নাতি-নাতনিদের কাউকে দেবেন পুরোনো ট্রামের টিকিট, কাউকে ছেঁড়া বইয়ের মলাট, কাউকে বা পাঁজি থেকে ছিঁড়ে ভৃগু রাজা শনি মন্ত্রীর ছবি! কিন্তু কেউই খুঁজে পায় না! জিনিসপত্রে কাপড়চোপড়ে ঘর-বাড়ি এক হাঁটু হয়ে উঠল।

এমনি সময় ভূতনাথবাবুর মেজো ছেলে বাজার থেকে তিন আনা সেরে চারটে প্রকাণ্ড ইলিশ মাছ কিনে এনে হাজির। ইলিশ মাছ দেখে ভূতনাথবাবু একেবারে তেড়ে বললেন, আমার হাত থেকে একশোটা টাকা উড়ে গেল, আর উনি এনেছেন ইলিশ মাছ কিনে! ব্যাটা, দূর হ আমার বাড়ি থেকে। বলে বুড়ো ভদ্রলোক বরদার হাত থেকে মাছের বাস্তিলটা কেড়ে নিয়ে দূরে নর্দমার দিকে ছুড়ে ফেললেন। বরদা তো থ। ভূতনাথবাবু তার কানটা ধরে বললেন, 'ব্যাটা খুঁজে বার কর আমার নোট নইলে তোরই একদিন কী আমারই একদিন।

কে একটা ছোটো মেয়ে মাছ কাটার দিকে এগোচ্ছিল, ভূতনাথবাবু প্রবল কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, খবরদার পেটি, ওই মাছ ছুঁবি তো তোকে আমি বঁটিতে কাটব। আমার গেল একশোটা টাকা, আর ওরা এলেন স্ফুর্তি করতে। আমাদের বাড়ির কেউ ও মাছ ছুঁতে পারবে না। তোরা সবাই চেঁচিয়ে শোক করতে পারিস না? তাহলেও তো আমার বুকটা জুড়োয়। গঙ্গায় টাটটা ইলিশ। ভাবলাম দুটো সরাই—বুড়ো ঘরের মধ্যে দা দিয়ে তাঁর খাটের জাজিম ফাড়ছেন, উঠোনটুকু পেরিয়ে মাছগুলির দিকে এগোচ্ছি, কোথা থেকে হুমমুড় করে তেড়ে এলেন—নিলে নিলে, মাছ নিয়ে পালালে, বরদা। ধর হিরুকে। কে জানে ওই মাছের পেটের মধ্যে আমার একশো টাকার নোটটা লুকিয়ে আছে কি না। ধর-ধর—গেল-গেল।

উঠোন পেরিয়ে ভূতনাথবাবু নিজেই আমাকে ধরতে আসছিলেন, কিন্তু পা হড়কে গিয়ে একেবারে চিৎপাত!

অমনি তাঁর ওভারকোটের পকেট ঠেলে রাজ্যের জিনিসপত্র বেরিয়ে আসতে লাগল। সবাই তাঁকে ধরাধরি করে তুলে বললে, আপনার কোটটাই একাবার দেখুন না নেড়েচেড়ে কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে।

ভূতনাথবাবু কিছুতেই কাউকে কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে দেবেন না। বললেন, সব টাকাপয়সা আমি হাতের মুঠোয় রাখি, সিকি দুয়ানিগুলো কানের ফুটোয়। নোট ওর মধ্যে যাবে কী করে?

কিন্তু সবাইয়ের বাক্স তোরঙ্গ তিনি ওলট-পালট করেছেন, তাই কেউ তাঁকে ছাড়লেন না। গায়ে থেকে জামা খুললেন না বটে, কিন্তু সবাই মিলে তাঁর পকেট উজাড় করতে লাগলেন।

নোট তো নয়, ছোটোখাটো একটি জাদুঘর! নিচের পকেট থেকে প্রথমে বেরোল বেড়ালের মরা বাচ্চা দুটো, বড়ো ছেলে জ্ঞানদার চুষিকাঠি, বরদার ঝুমঝুমি, ঘড়ির স্প্রিং, চুলের কাঁটা, খলনোড়া, কাচের টুকেরা, দড়ি, ভাঙা চামচ—কী যে তাতে নেই তার হিসেব কে করবে?

কিন্তু নোট কোথাও পাওয়া গেল না। সদর ও খিড়কি সমস্ত পকেটই তন্নতন্ন করে দেখা হল—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!

এই দেখে ভূতনাথবাবু আরেকবার ভেউ—ভেউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন—তবে কোটের পকেটেও নোট নেই? আমার শেষ পর্যন্ত আশা ছিল কোটের একটা না একটা পকেটে ওকে পাবই। এত সব পুরোনো জিনিস পাওয়া গেল আর সদ্য হারানো নোটটা পাওয়া যাবে না? আমার কী হবে? বলে তিনি কোটটা খুলে ফেলে একটা কাঁটি দিয়ে তার লাইনিং কাটতে শুরু করলেন।

কে—একজন বললেন, নোটটা তো আপনার হাত থেকে উড়ে গেছে বললেন, কোটটা কেটে আর কী হবে? ভূতনাথবাবু চটে বললেন, থাকলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না? এত জিনিস থাকতে কারো আপত্তি নেই, একটা একশো টাকার নোট থাকবে এই আর কারোর সইছে না!

কিন্তু কোটটা কুটিকুটি করেও নোটের সন্ধান মিলল না। ভূতনাথবাবু দাড়ি-চুল ছিঁড়ে কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগলেন।

অফিসের কাজকর্ম চুকিয়ে দোকাপাট বন্ধ করে এমনি সময় ভূতনাথবাবুর সরকার ব্রজেন এসে উপস্থিত। কান্নাকাটি গোলমাল শুনে ভেতরে এসে শুধোল—ব্যাপার কী? সব দেখে শুনে তো তার চক্ষুস্থির! আমাকে ও বরদাকে ডেকে নিয়ে ব্রজেন বললে, নোটটা তো কর্তা দোকানের দেরাজেই ফেলে এসেছেন, আনেননি মোটেই। আমিই সেটা পৌঁছে দিতে এসেছি।

ব্রজেনের হাত থেকে নোটটা নিয়ে আমি ছাতে উঠে গেলাম। অন্ধকার গিয়েই চ্যাঁচানি শুরু করে দিলাম, আপনার নোট পেয়েছি ভূতনাথবাবু। শিগগির উঠে আসুন। সিঁড়ি বেয়ে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে ছাতে উঠে এল, কিন্তু ভূতনাথবাবু সিঁড়ি কিছুতেই ডিঙোবেন না, তাঁকে ভূতে ধরবে। বললাম, আমরা সবাই আছি ভয় কী?

ভূতনাথবাবু বললেন, শিগগির নেমে এসো হিরু। সত্যিই এবার তোমাকে ল্যাচার দিকে একখানি ইলিশ মাছ কেটে দেব। নিশ্চয়ই নিজের হাতে কেটে দেব হিরু!

হাসতে হাসতে নিচে নেমে এলাম। তাঁর হাতে নোটটা ফিরিয়ে দিতেই তিনি 'ভজ নিত্যানন্দ' বলে দু-হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলেন। নাচ থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলে নোটটা? ছাতে?

বললাম, হ্যাঁ। ছাতে উঠতেই সেই ভূতের দলের সঙ্গে দেখা। আমার হাতে নোটটা দিয়ে একজন বললে, আমাদের রাজার কষ্ট আর সইতে পারি না; এই নাও তাঁকে তাঁর নোট ফিরিয়ে দাও। আমরা হলাম তাঁর প্রজা, তিনি হচ্ছেন ভূতনাথ।

এক গাল হেসে ভূতনাথবাবু বললেন, তা আশ্চর্য কী?

মামাদাদার কুষ্ঠি ফলন

লীলা মজুমদার

সিধু, সন্তুর মামাদাদা মণিমঙ্গল বলতেন তাঁর কুষ্ঠিতে নাকি লেখা আছে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর প্রচুর অর্থ সমাগম হবে। তা যখন হবেই, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি দু'হাতে খোলামচুকির মতো টাকা ওড়াতেন। তাঁর মতো সাধুসজ্জনেরো টাকা ফুঁকে দেবার যে কত বিচিত্র সদুপায় জানা ছিল, তাই দেখে সিধু-সন্তু শ্রদ্ধাভক্তিতে এক্কেবারে বিগলিত হয়ে যেত।

না, দান-খয়রাৎ করতেন না। বলতেন, 'ওতে পাপ হয়। মানুষকে কুঁড়ে হতে শেখানো হয়। তারা নানা বদভ্যাস ধরে। তাছাড়া ওটা নিশ্চয় বিধাতা-পুরুষের ইচ্ছাও নয়; কারণ তাই যদি হতো, তাহলে তিনি নিজেই তো মচ্ছি ভেঙে ওদের দিতেন।'

এইখানে বাধা দিয়ে সিধু জিজ্ঞাসা করল, 'মচ্ছি কাকে, বলে মামাদাদা?'

মামাদাদা চটে গেলেন, 'তাও জানিস না হতভাগা? ইস্কুলে কি শেখায় তোদের? মাইনে তো নেয় যথেষ্ট। মচ্ছি হলো গিয়ে ইয়ে কি বলে—নাঃ, আমাকে কেন বলতে হবে? শিবঠাকুরের অফুরন্ত ধনসামগ্রীর তালিকা তৈরি করতে আমরা কি সময় আছে, না। বিদ্যেয় কুলাবে তার চেয়ে বললেই পারিস রেকাবিং ডেসিমেলের ফুটকির পর যতগুলো সংখ্যা আছে, সব লেখা। তাঁর নিজের মচ্ছি তিনি ভাঙবেন, তাতে আমার কিছু বলা শোভা পায় না আর তোদের জানতে চাওয়াটাই হলো স্রেফ বেয়াদবি!'

সন্তু বলল, 'আমি জানতে চাইও না এবং মনে করি যত কম জানা যায় ততই ভালো। তারপর কি হয়েছিল বলো।'

মামাদাদা বলে চললেন, 'তোদের দেখে আমার কষ্ট হয়। খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, এখানে-ওখানে বেড়াচ্ছিস। ভাবছিস কি সুখেই না আছিস! জানিস নে তো অর্থই অনর্থের মূলে। বেড়ে আছিস। খাজনা দিতে হয় না। আয়কর কাকে বলে, কত রেট, কিছুই বুঝিস না।'

সন্তু বলল, 'একেবারেই যে জানি নে তা ভেবো না। ক্লাস সেভেনে পড়ি। নম্বর কম পেতে পারি। তাই বলে কি এক্কেবারে মুখ্যু? পাঁচটা সাজা পান তোমার জন্য চুরি করে এনে দিলাম, এবার গল্প শুরু কর।'

মামাদাদা ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুনিয়াটা বড় কঠিন স্থান রে, কেউ কারো জন্যে মিনিমাগ্না কিচ্ছু করে না। সে যাকগে। আমি তো বাপের সম্পত্তিতে আমার ভাগ্যটা কোন কালে দাদাদের কাছে লেখাপড়া করে বেচেবুচে দিয়ে হাত-পা ঝাড়া হয়েছিলাম, তা ভালো করে মনেও নেই। বাকি ছিল শুধু মামাবাড়ির সম্পত্তিতে আমার অংশ একটা দশ ভরি সোনার মোটা তাগা আর কোন পাণ্ডববর্জিত স্থানে দাদামাশায়ের তৈরি এক শখের বাড়ি। কেউ নাকি তার চৌহদ্দি মাড়ায় না।'

সিধু অবাক হলো, 'কেন, মাড়াবে না কেন? আজকাল লোকে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই পায় না, ফুটপাথে শুয়ে থাকে। বললেই হলো মাড়ায় না।'

মামাদাদা বললেন, 'কি জ্বালা! সে কি এখানে যে যারা দিনের বেলা মজুরি খাটে কি ঠোঙা বেচে, তারা রাতে শোবে? এ হলো গিয়ে উত্তরবাংলার একটা আধা জঙ্গুলে জায়গায় মধ্যিখানে একটা মস্ত ঢিপি, তার ওপর বাড়ি। পাণ্ডববর্জিত এক স্থানে— আবার কি হলো?'

সন্তু বলল, 'আমার বন্ধু গদাই বলে, মামাদাদা বলে কিচ্ছু হয় না। মামা হ্যাঁ, মামাদাদা নট।'

তাই শুনে মামাদাদা রেগে উঠে যান আর কি! 'কি! এত বড় আস্পদ্ধা! আমার মতো সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, ১০০ কেজি ওজনের আস্ত মানুষটা নট! এই আমি সত্যি করে—'

ওরা অনেক কষ্টে তাঁকে ঠাণ্ডা করল।

'আরে ও ব্যাটা কিই বা জানে! যে ছেলে অবিমৃষ্যকারিতা মানে লেখে নিরামিষ খাওয়া, তার মতামতের কতটুকু দাম?'

মামাদাদা আশ্চর্য হলেন, 'ঐ মানে নয় বুঝি? তবে আবার কি? শুনলেই মনে হয় ডাঁটা চচ্চড়ি খাচ্ছে! আসল মানেটা তাহলে কি?'

সিধু বলল, 'হঠাকারিতা, মানে না ভেবে কাজ করা।'

মামাদাদা মহা খুশি, 'তাই বল্। ঐ একটু হলে, একটু ভেবে দেখলে কেউ শুধু ডাঁটা চিবুত না।'

সন্তু বলল, 'আচ্ছা, সে না হয় হলো। কিন্তু মাড়ায় না কেন, তা তো বললে না। স্থানীয় লোকরা তো মাড়াতে পারে?'

'কি জানি। বোধহয় বড্ড পুরনো আর নড়বড়ে বলে। যে কোনো সময় হুড়মুড় করে হয়তো মাথায় ভেঙে পড়তে পারে। আজকাল তো নতুন বাড়িও হামেশাই পড়ছে। একশো বছরের পুরনো বাড়ি যে পড়বে, সে আর বিচিত্রি কি? সে যাই হোক, সেটা খালি পড়ে আছে।'

তবু যাবে?'

'আহা আমি তো আর সেখানে বাস করতে যাচ্ছি না। অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর অর্থলাভ যে এখানে বসে হবে না, তা আমি ভালো করেই জানি। আর থাকলেও সেটা আমার হতো না। নিজের শেয়ার বেচে দিয়ে যখন বড় ভাইয়ের একরকম বলা যায় পোষ্য হয়ে আছি। অবিশ্যি বাজার সরকারিটে করে দিই। বাড়িতে কোনো ধন লুকোনো থাকত যদি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা কোন্ কালে প্রতিটি ফাঁক ফোকর দরকার হলে হেয়ারপিন দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে ওঁদের ঐ ব্যাঙ্কের ঐ তহবিলে ঢালতেন।'

সিধু বলল, 'আচ্ছা মামাদাদা, তুমি আজেবাজে ব্যবসা করে নিজের সম্পত্তি নষ্ট না করে, ঐ ব্যাঙ্কে চাকরি করতে না কেন?'

'করব না কেন? তিনশো টাকা মাইনেও পেতাম। এখনো পেনসান পাই। নইলে আমার চলে কি করে? তবে অজস্র টাকা পাওয়া এক জিনিস আর মাসকাবারে পঞ্চাশ টাকা পেনসান অন্য জিনিস।

তাই বলছিলাম, ধনসম্পত্তি থাকলে, সেখানেই আছে। বুঝেছিস তো, ওটা আমার একার সম্পত্তি। কিছু পেলে একাই পাব। ১০ ভরি বেচেছি। ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছি। যাওয়া আসা, যেখানে থাকা, যদি মজুর লাগাতে হয়, তার খরচাও হয়ে যাবে। ৬৫ বছর বয়স হলো, একা যাবার সাহস পাইনে। এবার স্পষ্ট করে বল্, তোরা দু'জন আমার সঙ্গে যাবি কিনা। সব খরচা আমার। তোমাদেও সামনে লম্বা ছুটি।'

এই অবধি বলে, পকেট থেকে একটা আধময়লা রুমাল বের করে মামাদাদা চোখ মুছতে লাগলেন। সিধু-সন্তু বলল, 'ও কি! ও আবার কি হচ্ছে! আমরা তো কোথায় ছুটি কাটাতে যাব তাই ভাবছিলাম। তুমি গিয়ে শুধু একবার বাবাকে গোপন সব কথা বলো। বাবা বানিয়ে গল্প লেখেন। প্লট খোঁজেন। হয়তো নিজেও যেতে চাইবেন। তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা। খরচ পত্রের জন্য ভাবতে হবে না। বাবা সরকারি চাকরি করেন। বছরে একবার রেলে ফ্যামিলি পাস পান, তাও জানো না? তোমাকে কিছু করতে হবে না; যা বলাবার আমরা বলব।'

মামাদাদা একটু গাঁইগুঁই করেছিলেন, 'ইয়ে—মানে—আমি সুমনের মামাশ্বশুর তো। আমারি ওর দেখাশুনো করা উচিত—'

সিধু বলল, 'দোহাই ঐটি করতে গেলে সব মাটিং চকার হয়ে যাবে। তুমি ঐ সব বানিয়ে বানিয়ে স্মৃতি কথা বলো, বাবাকে তাই বললে বাবা আহ্লাদে গলে যাবেন। আর গাঁইগুঁই করলে আমরা এক্ষুণি ফরাক্কাবাদে কিংবা অন্য কোথাও চলে যাব।'

মামাদাদা কাতর হয়ে বললেন, 'ওরে বাবা! অমন কথা মুখেও আনিস নে। আমি না অন্য কোনো উপায়ে আমার টাকা খরচ করব।'

সিধু-সন্তু তাই শুনে হেসে গড়াল, 'ঠিক বলেছ। সবাই বলে, ঐ খরচা করার ব্যাপারে তুমি এক্সপার্ট।'

সিধু-সন্তু মন্দ বলেনি। বাবার কাছে গোপনে কথাটা পাড়তেই বাবা লাফিয়ে উঠলেন, 'যা বলেছিস! দি থিং। উত্তরবাংলার ঐ অঞ্চলটা আমার দেখাই হয়নি।

একটা সরকারি পরিবল্পনাও আছে।ছুটিও পাওয়া আছে, এই বেলা বেরিয়া পড়া যাক। মানে ইয়ে-কেউ কিছু টের পাবার আগে। মনে হচ্ছে কিঞ্চিৎ গোপনীয়তা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। ট্রেকিং-এ যাচ্ছি বনে জঙ্গলে। মামাবাবুর ঐ কুষ্ঠিবর্ণিতা অঢেল অর্থলাভের কতা কাউকে বলে কাজ নেই। ওঁকেও সাবধান করে দেয়। খরচা ওঁকে বলিস। সেখানে এতকাল পরে ঢুকতে হলে সম্ভবত কপিকল ভাড়া করতে হবে। আপাতত ওঁর টাকাগুলো জমা থাক। পরে কাজে লাগবে সম্ভবত।'

'একের সময় একটু বিগড়ে গেলেও বাবা বেশ নির্ভরযোগ্য।' এ কথা শুনে মামাদাদা হেসেই কুপোকাৎ। সে যাই হোক গে, শেষ পর্যন্ত বাবার পরিকল্পনা মতোই চারজনে চারটি ছোট বেডিং আর চারটি হ্যাভাস্যাক এবং প্রত্যেক কাঁধে-ঝোলা চোট বাগে টর্চ, বাইনকুলার, ঔষধপত্র, একটি করে জলের বোতল ইত্যাদি নিয়ে কতক ট্রেনে, কতক বাসে, কতক পদাযাত্রা করে ৩০ ঘন্টা পরে, বিশ্বাস কর আর নাই কর, একটা বিস্তীর্ণ বনভূমির ধারে পৌছল। বনের গাছপালার অর্ধেক ছাঁটা, বাকির মুকনো খেমো চেহারা দেকে দুঃখ হয়।

তারি মধ্যিখান দিয়ে হেঁটে, অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা একটা টিলার নিচে এসে পৌছল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পশ্চিমে সূর্য পাটে নেমেছে এবং কোথাও জনমানুষের সাড়া নেই। বাবা বললেন, 'আজ আর ওঠার চেষ্টা করে কাজ নেই। টিলার থেকে একটু দূরে ঐ পাথরের খুঁদে তাঁবুটা গেড়ে একটু বিশ্রাম করা যাক। মামাবাবু, যেমন বলেছিলাম দলিলটে এনেছেন। তো? কাল সকালে ওঠা যাবে, সব জিনিসপত্র নিয়ে। পালা করে একজন রাত জাগতে হবে।'

তা বললে কি হবে? আঘঘন্টার মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে কাদা এবং পাখি ডাকার সঙ্গে জাগা। তারপর খুদে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করা হলো। নিমকি বিস্কুটের সঙ্গে চা খেতে খেতে সবাই অবাক। কোথা থেকে কয়েকটা খুদে খুদে রোগা হরিণ এল, ভোঁদল এল, খুদে টিয়াপাখির ঝাঁক নেমে এর। সব বিস্কুট গুঁড়ো করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। পাঁউরুটি ছিঁড়ে দেওযা হলো। কাছেই ছোট একটা নালা দিয়ে কুলকুল করে জল বয়ে যাচ্ছে। বাবা সে জলে হাত দিত মানা করলেন। ওরা বোতলের জলে রুমাল ভিজিয়ে মাথা-মুছে নিয়ে জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে টিলায় উঠতে শুরু করল।

মামাদাদা বললেন, 'একেবারে ভেঙে পড়েনি নিশ্চয়। রাতে দেখছি টিমটিম করে আলো জ্বলছে।' বাবা বললেন, 'অল্পক্ষণের জন্য।' সিধু-সন্তু বলল, 'গাছের ডালে গামছা শুকোচ্ছিল। টিলার গায়ে ঝর্ণা আছে। বুগবুগ করে জল বেরোয়।' বাবা বললেন, 'অর্থ্যাৎ সবাই একবার করে দেখে এসেছো।'

মামাদাদাকে একটু চিন্তিত মনে হলো। 'অত রোগা রোগা কালোকালো কি সত্যিকার মানুষ হয়?' বাবা হাসলেন, খেতে না পেলেই হয়। কাগজে দেখোনি এদিকে ঘুর্ণিঝড় হয়েছিল। তারপর দাবানল। খেটে খাওয়া মানুষ আর যে কটা গরু ছাগল পালাতে পেরেছে কতক পালিয়েছে। কতক মরেছে। বাকি আপনার ঐ

বাড়িতে আশ্রয় বেঁচে আছে। কতকগুলো মিশকালো কঙ্কাল প্যাটার্নের মা আর হাড়-বের করা ছেলেমেয়ে।

'যান মামাবাবু, সম্পত্তিতে, দখল নিন। ঐ তো আপনার প্রজারা আপনাকে নজরানা দিতে আসছে।'

সত্যি সত্যি পাথর-খসা, ফাটল—ধরা দরজাভাঙা বাড়িটা থেকে তারা সব বেরিয়ে আসছিল। তখন মামাদাদা এক কাণ্ড করে বসলেন। দু-হাত বাড়িয়ে ওদের দিকে উঠিপড়ি করে দৌড়াতে লাগলেন আর ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগলেন, ওরে, আর কোনো ভয় নেই, তোদের! এই যে আমি তোদের বাবা এইছি। আয়রে আমার ছেলেমেয়েরা। আমি তোদের খেতে দেব, পরতে দেব, ঘর মেরামত করে দেব।'

ছুটছেন আর ব্যাগ থেকে টাকার থলি বের করার চেষ্টা করছেন। সন্তু খপ করে তাঁর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'আগে দখল নেবে না?'

'ওরে তাই তো নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছিস না?'

বাবা তখন সেই দুঃখী লোকগুলিকে বললেন, 'তোমরা এত কষ্টে আছ জানলে আমরা আগেই আসতাম। আর কোনো ভয় নেই। আমার লোকজনরা মোটরগাড়ি করে জিনিসপত্র নিয়ে ঐ দেকো পৌঁছে গেছে। তোমাদের বাবামশাইকে তো তোমরা খবর দাওনি যে এত কষ্টে আছ। জানালে তিনি আগেই আসতেন।'

বলতে না বলতে পিছন দিকের রাস্তা দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে ট্রাকগুলো পৌঁছে গেল। খাবারদাবার, ওষুধপত্র, কাপড়চোপড়, মাদুর-বিছানা, কারিগর, মিস্ত্রি মশায়, মায় ডাক্তারবাবু তাঁর লোকজন নিয়ে এসে গেলেন। ওরা বোবা বনে গেছিল। মুখে একটু দুধ পড়তেই, কথাও ফুটল। কত যে হাসল তারা, কত যে কাঁদল, তাই দেখে সিধু-সন্তু অবাক!

মামাদাদা ঘুরে ঘুরে সব দেখাশুনো করছিলেন। একবার বাবাকে বললেন, 'হ্যাঁগা, জামাই, আমার প্রজাদের খরচ সরকার কেন দেবে?' সিধু বলল, 'ও মামাদাদা, কেউ কারো প্রজা নয় আজকাল। সবাই দেশের প্রজা। এটা যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পড়েছে।'

'তবে আমার টাকাকড়ি দিয়ে কি হবে? ওরা আমাকে বাবামশাই বলে ডাকে।'সন্তু বলল, 'বলব, কি হবে? একটা ছোট স্কুল হবে। তুমি তার হেডমাস্টার হবে। ওরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।'

মামাদাদা একটুক্ষণ হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে একগাল হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছিস। একপাল মুখ্যু ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাব। কুষ্ঠিতে তো ঠিকই লিখেছে। অঢেল অজস্র ধনসম্পত্তি পাব। জ্ঞানের মতো ধন আছে কি? আমি না পেলে তো আর ওদের দিতে পারতাম না। তাছাড়া ছোট লাইব্রেরি করব। নাড়ু বলেছিল ছেলেমেয়েরা হাতের কাজ শিখবে। লাইব্রেরি থাকলে ভাল হতো। যাই বলে আসিগে। এই টাকাতেই করা যাবে, কি বলিস?' বলেই ছুটলেন।

বাবার আর সিধু—সন্তুদের ছুটি ফুরিয়া গেল। মামাদাদার নে হলো ওরা বিদায় হচ্ছে বলে কিছু বুক ফেটে যাচ্ছিল না।

এ গল্পের শেষে আরেকটু আছে। ওরা বাড়ি ফিরে শুনল যে দশ বছর আগে মামাদাদা কি সব শেয়ারের সার্টিফিকেট কিনেছিনে। তা দেখতে দেখতে তার দোরে তালা পড়ে গেছিল। এতকাল পরে মালিকরা কি সব ব্যবস্থা করেছেন। ফলে অংশীদাররা প্রত্যেকে পৌনে এক লাখ টাকা পাচ্ছে। বড় মামাদাদু সঙ্গে সঙ্গে মামাদাদার শেয়ারের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন। সুদে বাড়ুক আরো বুড়ো হলে মামাদাদারি কাজে দেবে। তাঁকে পরে বললেই হবে।

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

সাজেদুল করিম

কালিদাসের যেমন,—আষাঢ়স্য প্রথম দিবস, এ যুগেও তেম্নি এপ্রিলস্য পয়লা তারিখ। বাপ রে। ও দিনটাকে আমি যমের মতোন ভয় করি। খালাম্মাদের ওখানে একবার পয়লা এপ্রিল গিয়ে না যা কষ্ট পেরেছিলাম। আর কষ্টই বা বলি কেন? সাদা কথায়, তোমাদের কাছে আর রেখে—ঢেকে লাখ কি!—একটু ইয়ে, মানে বুঝলে কিনা, বেশ বেকায়দাতেই পড়েছিলাম।

তাই এবারও আমন্ত্রণ পেয়ে পয়লা এপ্রিলে যখন খালাদের ওখানে গেলাম বেশ ভয়ে ভয়েই গেলাম। কিন্তু যেতে না যেতেই,—যা ভেবেচিলাম তাই। খালাতো ভাইবোনগুলোর সে কি দারুণ সমভাষণ!" সাজেদ ভাই এসেছো! এসো এসো!"

আমি যেন কোনো রাজা বা মহারাজা। কেন রে বাপু, সাজেদ ভাইতো বরাবরই আসেন—এবার তো আর নতুন নয়। তবে কেন তোড়াজোড়? মনে মনে বলি, ভবী, যা ভেবেছো সেটি কিন্তু হবার নয়। সেবার না হয় জব্দ হয়েছিলাম খানিকটা অন্যমনস্কতার দরুণ, এবার কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা নিজেকে নিজে পাহাড়া দিচ্ছি। মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দিচ্ছি না আজকের দিনটাই পয়লা এপ্রিল। দেখি, তোমরা কে কী করতে পারো এই আমার মনে মনে চ্যালেঞ্জ।

এদিকে কিন্তু চাদ্দিকেই একটা থমথমে ষড়যন্ত্রের ভাব। এমন কি, এমন যে গুরুম্ভীর খালাম্মা তিনিও বাদ গেলেন না। আমাকে দেখেই মধুঝরা কণ্ঠে বল্লেন : "সাজেদ এসেছিল? যাক, আমরাতো ভেবেছিলাম ভুলেই গেলি বুঝি।" কথায় রেশ, কেমন যেনো পরিহাসে ভরপুর। আর আদর-অভ্যর্থনার মাত্রটাও একটু বেশি বেশি অতিরিক্ত রকমের। হয়তো খেতে খেতে বল্লুম : "খালাম্মা, খানিকটা চাটনী যদি? "অম্নি হাবলু, হেনা, লীলা, রওশন ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো: 'এই নিন সাজেদ ভাই।—এটা আমের আচার, ওটা আমলকির, ওটা আবার কাশ্মীরী। কোনটা চাই?" অথবা খাওয়া-দাওয়ার পর হয়তো একটু খানি বিশ্রাম নেবো মনস্থ করেছি, বল্লুম, 'বয়,

চেয়ার খানা এয়িে দাও তো।" অম্নি বাড়িশুদ্ধ বয়-বেয়ারদের কী ছুটোছুটি। দৌড়ে এসে আরাম কেদারাখানিকে ঝেড়ে-মুছে টেনে পরিষ্কার করে সামনে এনে হাজির। তারপর কত তোয়াজ। "বসুন সাহেবজাদা। বসুন।"—আপ্যায়নের যেন রাজসূয় ব্যাপার। কী আশ্চর্য! তবে কী চাকর-বাকরগুলো অব্দি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? বাপরে, তবে তো আমাকে আরো হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়।—আমার রীতিমতো ভয় ধরে গেলো।

খালাম্মারা বড় মানুষ। হাল—ফ্যাশনের জমজমাট বিরাট ত্রিতল বাড়ি। এহেন গৃহের গৃহস্বামিনীর যে বড়ো বাড়ির কায়দায়, একটুখানি বড় রকমের আদর আধ্যায়ন করবেন, এ না বলেও অবশ্য বোঝায় যায়। কিন্তু তাই বলে এতখানি ঢলে পড়া আন্তরিকতা? অসহ্য! ওখানটাতেই আমার যত সন্দেহ: তবে কি এরা সবাই মিলে সদলবলে আমাকে টেনে নিয়ে যাত্রা করছেন আজকের এই মহা-দিবসে প্রাপ্য যোগ্য কোনো গোপন অভ্যর্থনায়? মনে মনে বললুম : বেশ, তাই যদি হয় হোক। আমি প্রস্তুত। দেখি তোমরা কে কী করতে পারো? চ্যালেঞ্জটা বুক চিতিয়েই গ্রহণ করি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করে! অবশ্য সমস্তই মনে মনে। ওদেরকে জানতে দেই না আমিও হুঁশিয়ার আমি মনে প্রাণে। কাজে কাজেই কোনোখানে খুট করে কোনো একটা আওয়াজ হয়েছে কি, আমার কান খাড়া হয়ে ওঠে এই বুঝি পড়লো। কোন দিক থেকে যে হামলাটা আসে বলা তো যায় না। কাজেই সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুটেখুটে দেখতে হয়। হয়তো নুনটা ভাতে মাখতে যাবো, তার আগে একটু দেখে নিতে হয়, বালু হয় ত? হয়তো পানটা মুখে দিতে যাচ্ছি, তার আগে খুলে দেখতে হয়, ইটের টুকরা নেই তো? জামাটা গায়ে দিতে যাবো, ঝেড়ে দেখতে হয়, গুপ্ত কিংবা সুপ্ত কিছু আছে কি না কেন জানে? সঠিক কোন শেইপে তিনি যে দেখা দেবেন, বলা তো যায় না। আবার এক মজা! আমার চক্ষে ধুলো দেবার ফন্দিও এঁটেছেন ওরা মন্দ না। আজকে তো পয়লা এপ্রিল। কিন্তু দেখো ক্যালেণ্ডারের ৩১ শে মার্চের পাতাটা এখনো ছিঁড়ে ফেলা হয় নি যেন মন করে বসি, আজকে তো আর পয়লা এপ্রিল নয়; আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁদে পা বাড়াই।

এভাবে চলছে কোল্ডা ওয়ার : নীরব লড়াই। ওরা পয়লা এপ্রিলের শিকার ধরার বেদে। জাল পেতেছেন এখানে ওখানে। আমিও ঘুঘু।—এড়িয়ে এড়িয়ে চলি ফাঁকে ফাঁকে। ওদের মনে মনে পয়লা। আমাও চোখে চোখে পয়লা। এপ্রিল। কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলছি না। এম্নি করে তো চললো সারাটা দিন নার্ভের লড়াই: ওরা চলে পাতায় পাতায়, আমি চলি শিরায় শিরায়। সুতরাং না সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে না বিকেলের চা খাওয়ায়, না রাত্তিরে খাবারের সময়, ওরা আমায় কাবু করতে পারলো। পারবে কেমন করে?—ওরা তো আর জানে না যে এবারকার সাজেদ ভাইটি সেবারকার সেই পয়লা এপ্রিলের চুল-কালি মাথা গোবর গণেশ সাজেদটি নয়।

শেষে রাত্তিরে বেলা যখন দশটা কি সাড়ে দশটা, জিজ্ঞেস করলাম: "খালাম্মা শোবো কোথায়?" খালা হেসে বল্লেন, "শুবি? তার ভাবনা কী? তেতলায় তো খালুর খাটটাই সবচেয়ে ভালো। জানিস তো, খালু গেছে টুরে। দশ দিনেও ফেরেন কিনা

সন্দেহ। তুই আসবি বলে আগে—ভাগেই ঝেড়ে মুছে সাফ করে রেখেছি; যা' শো গে।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে লীলা হেনা আবলু স্বপ্না ওদের ভেতর যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো : কে আমাকে খাটটা আগে দেখিয়ে দেবে তার প্রতিযোগিতা। লাইট জ্বেলে পথ দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পরম ঔৎসুক্যে তো আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে এক হাজির করলো। তারপর, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে : "সাজেদ ভাই। ঐ যে দেখো। এটাই তোমার খাট!" সত্যিই সুন্দর খাটখানা! সাদা ধবধবে বেডসীট পাতা তুলতুলে গদি আঁটা। এক কথায় সেই যে বিশুদ্ধ ভাষায় যাবে বলে : দুগ্ধ-ফেন-নিভ সে রকেমরি একখানা শয্যা। সারাদিনের ক্লান্তির পর এমন একটা খাটে কার না শুতে লোভ জাগে বলো? কিন্তু আমার শ্যেন দৃষ্টি তখনো স্তব্ধ হয়নি। মনে মনে দূর থেকে খাটখানাকে সালাম জানাই, বললাম, তোমার মুচকি হাসিতে ভুলছি না হে, ভবী। তোমাকেও চিনতে আমার বাকি নেই।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, বাবুল হেনা সবাই একসাথে আমার খাট দেখিয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু কেউই খাটের ধারে কাছেও ঘেঁষছে না। এতোক্ষণে সন্দেহটা আমার পাকাপোক্ত হয়ে দেখা দিলো : ও, সুঝেছি সাধারণ ধরনের তৈরি কোনো খাটই নয় এটি। হয়তো এর কোনোখানে কোথাও ইস্প্রিং লাগানো রয়েছে। এমন ভাবে যে, শুতে যাবো আর অম্নি চিৎপটাং বা এম্নি ধরনের কিছু একটা। তার মানে, দিনের বেলা কিছু একটা করতে না পেরে এখন ফন্দি এঁটেছেন রাত্তির বেলা। রাত্তিরে ফাঁদে পা বাড়াই সেও বা মন্দ কি! এমনি এক প্ল্যান। বস্তুটার ধরনধারণে গোড়াতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। শ্রীমানদের আচরণে সন্দেহটা ঘনীভূত এবং একেবারে দৃঢ়ীভূত হলো। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বল্লাম না, শুধু বল্লাম : "আচ্ছা, এখন তোমরা তাহলে যাও।" ওরা চলে গেলে পর খুব আস্তে আস্তে আলগোছে খাট থেকে তোষক বালিশগুলো একটা একটু তুলে আনলাম। মনে মনে একটা উপায় স্থির করলাম।—কাজ নেই ভাই আমার খাটে শোওয়ার। হয়ভ মাঝ রাত্তিরে হুড়মুড় করে কী একটা কান্ড ঘটে বসবে কে জানে? তারচেয়ে মেঝেতে শোওয়া ঢের বেশি ভালো।

যেই ভাবা সেই কাজ। দরজার কাছে বিছানাটা টেনে এনে মেঝেতেই শুয়ে পড়লাম। ওদের ষড়যন্ত্রটা যে এভাবে বানচাল করতে পেরেছি, ভেবে মনে মনে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। ওদিকে, দেখি খাট বেচারী আমাকে ফাঁদে ফেলতে না পেরে কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। কী আশ্চর্য! ছেলে বুড়ো, চাকা-বাকর থেকে আরম্ভ করে বাড়ির জিনিসপত্তরগুলো পর্যন্ত আমার পেছনে লেগেছে। এ কেমতরো শত্রুতা বলো তো?

যাক, পয়লা এপ্রিল তো এভাবেই কাটলো। পরদিন সকাল সাতটা কি আটটা। আমি তখনো অঘোর ঘুমে অচেতন। গেলো দিনের এতোখানি স্নায়বিক যুদ্ধের পর গাঢ় নিদ্রাটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এমন বিকট এক শব্দ। অনেকগুলো প্লেট, পিরিচ, কাচের জিনিস একসাথে মেঝের উপর ভেঙে পড়লে যেমনটি শোনায় তেম্নি ধরনের শব্দটা। শব্দটা শুনে সবাই দৌড়ে এলো আমারি কামরায়। আর

আমার অবস্থাটা তখন যা হয়েছে, তাভাষায় বর্ণনা না করাই ভালো : গরম চা, দুধ, চিনি, মাখন, আধা সেদ্ধ ডিমের কুসুম, ফলের রস সব মিলেমিলে আমার সর্বাঙ্গ জবুধবু। জজ্জরিত! থকথক করছে সরাটা গা। আর বাড়িশুদ্ধ ছেলেমেয়েদের সে কী জোর হাততালি : এপ্রিল ফুল!!

এখন, ব্যাপারটা হয়েছে কী শোনো। বুড়ো বেয়ারা আবদুল সকালে ব্রেকফাস্টর সামগ্রীগুলো পরিপাটি করে সাজিয়ে ট্রে-তে করে আমাকে দেবার উদ্দেশ্যে আমারি কামরার দিকে ছুটে আসছিল। বেচারী তো আর স্বপ্নেও ভাবেনি আমি খাট ছেড়ে মেঝেতে শুয়ে রয়েছি। সুতরাং পড়বি তো পড় হুমমুড় করে প্লেট-পিরিচ শুদ্ধ আমারি ঘাড়ের উপর। আর তারপর যা কাণ্ড সে তো বুঝতেই পারছো।...তাড়াতাড়ি খালাম্মা একখানা তোয়ালে এসে আমাকে ঝাড়ামোছা করে অনেকটা খাড়া করে তুল্লেন। এমন সময় কোত্থেকে ছুটে এলো ছোট হেনা : "ভাইজান। সেবার যা হোক এপ্রিল ফুল হয়েছিল শেষ বেলার দিকে। এবার কিন্তু ঘুম থেকে উঠতেই।"

—"দূর বোকা।" হেনার টিটকারীতে আমার গা জ্বালা করে ওঠে, "এপ্রিল ফুল হতে যাবে কেনো রে, আজকে কি আর পয়লা এপ্রিল?" "হ্যাঁ, গো হ্যাঁ আজকেই পয়লা এপ্রিল!" আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিকে চাদ্দিকে চাই। দেখি কি পাশের বাড়ির অনেকেও এসেছেন হ্যাঙ্গামাটা শুনে। ওরাও বল্লেন : "আজকেই পয়লা এপ্রিল।" তবু আমার সন্দেহ কাটে না। এ কী সত্যি, না আমি স্বপ্ন দেখছি? দুটো একটা প্রতিবাদের সুরে খানিকটা আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় হকার সেদিনকার কাগজখানা নিয়ে হাজির। তাড়াতাড়ি কাগজে চোখ বুলিয়ে নিলাম। তাতেও স্পষ্টক্ষরে সাক্ষ্য দিচ্ছে, আজকেই পয়লা এপ্রিল।

এতক্ষণে ভুল ভাঙলো। হয়েছে কি, আমার অন্যমনস্কতায় ৩১ শে মার্চকে পয়লা এপ্রিল ভেবে আমি সারাটা দিন লড়েছি যতসব একরতফা কাল্পনিক যুদ্ধ, একপাল ইনোসেন্ট খালাত ভাইবোনের সাথে। আসলে বেচারিদের মনে দিলেও কোন কুমতলব ছিল না। তারা তাদের স্বাভাবিক আদর-আপ্যায়নই করে যাচ্ছিল আমাকে। সুতরাং আজকে যখন সত্যিকারের পয়লা এপ্রিল এসে হাজির হলো, তখন আর জব্দ না হয়ে যাই কোথায়? না সংসারে আমার ধিক্কার ধরে গেলো। আর জীবনধারণ করে লাভ নেই! মানুষ তো বটেই, বাড়ি খাট, ক্যালেন্ডার, জিনিসপত্তরগুলো হাতেও শেষটা নাকাল হতে হলো আমাকে। চেয়ে দেখি, সেই-যে, ক্যালেন্ডার, তার সত্যিকারের মূর্তি আজকে প্রকাশিত হয়েছে। ৩১শে মার্চের পাতাটা ছিড়ে ফেলা হয়েছে। আর ক্যালেন্ডারখানিও যেন নির্মম দৃষ্টিতে হাসছে আমারি দিকে চেয়ে চেয়ে : 'কেমন জব্দ; পয়লা এপ্রিল!'

'শব্দজব্দ'র সূত্রে
আশাপূর্ণা দেবী

শীতের সকালে রোদের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে হিমাদ্রিভূষণ খবরের কাগজখানা হাতে করে মনে-মনে হিসাব করতে চেষ্টা করছেন উপসাগরে ঢেলে দেওয়া তেলের স্তর দৈনিক ক'মিনিট বেগে ভেসে-ভেসে মহাসাগরের দিকে ধেয়ে আসছে এবং আসার পথেই কার কোথায় কী-কী অনিষ্ট সাধন করছে।

কাছে একটা পেনসিল ডট্‌পেন গোছের থাকলে হিসাবের সুবিধা হত, কিন্তু কে আবার উঠে গিয়ে পেনসিল আনে! বারান্দার আর—একধারে রোদে পিঠ দিয়ে বসে একরাশ কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে চলেছেন হৈমন্তীবালা। কড়াইশুঁটির কচুরি বানাবার তালে। উপসাগরে যুদ্ধ চলছে বলে। যে শীতের সময় ফুলকপির চপ, কড়াইশুঁটির কচুরি-খাওয়া বন্ধ যাবে, এমন তো আর হতে পারে না? হিমাদ্রি ভাবলেন, হৈমন্তীকে বললেন ডট্‌পেন পেনসিলেন কথা! কিন্তু সিদ্ধান্তে আসার আগেই দু-দুটো ডট্‌পেন চলে এল বারন্দায়। অবশ্য তার সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে চলে এল শান্টি আর আংটি!

তবে হিমাদ্রিব ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পেন দিতে নাকি? তা বলে তা নয়, দু'জনে একসঙ্গে দ্রুত প্রশ্ন করল। "দাদু 'মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে যাওয়ার' একটা আট অক্ষরের প্রতিশব্দ বলো তো! চটপট। কুইক। কুইক। ওকে আগে নয়।"

থতমত হিমাদ্রিভূষণ চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বলেন, "হঠাৎ মাথায় কী খেলে গেল?"

"ওঃ, ইস! মাথায় আবার কী খেলবে? বুদ্ধি! বুদ্ধি। আট অক্ষরে হওয়া চাই, বুঝলে প্রথম অক্ষরটা হচ্ছে 'প্রে'। আর মাঝখানে একটা—না! না! ওকে নয়, আমায় আগে।"

"এই চুপ! আমায় আগে।"

হিমাদ্রি চশমাটা আবার নাকে বসিয়ে হেসে বলেন, "দু'জনকে তো আর একসঙ্গে 'আগে' বলা যায় না! একজনকে তা হলে কানচাপা দিতে হয়।"

"তুই দে চাপা!"

আংটির আদেশধ্বনি!

"আমার বয়ে গেছে। তুই চাপা দে।"

শান্টির অবজ্ঞাধ্বনি।

"ইস! তাই বইকি। তুই দে।"

"তুই"

"তুই।"

এখন হৈমন্তী বলে ওঠেন, 'করছিস তো তোদের সেই শব্দজব্দ না কী, তার আবার আগে পরে কী রে? বাংলা কাগজখানা আসা মাত্রই তো দু'জনই সেটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়িস।"

আংটি ব্যস্ত গলায় বলে, "আচ্ছা বাবা, একসঙ্গেই বলো। চটপট ভেবে নিয়ে বলো। হঠাৎ বুদ্ধি খেলে যাওয়া আট অক্ষরে।"

হিমাদ্রিভূষণ বলেন, "এর আবার ভাবভাবির কী আছে?"

"প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব'। দ্যাখ মিলিয়ে..."

"অ্যাঁ! দেখি দেখি! ইস, ঠিক তো। এই শান্টি দ্যাখ 'খণ্ড ত' নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল, মিলে গেল উৎকণ্ঠা।"

"হ্যাঁ রে দাদা!' পাশপাশি', 'উপর-নিচ' দুই-ই একদম কাঁটায় মিলে গেল। এক সময় এমন হয়। সব ঠিকঠাক মিলে গিয়েও এক-একটা শব্দের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যায়। যাক। দাদু খ্যাঙ্কু।"

"আচ্ছা! খুব হয়েছে দাদুকে আর ঘটা করে থ্যাঙ্কু করতে হবে না। বরং ওই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর একটা উদাহরণ দে দেখি।" আংটি বড়, তার দিকে তাকিয়েই বলেন।

সে বলে উঠে, "উদাহরণ দেব? মানে? কী করে? হঠাৎ কোনও অসুবিধা পড়লে, বা বিপদ ঘটলে তবেই তো।"

"আহা, সেসব নাই হোক, 'যদি' দিয়েই বল। আচ্ছা, আমিই বলি—ধর, হঠাৎ অসাবধানে কোনওভাবে তোর জামাকাপড়ে আগুন লেগে গেল। সেই মুহূর্তে ওই ঠিক কী।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদিক থেকে হৈমন্তীবালা কড়া গলায় বলে উঠলেন, "তোমার আক্কেলটা তো বেশ মেজদা। আর কোনও উদাহরণ খুঁজে পেলে না? 'হঠাৎ যদি তোর গায়ে আগুন ধরে যায়।' দুর্গা! অলক্ষুণে অপয়া একটা কথা...."

"আরে বাবা, আমি তো বলছি তা তোরাই তো বলিস যদি'র কথা নদীতে যায়।"

"সে হচ্ছে ছেলেপুলের কথা। তা বলে—কেন, এটাও তো বলতে পারতে, 'ওরে আংটি, ধর, তুই কোনও সময় কোনও দরকারে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়েছিস! ফেরার সময় তাড়া, এদিকে সন্ধ্যে হয় হয়। তাই শর্টকাট করতে একটা ভাঙাচোরা পোড়ো শিবমন্দিরের সামনের জঙ্গুলে জায়গা দিয়ে হাঁটা দিচ্ছিস। শুকনো

পাতাটাতা মাড়িয়ে। হঠাৎ কী যেন একটা নরম জিনিস পা পড়ল, চমকে তাকিয়ে দেখলি সামনে স্বয়ং যম! ফণা-তোলা ইয়া এক বারো-চৌদ্দ হাত লম্বা কেউটে না গোখরো সাপ তো হাতদুয়েক দূরেই। ছোবল দিতে এল বলে। তখুন তুই কী করবি?"

হিমাদ্রি হেসে উঠে বলেন, 'বাঃ বাঃ! এটা বুঝি খুব 'সুলক্ষণি' কথা হল রে হৈমি। হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়ার থেকে সামনে ফণাতোলা গোখরো, খুব ভাল?"

"কেন নয়?"

হৈমন্তী বীরদর্পে বলেন, "সব ভাল যার শেষ ভাল। আমাদের পটল পিসে বাঁকাকেষ্টপুরে কাদের বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরবার সময় পড়েননি ওইরকম অবস্থায়? তো ওই ওঁদের প্রতুৎপন্নর জোরে কী করে নিজের প্রাণটি বাঁচিয়ে আর সেই সাক্ষাৎ যমটিকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে-বাড়ি ফিরেছিলেন, সেটা শোনাও না।'

"সাপটাকে মেরে? অ্যাঁ। কী করে?"

দু'জনের সমস্বর প্রশ্ন।

"কী করে আবার? চক্ষের নিমেষে ফস করে গায়ের উড়ুনিটা আর পরণের ধূতিখানা টান মেরে খুলে হাতে নিয়ে ঝপাঝপ ছুঁড়ে মারলেন তার সেই ফণা—মাথায় ওপর। ঢাকা পড়ে গেল সাপের মাথাটা। তো তাই বলে কি আর সে ঢাকা পড়ে থাকবে? ওই কাপড়-চাদরের নিচে ফোঁস-ফোঁস করে এঁকেবেঁকে নড়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে না? করবেই তো। কিন্তু করলে কী হবে? পটলপিসে ততক্ষণে বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে ওই ভাঙা মন্দিরের ধারে ছড়ানো যত ইট ছিল, তাই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে দমাদ্দম ছুঁড়তে লাগলেন। সেই ঢাকাপড়া যম-মহারাজের ওপর। ইটের ওপর ইট। পাগলের মতন ছুঁড়েই চলেছেন। ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সেখানে একটা ইটের পাহাড়! কোথায় বা চাদর কাপড়! কোথায় বা চোদ্দ হাত লম্বা সাপটা। ইট ছুঁড়তে-ছুঁড়তে গলা শুকিয়ে কাঠ। মাথা ঘুরছে। কোনও মতে বাড়ি ফিরে এসেই শুয়ে পড়ে বললেন, "এক গেলাস জল।"

শান্টি হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বলে "বাড়ি ফিরে? কী করে?"

"কেন? ছুটতে—ছুটতেই। বাড়ির কাছাকাছিই তো এসে পড়েছিলেন প্রায়।"

তবু শান্টি হি হি করে লুটোপুটি হেসে চলে। আর সঙ্গে আংটিও যোগ দেয় চোখে—চোখে কী এক মজার ইশারায়।

"কী হল? দু'জনায় অমন হেসে মরছিস যে?"

শান্টি বলে ওঠে, "ধূতিটুতি তা—হিহিহি সাপের সঙ্গে হিহি—সাপের সঙ্গে ক'বার! তা হলে? ও পিস্‌দিদা। তা হলে? কী করে বাড়ি ফিরলেন?"

হৈমন্তী গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, "এই তোমরা দুটি হচ্ছ একের নম্বরের বিচ্ছু! কেন, পাড়াগাঁয়ে কলাগাছ কচুগাছের অভাব আছে? বৃহৎ পাতা। তাই থেকে দু'খানা ছিঁড়ে নিয়ে—টিভিতে মহাভারতে দ্যাখোনি? দুর্যোধন স্নান সেরে কীভাবে জননী গান্ধারীর সামনে এলেন! গাছেরাই তো চিরকাল আচ্ছাদন জুগিয়েছেন। কখনও

গাছের পাতা হয়ে, কখনও বাকল হয়ে, কখনও তুলো হয়ে, কখনও পাটের আঁশ হয়ে। সেটা মনে পড়লে—আসলে ওই প্রত্যুৎপন্ন! তা এ গল্প ওঁর বুদ্ধি দেখে অবাক হরি, তা নয়। গুরুজন বলে একটু ছেদ্দাভক্তিও নেই? ভাবছিলাম, ওই 'প্রত্যুতের' ব্যাপার নিয়ে আমাদের কর্তাদিদিমার ডাকাত তাড়ানোর গপ্পোটাও বলব এদের। তো যা সব ধিঙ্গি অবতার মেজদা, তোমার এই নাতি-নাতনি দুটি। ধ্যাত!"

"ডাকাত তাড়ানো! অ্যাঁ!"

"ও পিস্‌দিদা! বলো! বলো। মোটেই হাসব না আর।"

"শুনগে তোদের নিজের দাদুর কাছে। আমার সময় নেই।"

হৈমন্তীর ভঙ্গি অগ্রাহ্যের।

অবশ্য এটাই ওঁর আগ্রহ আর উৎসাহের পূর্বলক্ষণের ভঙ্গি। মানে উনিই বলবেন (বলার জন্য মুখিয়ে আছেন)।

হিমাদ্রি বলেন, "আমি কী করে বলব? আমি কি তখন বাড়িতে ছিলাম? তুই তো গিয়েছিলি দিদিমার সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়িতে। কর্তাদিদিমার কীর্তিকথা লোকের মুখেই শুনেছি। তোর চোখে দেখা..."

হৈমন্তীবালা তবু দর বাড়িয়ে নির্লিপ্ত গলায় বলেন, "তা অবিশ্যি। তবে কতই আর বয়স তখন আমার? বড়জোর সাত-আট।"

"আহা! তোমার তো এক বছর বয়সের কথাও মনে আছে পিস্‌দিদা। বলো না বাবা, ডাকাত তাড়ানোর গপ্পো! কী মজা! কিন্তু ওই কর্তাদিদিমা না কী বললে? ওর মানে কী?"

"ওমা! শোনো কথা! মানে আবার কী? কর্তাদিদিমা হচ্ছেন দিদিমার শাশুড়ি!"

"ও বাবা তিনি তো বুড়ি থুথুড়ি। তিনি আবার ডাকাত তাড়াবেন কী?"

"ওরে বাবা! বুড়ি হলেই কি সবাই থুথুড়ি হয় নাকি? গিন্নি বলে কথা। তী দাপট...তো তখন সে-সময় ওই ব্রজগোবিন্দপুরে 'খ্যাঁদা-পঞ্চানন' নামের এক ডাকাতের খুব বোলাবোলাও। তার ভয়ে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত নাকি কাঁপে। দারোগারা খ্যাঁদা-পঞ্চানন আসছে শুনলে সে-তল্লাট ছেড়ে পালায়। তো একদিন হঠাৎ শোনা গেল, খ্যাঁদা-পঞ্চানন ওই ব্রজগোবিন্দপুর হই-হই করে ঢুকে পড়েছে। বিশাল দল। সকলের হাতে লাঠিসোঁটা, আর জ্বলন্ত মশাল। ছোট তরফের জমিদার বাড়িটার লুট সেরে এই বড় তরফের বাড়িতে আসছে।" যে খবর দিল, সে তো কর্তাদিদিমার পা ছাড়ে না। 'আমার বাড়িতে একটু আশ্রয় দাও মা।'

"কর্তাদিদিমা বললেন, 'ঠিক আছে। আয় এই আমার গুদোম ঘরে। দুটো বস্তা টেনে নিয়ে গিয়ে ছাতে তুলতে হবে। অবিশ্যি আমার বাড়ির লোকজনও কাজে লেগে পড়ছে। ছাতে ওই বস্তা দুটো নিয়ে যাবি, আর যত পারবি ইটপাটকেল নিয়ে গিয়ে তুলবি চটপট।'...শুনে তো আমার দাদামশাই মানে কর্তাদিদিমার ছেলেটি ভয়ে থরথরিয়ে বললেন, 'মা গো, ইটপার্টকেল ছুঁড়ে তুমি খ্যাঁদা-পঞ্চাননের দলকে হটাবে? তার থেকে যা সহজ তাই করো। আসা মাত্রই লোহার সিন্দুকের আর বাড়ির যত বাক্স-প্যাঁটরার চাবির তোড়াটা খ্যাঁদার সামনে ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে বলো,

'বাবা, সর্বস্ব নে। কাউকে প্রাণে মারিসনি।'...শুনে না—বুঝলি, কর্তাদিদিমা আগুনের মতন জ্বলে উঠে বললেন, 'কী বললি গদাই? ব্যাটাছেলে হবে এত ভিতু? যা তোর বউ ছেলেমেয়ে নাতিপুতি নিয়ে দোতলার মাঝের ঘরে খিল বন্ধ করে বসে বসে ভয়ে কাঁপবি, যা । এই মহামায়া-বামনি অমন ভিতুর ডিম নয়। হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষে করব ওই বদমাশ খ্যাঁদা-পঞ্চাটার কাছে? আর বলব, সর্বস্ব নাও। তার আগে বরং গলায় দড়ি দেব। যা, যা, তুই নাক ডাকাগে যা। তোকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না।'...বলে না কর্তাদিদিমা একপুঁটলি কাপড় নিয়ে ছাতে উঠে গেলেন। ...আমি না গুটি-গুটি তাঁর সঙ্গে ছাতে উঠে গেছি।"

হৈমন্তী হাসলেন। বললেন, "আমায় খুব তাড়া দিলেন কর্তাদিদিমা, 'যা যা শুয়ে পড়গে যা' বলে। আমি তাই শুই? আমি সেই মেয়ে?....ছাতে তখন বাড়ির যতগুলো দাসদাসী সবাই এসে জড়ো হয়েছে। গিন্নি বড় দারোয়ানকে বললেন, 'সদরে ভেতর থেকে বড়তালা চাবি দিয়েছ?'

"আজ্ঞে তা আর বলতে। ডজনের ওপর তালা মেরেছি।"

"সিঁড়ির চাপা দরজা ফেলে দিয়েছ?"

"আজ্ঞে সে তো কখন।"

আংটি শান্তি বলে ওঠে, "চাপা দরজা মানে?"

"আরে চাপা দরজা জানিস না?"

হৈমন্তীবালা হেসে বলেন, "আগেকার দিনে পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে এমন রেলিং দেওয়া সিঁড়ি থাকত না, দু'দিকেই খাড়াই দেওয়াল আর সিঁড়ির মুখে দু'পাশে লোহার আংটা দিয়ে আটকানো ভারী—ভারী দুটো বৃহৎ কপাট থাকত। লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা।....চোর ডাকাতের ভয়ের সময় সিঁড়িতে উঠে এসে ওই কপাট দুটো ফেলে দেওয়া হত। ব্যস, নিশ্চিন্তি।

"কিন্তু দরোয়ান বলল, 'খ্যাঁদা-পঞ্চাননের কাছে তালাচাবিই বা কী? আর চাপা দরজাই বা কী! ও যা করতে আসবে তা করে যাবেই। শুনছেন ছোট তরফের বাড়ি থেকে কী জোর আওয়াজ আসছে! ও হচ্ছে খ্যাঁদার দলের হুঙ্কার। আকাশপানে তাকিয়ে দেখুন, মশালের আলোর আভায় লাল হয়ে উঠেছে।

"কর্তাদিদিমা বললেন, "উঠুক। তোমরা সব প্রস্তুত তো?' বলেই তিনি পুঁটলিটা খুলে গাদা-গাদা পুরনো কাপড় বের করে ফ্যাস-ফ্যাস করে ছিঁড়তে লাগলেন।"

শান্টি তাড়াতাড়ি বলে, "ডাকাতদের হাতে পিটুনি খাওয়ার পর ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য বুঝি?"

এখন হৈমন্তীবালার হি হি হাসি।

"তা আর নয়। ডাকাতের হাতে পিটুনি খেয়ে কে কার ব্যান্ডেজ বাঁধতে বসবে রে? শোন না মজা। সেই ছোঁড়া ন্যাকড়ার মধ্যে একটা করে ইটপাটকেল রেখে, তার ওপর সেই দু'বস্তার মালটি মুঠো-মুঠোর ভরে ছোট-ছোট পুঁটলি বাঁধা হল ছাত ভর্তি। সে যা দৃশ্য। পুঁটলির বৃন্দাবন।...তারপর কী হল বল দিকি?"

"বাঃ। আমরা কী করে বলব? তোমার তো সবাই রহস্য। বস্তায় কী ছিল বলছ না?"

"কী ছিল? হিহি, তোদের ওই শব্দজব্দর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল।...একটু পরেই দেখা গেল আমবাগান পেরিয়ে হই-হই করে এগিয়ে আসছে খ্যাঁদা-পঞ্চাননের দল। হাতে লম্বা-লম্বা বাঁশের আগায় জ্বলন্ত মশাল। মুখে বিকট চিৎকার।...সামনের লাইনে খ্যাঁদা নিজে। সে তার স্বভাবমতো বিরাট চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'ভালয়—ভালয় চাবির গোছাটা ফেলে দিয়ে আত্মপরিজন নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুক পড়ুন সবাই। খ্যাঁদা সহজে প্রাণহানি করতে যায় না।'

"কিন্তু ততক্ষণে তো কর্তাদিদিমা, তোদেদর ভাষায় অ্যাকশান শুরু হয়ে গেছে। সবাই দোহাত্তা সেই পুঁটুলিগুলো ফটাফট সেই জ্বলন্ত মশালগুলোর ওপর তাক করে ছুঁড়ে চলেছে। হি-হি। তারপর কী হল বল দিকি?"

"বাঃ। কেবল আমাদের জিজ্ঞেস করছ কেন? নিজেই তো বলবে।"

তারপর না, হঠাৎ ওই দলের মধ্যে ভয়ানক শোরগোল উঠল।

তার সঙ্গে হাজার-হাজার হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হাঁচির মতো শব্দ।....আর তারপরই লাঠিসোঁটা মশালটশাল ফেলে দলকে দল জোর পায়ে উলটোমুকো দৌড়। সব পালাচ্ছে। তখন তো আমাদের সাহস হয়েছে একটু, ছাত থেকে উঁকি মেরে দেখি ছুটে-ছুটে সবাই ঝপাঝপ আমবাগানের ওপারের দিঘিটার গিয়ে আছড়ে-আছড়ে পড়ছে। ব্যাস, তারপর একদম নিঃসাড়। তারা আর এমুখো নয়।

...ওই বস্তা দুটোর মধ্যে কী ছিল জানিস? সারা বছরের জন্য মজুদ করে রাখা শুকনো লঙ্কা। চাষের জমি থেকে আসত তো সব। পুঁটুলিগুলোকে ভারী করতে ওই ইটপাটকেল। যাতে সহজে তাক করা যায়, মশালের আগুন পড়েছে আর বাঁধনের ন্যাকড়াগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে গেছে। ব্যস, সেই লঙ্কারা তখন জ্বলে উঠে যা করার করতে শুরু করে দিয়েছে। বড়-বড় দু'বস্তা লঙ্কা। বোঝা বোমার থেকে কিছু কম নয়।"

শান্টি চোখ গোল করে বলে, 'ও বাবা। তোমাদের সেই দিদিমাকর্তার তো সত্যিই খুব বুদ্ধি।"

"বুদ্ধি তো ছিলই দারুণ। সব বিষয়েই। তার ওপর সে বুদ্ধি মাথায় হঠাৎ খেলে গিয়ে অনেক সমস্যা এড়ানোর উপায় বাতলে দিত। নইলে খাবার জিনিস বাটনার মশলা। তাই দিয়ে কিনা যুদ্ধ হয়। শত্রু নিধন।"

শান্টি বলে উঠে, "দাদু! ঠিক সাদ্দামের মতন বলা যায়! তাই না?"

"সাদ্দামের মতন?"

"বাঃ। সাদ্দামও তো যুদ্ধজয়ের আর শত্রুবিধনের ফন্দিতে উপসাগরের অনেক অনেক তেল ঢেলে..."

হৈমন্তীবালা বেজার গলায় বলে ওঠেন, "একালের সঙ্গে সেকালের তুলনা করতে আসিসনে তোরা। একালের ভয়ঙ্কর সব মানুষরা শত্রু ধ্বংস করতে, বিশ্ব ধ্বংস করতেও দ্বিধা করে না। কর্তাদিদিমা তো কাউকে প্রাণে মারার চিন্তা মাথায়

আনতে যাননি। শুধু রাশি-রাশি লঙ্কাপোড়ার ঝাঁঝের চোটে ডাকাতদের নাকের জলে চোখের জলে করে জব্দ করার বুদ্ধি ভেঁজেছিলেন। কত আর ক্ষতি হয়েছিল তাদের?"

আংটি বলে, ওঠে, "আর তারপর? পরে সেই তোমাদের খ্যাঁদা-ডাকাত ভীষণভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেনি?"

"খ্যাঁদা?"

হৈমন্তী একটু উদার মধুর হাসি হেসে বলেন, "ওরে সেকালে চোর-ডাকাতের মধ্যেও মনুষ্যত্ব ছিল। গুণের প্রতি ছেদ্দভক্তি ছিল। একালের মতন সবাই অমানিষ্যি হয়ে যায়নি। প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা, পরে একদিন যা একখানা উড়ো চিঠি এসে হাজির হল শুনলে তাজ্জব হয়ে যাবি। তাতে লেখা—

পূজানীয়া মাতা ঠাকরোন। জানিলাম সেদিন এই অধম খাঁদা-পঞ্চার দলের দুর্দশা সাধন করিয়া ডাকাতি ঠেকানো, নাকি আপনারই বুদ্ধির ফল। সে কারণে আপনার উপর আমার পরম ভক্তি জন্মিয়াছে। আপনাকে 'মা দুর্গাসম' ভাবিয়া অদ্য হইতে খ্যাঁদা আপনার পুত্র সমান হইল। এই অধম পাতুকি সন্তান খ্যাঁদা পঞ্চানন বাঁচিয়া থাকিতে আপনার গৃহে কোনওদিন চুরি-ডাকাতির ভয় নাই। এ তল্লাটে এমন কোনও 'ডাকাইত' নাই যে খ্যাঁদার জননীর ক্ষতি সাধন করিতে আসিতে সাহসী হইবে।

যদি কখনও কোন বিপদ আপদে খ্যাঁদার স্মরণ করেন এই ব্রহ্ম গোবিন্দপুরের মা শ্মাশানকালীর মন্দিরের সেবাইতের কাছে আপনার গৃহের নামটি খিলিয়া রাখিয়া যাইতেই জানিতে পারিব।

ইতি
চরণআশ্রিত ভক্তসন্তান
খ্যাঁদা-পঞ্চানন"

"আরেব্বাস!" আংটি বলে, "এত বড় চিঠিটা, সব মুখস্থ আছে তোমার?"

হিমাদ্রিভূষণ একটু হেসে বলেন, "তা থাকবে না কেন? এ যাবৎ কেননা দুশো-পাঁচশো জনকে এ-গল্প বলা হয়েছে।"

শান্টি বলে, "সেকালের ডাকাতরা আবার লিখতে-পড়তেও জানত?"

"জানত কি কাউকে ধরে লিখিয়ে নিয়েছিল তা জানি না। ওই কালী মন্দিরের সেবাইতটি তো ছিল ওর স্যাঙাত! তবে ভেতরে বস্তু ছিল।"

হৈমন্তীবালা বলেন, "সেই কথাই বলছি। সেকালে সামান্য মানুষের মধ্যে এমনকি চোর-ডাকাতদের মধ্যে মনুষ্যবোধ ছিল, গুণের কদর ছিল। ওর দলের লোক নাস্তানাবুদ হয়েছে, তবু কর্তাদদিদিমার বুদ্ধিকে সেলাম ঠুকছে। এখনকার মানুষের মধ্যে আছে এমন মানুষ মনিষ্যত্ব? হুঁঃ। তোদের মাথায় এল প্রতিহিংসা!"

হিমাদ্রিভূষণ তাড়াতাড়ি বলেন, "আচ্ছা, বাবা আচ্ছা। রাখ তোর তত্ত্বকথা। ওদের তো তত্ত্বকথা বোঝবার বয়স হয়নি। তো আংটি শান্টি, তোদের ওই শব্দজব্দর

সূত্রে কেমন 'সাপজব্দ' বার ডাকাতজব্দ' দু-দুটো মজার গল্প শুনতে পেলি? তোদেরও তাই বলছিলাম—হঠাৎ গায়ে আগুন লেগে তাকে কীভাবে জব্দ করবি...'

'আঃ, মেজদা! আবার?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। থাক, তোরা একটা ডট্‌পেন দিয়ে যা তো আমায়। অঙ্কটাকে মাথা থেকে ছাড়িয়ে এনে খাতায় জব্দ করে ফেলি।"

অন্য কোন খানে

কাজী আনোয়ার হোসেন

'ঢুকে মনে হবে, এটা আর দশটা ট্রাভেল এজেন্সির মতই সাধারণ একটা অফিস,' আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল মাতাল লোকটা। 'কিন্তু ঘাবড়াবেন না। সাদমাঠা দু'চারটে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবেনঃ এই ধরুন, ছুটি—কোথাও বেড়াতে যেতে চান, কোথায় গেলে ভাল হয়, এই রকম সাধারণ দু'একটা প্রশ্ন। তারপর সেই ফোল্ডারের ব্যাপারে সামান্য একটু আভাস দেবেন। সামান্য। যাই করুন না কেন, সরাসরি ওটার কথা কিন্তু বলবেন না; যতক্ষণ না নিজে থেকে কথা তুলবে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে। যদি দেখাল, তো জানলেন, কপাল ভাল আপনার। আর যদি চেপে যায়, তো জানবেন, ওটা দেখার সৌভাগ্য হবে না আপনার কোনদিনই। যদি পারেন, ভুলে যান। বুঝতে হবে, আপনাকে পছন্দ হয়নি ওদের। সরাসরি প্রশ্ন করেও কোন লাভ নেই, বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে আপনার চোখের দিকে, যেন কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছে না।'

হাঁটছি। উনিশে শ্রাবণ। মঙ্গলবার। ঝরঝর ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম, কখনও হালকা, কখনও জোর, কখনও সোজা, কখনও বাঁকা হয়ে। ছাতাটা এদিক-ওদিক বাঁকিয়ে যতটা সম্ভব বাঁচাবার চেষ্টা করছি বৃষ্টির ছাট থেকে। চুপচুপে হয়ে ভিজে ভারি হয়ে গেছে জুতো জোড়া। দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়া যত কাছে আসছে ততই কমে আসছে আমার চলার গতি। কেমন ভাবে কি বলব, কিভাবে শুরু করব, কিভাবে ইঙ্গিত দেব বারবার করে মনে মনে ভেঁজে নিয়েছি আমি; কিন্তু যতই সেই দালানটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সন্দেহ এসে ভিড় করছে মনের মধ্যে, যুক্তি-তর্ক আর বাস্তব বুদ্ধি পিন ফোটাবার চেষ্টা করছে আমার বিশ্বাসের বেলুনে। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। আধ বোতল বাংলা মদ পেটে পড়বার পর রাতের বেলায় ঝুপড়ির মধ্যে টুলে বসে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মাতালের কথা যতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল, এই বিকেলে অফিসে সেরে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে কাদা

আর গাড়ির ছিটে বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ততটা আর মনে হচ্ছে না। এই রকম একটা ব্যাপার বিশ্বাস করা কঠিন। বার কয়েক ভাবলাম, ফিরে যাই; কিন্তু এতদূর এসে ফিরে গেলে আবার খুঁতখুঁত করবে মনটা, ভাবলাম, তার চেয়ে প্রায় এসেই যখন পড়েছি, সত্য-মিথ্যা যাচাই করে ফেলাই ভাল।

এগোচ্ছি, কিন্তু সন্দেহের দোলা লাগছে মনের মধ্যে। ভাবছি, যদি ওরকম একটা পুস্তিকা থেকেও থাকে, আমি কে? আমাকে দেখাতে যাবে ওরা কোন্ দুঃখে? নাম?—যেন প্রশ্ন করা হচ্ছে, এমনি ভাবে নিজেই জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে। নিজেই উত্তর দিলামঃ খালেক। আবদুল খালেক। বি, কম, পাস-এ কুমিল্লা। বাসা? বাসা?...বাসা নেই, মেসে থাকি, ইডেন বিল্ডিঙের দক্ষিণে, রেলওয়ে কলোনিতে। চাকরি করতে ভাল লাগে না আমার....কিছুই ভাল লাগে না, যা টাকা পাই দেশে একশো পাঠিয়ে খরচ কুলাতে চায় না। কোনদিন স্বচ্ছলতা আসবে না আমারা, আমি জানি। একই পদে চাকরি করছি আজ চার বছর। উন্নতি নেই, হবেও না। বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ নেই আমার, এই বিরাট ঢাকা শহরে আমি একা। আর কি বলার আছে আমার?—মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি, মজা পাই না, মাসের প্রথম দিকে এক-আঘটা বই কিনি, সারা মাস সেটাই উল্টাই-পাল্টাই একঘেয়ে...সময় কাটাতে চায় না। সত্যিই, কিছুই ভাল লাগে না আমার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই খাবার খেয়ে চলেছি একই থালায়, একই পিঁড়িতে বসে, স্বাদ বদলের সঙ্গতি নেই। চেহারায়ে, চলায়, বলায়, কাজে, চিন্তায় আমি নিতান্তই সাদামাঠা, সাধারণ এক যুবক। আপনাদের পছন্দ হবে আমাকে? মানে, আপনাদের বিবেচনায় আমাকে যোগ্য বলে...মানে, নিচ্ছেন?

দূর থেকেই ছোট্ট সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল আমার। রাস্তার ডানধারে। চারতলার উপর। খোলা জানালা দিয়ে ঝকঝকে আলো দেখা যাচ্ছে ভিতরে। অস্বস্তি বোধ করলাম—চুপচুপে ভেজা জুতো, ইস্ত্রিরিহীন জামাকাপড়, শিক-বাঁকা পুরানো ছাতা নিয়ে ওখানে হুট করে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে? প্রথম দর্শনেই যদি বাতিল করে দেয়? আজই ঢুকব, নাকি পরে কোন একদিন...নাহ্ এসে যখন পড়েছি...

ছাতাটা নিভিয়ে উঠে পড়লাম লবিতে। দেয়ালের গায়ে আঁটা রয়েছে ত্রৈশ চল্লিশটা ছোট ছোট চৌকোণে কাঠের নেমপ্লেট, তাতে বিভিন্ন কোম্পানির নাম লেখা। চট করেই পেয়ে গেলাম, 'ড্রিম ট্র্যাভেল এজেন্সি, থার্ড ফ্লোর'। মোজাইক করা টালির উপর ছাতা থেকে কুলকুল করে নেমে আসা পানি যতটা সম্ভব ঝরিয়ে নিয়ে চাপ দিলাম এলিভেটরের বোতামে। 'কোঁক' করে শব্দ হল উপরে কোথাও। পাপোশের উপর আচ্ছামত ঘষে জুতোজোড়া পরিষ্কার করে নিলাম। সড়সড় করে নেমে আসছে এলিভেটর। কেন জানি, হঠাৎ ভয় হল; ইচ্ছে হল—দূর থাক, চলে যাই। ফিরতে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় খুলে গেল এলিভেটরের সবুজ দরজা, একজন লোক ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল ওর মধ্যে থেকে, আমি ঢুকলাম। আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কয়েক সেকেন্ড হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে টিপে দিলাম তিন নাম্বার বোতামটা। মৃদু একটা গুঞ্জন ধ্বনি তুলে উপরে উঠতে শুরু করল এলিভেটর,

সোজা এসে থামল চারতলায়, দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে এলাম করিডরে। ঠিক সামনেই ড্রিম ট্রাভেল এজেন্সির পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচের দরজা।

বাইরে থেকেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেলঃ প্রশস্ত ঘর, উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট আলোয় আলোকিত। ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্লাস্টিক পেইন্ট করা দেয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন দেশের টুরিস্ট ব্যুরো আর বিমান কোম্পানির মস্ত সব রঙিন পোস্টার। কাউন্টারের ওপাশে খোলা জানালার ধারে টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা, সুদর্শন, সুবেশী পুরুষ। গম্ভীর কাঁচাপাকা জুলফি। চোখ তুলে আমাকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করল লোকটা। ভিতর ভিতর চমকে গিয়েছি আমি, ধুপধাপ লাফাতে শুরু করে দিয়েছে হৃৎপিণ্ডটা—ঠিক এই চেহারাটাই বর্ণনা করেছিল মাতাল লোকটা!

কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, পরে দেখলাম, 'পুশ' নয় 'পুল' লেখা আছে কাঁচের গায়ে। ঢুকে পড়লাম ভিতরে। 'হ্যাঁ, বিওএসি,' বলছে লোকটা ফোনে। 'ফ্লাইট সেভেন ও ফাইভ...বুকিং কমপ্লিট, 'কনফার্মড। সময়?' কাঁচ ঢাকা কাউন্টারের উপর নজর বুলিয়ে বলল, 'সিক্সটিন আওয়ার্স। তবে আপনি তিনটের মধ্যে পৌঁছে যাবেন এয়ারপোর্টে।...এক্যাক্টলি....রাইট, থ্যাংকিউ।'

কাউন্টারে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছি, চারদিকে নজর বুলিয়ে দমে যাচ্ছি ক্রমে। এই লোকই-তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অফিসটা যে আর-সব ট্র্যাভেল এজেন্সির মতই, প্রায় হুবহু এক, তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কাঁচা ঢাকা কাউন্টারের এক পাশে অবিকল প্লেনের মত ছোট-ছোট কয়েকটা উড়োজাহাজের মডেল রাখা, চওড়া একটা স্টীলর‍্যাকে থরে থরে ফোল্ডার সাজানো, কাঁচের নিচে ছাপানো শিডিউল। প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সত্যি সত্যিই এটা একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিস, আর ব্যাপারটা যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই বোকা মনে হচ্ছে আমার নিজেকে।

'বলুন, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?' সুশ্রী, লম্বা লোকটা আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল ফোনটা নামিয়ে রেখে।

ভয়ানক নার্ভাস লাগল। মনে হচ্ছে, জোর পাচ্ছি না হাঁটুতে। লোকটার চোখের দিকে চাইতে পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, 'আমি...আমি কোথাও চলে যেতে চাই।' বলেই বুঝতে পারলাম একটু বেশি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। গদর্ভ!—নিজেকে বললাম, তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। আমাদের উত্তর শুনে লোকটার কি প্রতিক্রিয়া হয়, লক্ষ করবার চেষ্টা করলাম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে। আশা করছিলাম, এই বুঝি ধমকে উঠবে লোকটা, কিন্তু না, চোখের পাপড়ি পর্যন্ত ফেলল না সে, হাসিটা মলিন হল না একটুও।

'অনেক জায়গা আছে,' খুশি-খুশি গলায় বলল সে। 'যাওয়ার জায়গা অভাব নেই। কোন্‌দিকে যেতে চান আপনি?' কক্সবাজার, কাপ্তাই, রাঙামাটি, বগুড়া-নানান জায়গার কয়েকটা ফোল্ডার বিছিয়ে দিল লোকটা কাউন্টারের উপর। ট্যুরিস্টদের মন

ভুলানোর জন্যে রঙচঙা হরেক রকম ছবি; আসলে যেমন, তারচেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে।

ভদ্রতার খাতিরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম আমি ছবিগুলোর দিকে, তারপর আস্তে মাথা নাড়লাম। কথা বলতে ভরসা পাচ্ছি না, পাছে কোন্ কথায় কি বলে বসি, ভুল হয়ে যায়।

যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছে এমনি ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। বলল, 'ও, দেশের বাইরে কোথাও যেতে চান বুঝি? দেখুন-দেখি, পছন্দ হয় কি না?' প্যান আমের একটা লম্বা ফোল্ডার বের করল সে, তার উপর আড়াআড়িভাবে লেখাঃ ফ্লাই টু বুয়েনাস আইরেস—অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড! নিচে সুন্দর একটা ছবিঃ অপূর্ব আলোকসজ্জায় সজ্জিত এক বন্দরে নেমে আসছে একটা রূপোলি উড়োজাহাজ, চাঁদের আলো ঝিলিমিল করছে সাগর জলে, পিছনে পর্বতের আভাস। 'কিংবা বারমুদা? এই সময়টায় অপূর্ব!'

সিদ্ধান্ত নিলাম, ভুল হয় হোক, খানিকটা ঝুঁকি নেয়াই ভাল। মাথা নেড়ে বললাম, 'না! ওসব না, অন্য কোথাও যেতে চাই আমি। নতুন কোন জায়গা, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করা যায়।' কথাটা বলতে বলতে সোজা লোকটার চোখের দিকে চাইলাম। 'বাকি জীবনে যেখানে থাকতে পারি।' এটুকু বলেই ঘেমে উঠলাম আমি। প্রয়োজন হলে কথা ঘুরাবার কোন রাস্তা আর রাখিনি।

কিন্তু আমার বক্তব্য শুনে অবাক হল না লোকটা, মাথা ঝাঁকাল মরমী বন্ধুর মত, মিষ্টি হেসে বলল, 'সে ব্যাপারেও আশা করি আমার আপনাকে সাহায্য করতে পারব।' সামনে ঝুঁকে কাউন্টারের উপর কনুই রাখল, দুই হাত জোড়া করে তার উপর রাখল চিবুক। যেন কোন তাড়া নেই তার, আমার জন্যে সময় ব্যয়ে কোন আপত্তি নেই। 'ঠিক কি খুঁজছেন আপনি বলুন তো? কি চান?'

উৎকণ্ঠায় দম আটকে আসতে চাইছে আমার। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বললাম, 'পালিয়ে যেতে।'

'কিসের থেকে?'

'সবকিছু...'একটু ইতস্তত করলাম। সত্যি বলতে কি, এসব কথা পরিষ্কার ভাবে ভাবিনি আমি কোনদিন। 'এই ধরুন ঢাকা থেকে, না, এই দেশ থেকেই। আসলে যে-কোন দেশ থেকে। উদ্বেগ থেকে, উৎকণ্ঠা থেকে। কাগজে যেসব খবর পড়ি, সেসব থেকে। ক্লান্তি থেকে। হীনমন্যতা থেকে। নিঃসঙ্গতা থেকে।' বলতে বলতে মুখ ছুটে গেল আমার। ঠিক যতটা উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলছি আমি জানি, কিন্তু থামতে পারলাম না। 'যা চাই, তা করতে না পারার আফসোস থেকে, বিষণ্নতা থেকে, একঘেয়েমি থেকে; আয়ুর বেশির ভাগ সময় শুধু খেয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজন বিক্রি করে দেয়ার বাধ্য-বাধকতা থেকে। আসলে হয়ত বলতে চাই, জীবন থেকে-মানে, এখানে জীবন বলতে যা বোঝায়, তা থেকে।' আবার সরাসরি চাইলাম লোকটার চোখের দিকে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'এই দুনিয়া থেকে!'

ঈষৎ বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে রইল লোকটা আমার দিকে। গম্ভীর। তীব্র দৃষ্টিতে দেখল সে আমাকে কাউন্টারের ওপাশ থেকে যতটা দেখা যায়। প্রতিমুহূর্তে আশা করছি এক্ষুণি মাথা নেড়ে বলে উঠবেঃ জনাব, কেটে পড়ুন। আপনার চিকিৎসার দরকার। কিন্তু সে-কথা বলল না লোকটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার কপালটা লক্ষ্য করছে সে এখন। কাঁচা-পাকা জুলফি চুলকাল বাম হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে। এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ করলাম আমি লোকটার মুখ। ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ রয়েছে সে মুখে, আর রয়েছে আশ্চর্য এক দয়ালু ভাব-ঠিক যেমনটা সবাই আশা করে তার বাবার মধ্যে, ধর্মগুরুর মধ্যে, জগৎপিতার মধ্যে।

দৃষ্টিটা আমার চোখে এসে স্থির হল, তারপর নাক, মুখ, চিবুক, প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখল সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। আমি টের পেলাম, নিজের সম্পর্কে আমি যতটা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে নিল লোকটা এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। হঠাৎ মুচকি হাসল সে। সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি মানুষকে ভালবাসেন? সত্যি কথাটা বলুন, কারণ সত্যা—মিথ্যা বুঝতে পারব আমি।'

'বাসি। যদিও লোকজনের সামনে ঠিক সহজ হতে পারি না, নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে পারি না, যার ফলে আমার বন্ধু প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু মানুষকে আমি সত্যিই ভালবাসি।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। মেনে নিল কথাটা। 'আপনার কি ধারণা নিজের সম্পর্কে? মোটামুটি ভাল লোক আপনি?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'কেন? কিভাবে?'

কি উত্তর দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কঠিন প্রশ্ন! ভেবেচিন্তে বললাম, 'এইজন্যে বলছি যে, যদি খারাপ কিছু করে ফেলি, সাধারণত সেজন্যে অনুশোচনা হয় আমার।'

কথাটা নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখল লোকটা কয়েক সেকেন্ড, তারপর যেন একটা প্রায়-অশ্লীল রসিকতা করতে যাচ্ছে এমনি ভাব নিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে আপনারই মত এক আধজন আসেন আমাদের কাছে, আপনি যা চাইছেন প্রায় এই ধরনের চাহিদা নিয়েই। তাঁরাও সব ছেড়ে চলে যেতে চান অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। তাই আমরা নিছক রসিকতার খাতিরেই...'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি আমি। আমাকে যদি পছন্দ হয় তাহলে ঠিক এই কথাগুলোই বলবে, বলেছিল মাতাল লোকটা! পালস বিট বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে আমার।

'...আজগুবি এক ফোল্ডার তৈরি করিয়েছি। ব্যাপারটা নিছক তামাশা, বুঝতে পেরেছেন? শুধু মজা করার জন্যেই ছাপিয়েছি আমরা পুস্তিকাটা। সবার জন্যে নয়, তাছাড়া ওটা এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ারও নিয়ম নেই; তবে আপনি, যদি আগ্রহ বোধ করেন, দেখতে পারেন ওটা।'

চাপা গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললাম, 'দেখব!'

কাউন্টারের নিচের একটা তাক ঘেঁষে একটা ফোল্ডার বের করে আনল লোকটা, কাঁচের উপর রেখে ঠেলে দিল আমার দিকে।

কাছে টেনে নিলাম আমি ওটা। ঘন নীল রঙের কাভার, ঠিক রাতে আকাশের রঙ। সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছেঃ ভার্না। কাভারের সবটা জুড়ে ফুটিফুটি অসংখ্য তারকা আঁকা। লেখাটার ঠিক পাশেই একটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাচ্ছে, চারদিকে আলোর বিচ্ছুরণ বেরোচ্ছে ওটা থেকে। পাতাটার নিচের দিকে খুব ছোট অক্ষরে লেখাঃ স্বপ্নের দেশ, শান্তির দেশ-ভার্না! জীবন এখানে ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনি। তার পাশে পাতা উল্টাবার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে মোটাসোটা একটা বেঁটে তীরের সাহায্যে।

পাতা উল্টালাম। সাধারণ আর দশটা ফোল্ডারের মতই ভিতরে হরেক রকম ছবি, লেখা। তফাৎ শুধু প্যারিস, রোম কিংবা বাহামা না হয়ে এতে যা কিছু রয়েছে সবই ভার্না সম্পর্কে। আর্ট বোর্ডের উপর অপূর্ব সুন্দর ছাপা, ছবিগুলো মনে হচ্ছে এক্কেবারে জীবন্ত। থ্রি-ডাইমেনশন রঙীন ছবি যেমন, তেমনি—কিংবা তার চেয়েও সজীব। একটা ছবিতে ঘাসের উপর শিশির জমে আছে এক ফোঁটা, মনে হচ্ছে সত্যিই, ছুঁলে হাতে পানি লাগবে। আরেকটায় বাঁকাভাবে দেখা যাচ্ছে বিশাল এক গাছের গুঁড়ি, নিখুঁত—কর্কশ বাকলের গায়ের এবড়োখেবড়ো ভাঁজ এতই জীবন্ত মনে হচ্ছে যে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে যখন দেখলাম মসৃণ কাগজ, তখন কেমন যেন ধাঁধা লেগে উঠল। আরেকটা ছবিতে কয়েকজন মানুষের মুখ, ঠোঁটগুলো ভেজা-ভেজা, চকচক করছে চোখের মণি, হাসি মুখ, খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয় এক্ষুণি কথা বলে উঠবে।

পাতা উল্টালাম। পাশাপাশি দুই পৃষ্ঠার মাথার দিকে তিন ইঞ্চি জুড়ে বড় একটা ছবি। মনে হচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে তোলা হয়েছে ছবিটা। আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়টার মাথায়। পায়ের কাছ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়, মিশেছে গিয়ে উপত্যকায়, বহুদূরে আবার একটা পাহাড়ের আভাস, ক্রমে উঁচু হচ্ছে জমিটা। পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব সুন্দর জঙ্গল, সবুজ হয়ে আছে মাইলের পর মাইল। বহু নিজে উপত্যকা বেয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলছে একটা পাহাড়ী নদী, আকাশের নীল ছায়া নদীর বুকে, মাঝে-মাঝে এক-আধটা বিশাল পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছে নদীর মাঝখানে, তার আশেপাশে সাদা ফেনা। ভাল করে ঠাহর করলে মনে হয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে নদীটা, কুলকুল ছুটছে দুর্বার, ছোট ছোট ঢেউয়ের গায়ে সূর্যের কিরণ। নদীর ধারে বেশ অনেকগুলো দোচালা চৌচালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, কোনটা কাঠের, কোনটা ইঁটের-সবগুলোই ছিমছাম, সুন্দর। ছবির নিচে শুধু একটা শব্দ লেখাঃ স্বপ্ননীড়।

'সুন্দর না?' কথা বলে উঠল কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটা। 'তামাশা হোক আর যাই হোক, একঘেয়েমি দূর হয়ে যায়, তাই না? কেমন লাগছে দেশটা?'

'অপূর্ব!' কোনমতে উচ্চারণ করলাম কথাটা, কিন্তু চোখ সরাতে পারলাম না ছবি থেকে। সত্যিই অপূর্ব। একেবারে স্বপ্নের মত। চোখে যতটা দেখছি তার চেয়ে

অনেক বেশি বুঝতে পারছি ছবি থেকে, অনুভব করতে পারছি, নির্মল এখানকার আবহাওয়া, বুক ভরে শ্বাস টানলে শুধু বাতাস নয়, শান্তি এসে যাবে বুকের মধ্যে।

এই ছবিটার নিচেই আরেকটা ফটোগ্রাফ। সাত-আটজন জটলা পাকিয়ে বসে আছে সমুদ্র, নদী বা লেকের ধারে। দুটো বাচ্চাও দেখা যাচ্ছে, খেলছে আপন মনে। সবাই হাসিখুশি, সবার হাতেই চা কিংবা কফির কাপ, কারও কারও হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, একজনের দাঁতের ফাঁকে পাইপ। রোদ আর ছায়া দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সময়টা সকাল। নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়ে ওঠায় তাজা, সজীব একটা ভাব প্রত্যেকের চোখে মুখে। বোঝা যাচ্ছে, নাস্তার পর চায়ের কাপ হাতে সবাই গল্পগুজব করে নিচ্ছে বিশ-পঁচিশ মিনিটের জন্যে, তারপর লেগে যাবে যার যার কাজে। কথা বলছে একজন, সবাই শুনছে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে অদ্ভুত এক সম্প্রীতির ভাব বিরাজ করছে সবার মধ্যে, মুখে এক মনে আর এক নেই কারও।

দেখছি তো না, গিলছি যেন আমি ছবিগুলো। লোকগুলোর কোথাও কোন কৃত্রিমতা নেই। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এখানকার প্রত্যেকটা লোক যার যার পছন্দমত কাজ করে। কারও মধ্যে তাড়াহুড়ো বা কাজের চাপের কোন লক্ষণ নেই। মনের আনন্দে মনের কাজ করে সবাই যতক্ষণ খুশি, মধুর শ্রান্তি এলে বিশ্রাম নেয় তৃপ্তির সাথে। মনের বিরুদ্ধে চলতে হয় না এখানে কাউকে।

এই ধরনের ছবি জীবনে দেখিনি আমি। লোকগুলো রিক্ত চেহারা—সুরতে সাদামাঠা, সাধারণ—এই চেহারা অহরহই দেখি আমরা আশেপাশে। দুজনের বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, দুজনের ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, আর তিনজন বেশ বয়স্ক—পঞ্চাশের উপর হবে বয়স। ছোট দুজনের মুখে দুশ্চিন্তার কোন ভাঁজ নেই। হঠাৎ কারণটা বুঝে ফেললাম আমিঃ ওরা ওখানেই জন্মেছে, ওটা এমন এক দেশ, যেখানে আশঙ্কা বা উদ্বেগের কোন স্থান নেই। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে দুজন, তাদের কপালে আর গালে ভাঁজ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওগুলো গভীরতর হচ্ছে না আর, সেরে যাওয়া ক্ষতচিহ্নের মত যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। আর বয়স্ক তিনজনের মুখে রয়েছে স্থায়ী একটা শান্তির ছাপ। কারও চেহারায় রাগ, ঘৃণা, হিংসা বা বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। বুঝলাম, সত্যিকার অর্থে সুখী ওখানে প্রত্যেকটা লোক। শুধু তাই নয়, বুঝলাম, দিনের পর দিন ধরে ওরা সুখী, শুধু অনেক...অনেকদিন ধরে সুখ ভোগ করছে তাই নয়, চিরকাল সুখী থাকবে, জানে ওরা।

ওদের কাছে যাবার ইচ্ছে হল। তীব্র একটা বাসনা বোধ করলাম। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল, মনে হল এক্ষুণি যদি ওদের সঙ্গে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে আমি উপস্থিত থাকতে পারতাম! কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হাসির মত ভঙ্গি করলাম। বললাম, 'সত্যিই....অপূর্ব!

'হ্যাঁ।' হাসল লোকটা।' এই ফোল্ডার দেখে সবাই এতই উৎসাহিত হয়ে ওঠে যে এছাড়া আর কোন কথা আলাপ করতে চায় না কিছুতেই। ওখানকার সব কথা

জানতে চায়, খুঁটিনাটি সব কথা, ওখানকার নিয়ম কানুন, কিভাবে কখন রওনা হওয়া যায়, কত ভাড়া—সব।'

'স্বাভাবিক,' বললাম। 'আমারও সেই অবস্থাই হয়েছে। সব প্রশ্নর উত্তর নিশ্চয়ই আছে আপনার কাছে?'

'অবশ্যই। কি জানতে চান?'

'এই লোকদের সম্পর্কে...' ফোল্ডারের দিকে ইঙ্গিত করলাম। 'ওদের জীবনধারা...কি করে এরা?'

'কাজ করে। সবাই ওখানে কাজ করে।' পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের করে সামনে বাড়িয়ে ধরল লোকটা, আমি মাথা নাড়তে নিজে ধরাল একটা। 'মনের মত কাজ করে জীবন কাটায় ওখানে সবাই। কেউ পড়ে। চমৎকার লাইব্রেরি আছে। কেউ কৃষিকাজে আগ্রহী—চাষাবাদ করে। কেউ লেখে। কেউ হাতের কাজে দক্ষ—সুন্দর সব জিনিস তৈরি করে। বেশির ভাগ লোকই ছেলেমেয়ে মানুষ করবার কাজে বেশ অনেকটা সময় ব্যয় করে। মোট কথা, যে যা চায় তাই করবার সুযোগ রয়েছে আমাদের ওখানে।'

'কেউ যদি কিছুই করতে না চায়?' বললাম। 'ধরুন, কোনকিছুই যদি তার ভাল না লাগে?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'সেটা হতেই পারে না। সব মানুষেরই কিছু না কিছু করতে ইচ্ছে হয়। কাজের ইচ্ছে আসলে মানুষের অন্তরের তাগিদেই আসে। মনের মত কাজ...সে তো খেলারই নামান্তর, কাজকে কাজই মনে হবে না আপনার। যার যা ইচ্ছে সেটা করবার সুযোগ না থাকলেই প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে, আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়, কিছুই ভাল লাগে না, মনে হয় করবার নেই কিছুই। তাছাড়া এখানে নিজেকে জানা, কিংবা ঠিক কোন কাজে অন্তরের তাগিদ রয়েছে বোঝা ইত্যাদির সময় কোথায়? সবকিছুতেই তাড়াহুড়ো লেগে আছে যেন।' কয়েক সেকেন্ড আপন মনে সিগারেট টানল লোকটা। 'কিন্তু ওখানে জীবনটা শান্ত, সহজ। ক্ষমতার লড়াই, যুদ্ধবিগ্রহ, খুনোকুনি, স্বার্থপরতা একেবারেই অনুপস্থিত। যার যার মনের মত কাজের মাধ্যমে সে যদি পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, সম্মান পায়, তাহলে তো আর একে অপরের পেছনে লাগবার প্রয়োজনই থাকে না। কাজেই-ছোট-বড় নেই আমাদের ওখানে, সম্মানের কমবেশি নেই। সবাই সবাইকে ভালবাসছে, বাস করছে সমাজবদ্ধভাবে। যার যা ক্ষমতা, প্রয়োগ করছে সবাই সমাজের সমষ্টিগত মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। ইলেকট্রিসিটি রয়েছে ওখানে। কাজের চাপ কমাবার জন্যে রয়েছে ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকিয়ুম ক্লিনার, ইলেকট্রিক আভন। ওষুধপত্র রয়েছে, রয়েছে আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যবস্থা। কিন্তু রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন বা গাড়িঘোড়া পাবেন না আপনি ওখানে। রোজ সকালে পিলে চমকে দেয়ার জন্যে খবরের কাগজ নেই। ওসবের প্রয়োজন পড়ে না ওখানকার বাসিন্দাদের। বড়জোর দুই বর্গমাইল নিয়ে এক একটা জনপদ। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তারা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। প্রত্যেকে নিজের পছন্দ মত বাড়ি তৈরি

করে নেয়, প্রতিবেশীরা সবরকমের সাহায্য করে তাকে। আমোদ ফূর্তির হরেক রকম ব্যবস্থা রয়েছে ওখানে, যার যেমন খুশি তেমনি ভাবে অবসর বিনোদন করে; কিন্তু টিকেটের ব্যবস্থা নেই কোথাও-প্রমোদ বিক্রি করে না কেউ। সিনেমা, নাচ, গান, পার্টি, জন্মদিন, বিয়ে, সব রকমের খেলাখুলা, হাসি-তামাশা, হৈ-হুল্লোড়—কোনকিছুর কমতি নেই। একজন বেড়াতে যাচ্ছে আরেকজনের বাড়িতে, খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, গল্পগুজব হচ্ছে। বিশ্রামের সময়টা কেটে যাচ্ছে আনন্দে। প্রতিটি দিন পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠছে প্রত্যেকের। কারও ওপর কোন চাপ নেই—না সামাজিক, না অর্থনৈতিক। জীবন ওখানে সহজ, স্বচ্ছন্দ। নারী-পুরুষ—শিশু কারও মধ্যে দুঃখ বলতে কিছু খুঁজে পাবেন না আপনি।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মিষ্টি করে হাসল লোকটা। 'মজা করার জন্যে তৈরি করেছি আমরা এই ফোল্ডার। বুঝতেই পারছেন, আমি যা বলছি, নিছক রসিকতার খাতিরেই বলছি।'

'তা তো বটেই,' আমিও হাসলাম। আমি জানি, সাবধানতার খাতিরে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় ওরা যে, এটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার মাথা ঝাঁকালাম। 'তা তো বটেই।'

আরেকটা পাতা উল্টালাম। নানান ধরনের ঘরের ছবি গোটা দশেক। নিচে লেখাঃ শান্তিকুটির। দূর থেকে যে বাড়িগুলো দেখা গিয়েছিল এগুলো নিশ্চয়ই সেগুলোর অভ্যন্তরীণ ছবি। জীবনযাত্রা বোঝাবার জন্যে ঘরের ভিতর থেকে তোলা হয়েছে ছবিগুলো—কোনটা শোবার ঘরের, কোনটা বৈঠকখানার, কোনটা রান্নাঘরের, কোনটা পড়ার ঘরের। আসবাবগুলো দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সময় বাঁচাবার জন্যে যেমন তেমন ভাবে খাড়া করা হয়নি ওগুলো; ধীরেসুস্থে, রীতিমত যত্নের সঙ্গে সুন্দর করে সাজানো। বেডকাভার, টেলিলক্লথ, পর্দা, প্রত্যেকটা জিনিসেই সুন্দর সব ডিজাইন, বাড়ির মেয়েদের নিজ হাতে করা। একটা ড্রইংরুমের দেয়ালে টাঙানো অয়েল পেইটিং খুব পরিচিত ঠেকল আমার চোখে...অনেকটা আমাদের শিল্পী ইমরুল হাসানের ছবির মত। সোফাসেটের কারুকাজ দেখে রীতিমত চমকে উঠলাম আমি। একনাগাড়ে কাজ করলে যে-কোন ভাল কারিগরের অন্তত তিনটে বছর লাগবে ওগুলো তৈরি করতে।

'এত সময় পায় কি করে ওখানকার লোকরা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সময়ের অভাব নেই আমাদের ওখানে,' বলল লোকটা মুচকি হেসে। 'ওখানে মানুষ বাঁচে পাঁচ-ছয়শো বছর। আর একটা আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছি—তখন বাঁচবে দু'হাজার বছর।'

'আপনি কে?' সরাসরি চাইলাম লোকটার চোখের দিকে।

'পিছনের পাতায় লেখা আছে,' বলল লোকটা সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে। 'আমরা-মানে ভার্নার আদি অধিবাসীরা প্রায় সবদিক থেকে পৃথিবীর মানুষের মতই। ভার্নায় আপনাদের পৃথিবীর মতই আকাশ, বাতাস, মাটি, পাহাড়, সমুদ্র, নদী—সব রয়েছে। আমাদের সূর্যটা অবশ্য আকারে বড়...আপনাদেরটার প্রায় দ্বিগুণ। চাঁদ আমাদের দুটো। কিন্তু আবহাওয়া প্রায় অবিকল এক। কাজেই এখানে যেমন

হয়েছে, আমাদের ওখানেও জন্ম হয়েছে প্রাণের। আমরা যদিও আপনাদের চেয়ে কয়েক হাজার বছর আগেই সভ্য হয়েছি, আমরাও আপনাদের মতই মানুষ। শারীরিক গঠনে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু সেটা উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। আপনাদের রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, সেক্সপীয়র, বার্নার্ডশ, টলস্টয়, দস্তোয়েভস্কি, হেমিংওয়েকে আমরা আপনাদের চেয়ে কম ভালবাসি না। আপনাদের চকোলেট আমাদের খুব পছন্দ—ওটার চল্ আগে ছিল না আমাদের মধ্যে। আপনাদের সঙ্গীতেরও আমরা মস্ত ভক্ত। বেটোফেন, মোজার্ট থেকে শুরু করে আপনাদের ওস্তাদ আলাউদ্দিন, আলী আকবর, রবিশংকর, ফৈয়ায খান, বড়ে গোলাম আলী-সবার রেকর্ডে ঠাসা রয়েছে আমাদের মিউজিক লাইব্রেরি। শুনলে অবাক হবেন, সম্রাট আকবরের দরবার থেকে মিঞা তানসেনের গোটা দশেক খেয়াল রেকর্ড করে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের এক প্রতিনিধি। সব আছে আমাদের ওখানে। আপনাদের অনেক কিছু যেমন আমরা পছন্দ করি, তেমনি আমাদের অনেক কিছুও পছন্দ হবে আপনাদের। যদিও চিন্তা ভাবনার দিক থেকে, মূল্যবোধ আর জীবনের মূল লক্ষ্য ও সার্থকতার ধ্যান-ধারণার দিক থেকে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, তবু অসংখ্য ব্যাপারে মিল পাবেন আপনি দুই গ্রহের মধ্যে।' গোটা দুয়েক টান দিয়ে ফেলে দিল লোকটা সিগারেট। 'মজার তামাশা, তাই না?'

'হ্যাঁ। ভার্নাটা আসলে কোথায়?'

'আপনাদের হিসেব অনুযায়ী কয়েকশো আলোক বৎসর দূরে।'

'আলোক বৎসর মানে?'

'ওটা দূরত্বের একটা হিসেব। আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ড প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তার মানে প্রতি মিনিটে আলোকরশ্মি এক কোটি এগারো লক্ষ ষাট হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। প্রতি ঘণ্টায় যায় এর ষাটগুণ। প্রতি দিনে যায় তারও চব্বিশগুণ। বুঝতে পারছেন? এইভাবে যদি এক বৎসর ধরে আলোটা চলতে থাকে তাহলে যত মাইল যাবে সেই দূরত্বকে হিসেবের সুবিধের জন্যে বলা হয় আলোক বৎসর। আমাদের ভার্না পৃথিবী থেকে কয়েকশো আলোক বৎসর দূরে।

কেন জানি না, হঠাৎ মেজাজটা খিঁচড়ে গেল আমার। আচমকা আশাভঙ্গ হলে যেমন হয়, তেমনি।

'দূরত্বটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' বললাম আমি। 'আলোর সমান গতিতে চললেও কয়েকশো বছর লেগে যাবে ওখানে পৌঁছতেই। আলোর চেয়েও দ্রুত তো আর কিছু হতে পরে না?'

'কে বললে?' মৃদু হেসে চোখ টিপল লোকটা। 'এদিকে আসুন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটু সরে আসুন এপাশটায়।' নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেই জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে পিঠাপিঠি দাঁড়ানো বিশাল একজোড়া অফিস-বিল্ডিং দেখাল লোকটা। 'ওই যে জোড়া দালান দেখছেন, ওর একটার মুখ দিলকুশার দিকে, আরেকটার মুখ মতিঝিলের রাস্তার দিকে। দেখতে পাচ্ছেন দালান দুটো?'

আমি মাথা ঝাঁকাতেই আবার শুরু করল, 'মনে করুন দুই দালানের সাততালার ওপর কাজ করে দুই বান্ধবী, দুজনই স্টেনো-টাইপিস্ট, । এদের দুজনেরই অফিস মনে করুন, দুই দালানের একেবারে শেষ দেয়াল ঘেঁষে। অর্থাৎ একভাবে ভাবতে গেলে দু'জন কিন্তু দু'জনের তিন-চার ফুটের মধ্যেই রয়েছে। অথচ সেলিনার সঙ্গে দেখা করতে হলে নাজমার এগোতে হবে সিঁড়িঘরের দিকে, এলিভেটর পেলে ভাল, নইলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে হবে নিচে। তারপর দালান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করবে সে ওই মোড়ের দিকে। মোড় ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসবে সে উল্টোদিকের দালানটার সামনে, লবিতে ঢুকে অপেক্ষা করবে এলিভেটরের জন্যে, পেলে ভাল, নইলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে হবে তার সাততলার ওপর, করিডর ধরে এগিয়ে সেলিনার অফিসের সামনে গিয়ে টিপতে হবে কলিংবেল। সেলিনা এসে ওকে নিজের কামরায় নিয়ে যাওয়ার পর কথা বলবার আগে পুরো একটা মিনিট দম নিতে হবে নাজমার। কিন্তু আসলে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করল নাজমা?—বড়জোর তিন কি চার ফুট।' হাসল লোকটা। 'আপনাকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, নাজমা যেভাবে সেলিনার কাছে গেল সেটা মহাশূন্যযানের পথ চলার মত দীর্ঘ এক যাত্রা, আক্ষরিক অর্থে বাস্তব অতিক্রমণ। কিন্তু তা না করে যদি সে কোনভাবে তিন-চার ফুট দেয়াল অতিক্রম করতে পারত নিজের বা দেয়ালের কোন ক্ষতি না করে, তাহলে আর...বুঝলেন না, এইভাবেই চলি আমরা...মহাশূন্য পাড়ি না দিয়ে সেটাকে এড়িয়ে যাই।' কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'দূত্ব যতশো আলোক বৎসরই হোক না কেন, এখানে শ্বাস টানবেন, ছাড়বেন ভার্নায়।'

বুঝলাম, কল্পনাতীত কিছু আবিষ্কার করেছে ওরা, কিংবা বলা যায় না, হয়ত কল্পনাকেই আবিষ্কার করেছে, তারই সাহায্যে কোটি কোটি মাইল পেরিয়ে যেতে পারে ওরা চোখের পলকে। বললাম, 'সেইভাবেই এসেছে নিশ্চয়ই এটা? নিশ্চয়ই ওখানে তোলা হয়েছে ছবিগুলো?' ফোল্ডারের দিকে চোখের ইশারা করলাম।

'ছাপাও হয়েছে ওখানেই।'

'কেন?'

কয়েক সেকেন্ড ঠিক যেন বুঝতে পারল না লোকটা আমার প্রশ্ন, তারপর বলল, 'আপনার প্রতিবেশীর ঘর আগুন লেগে পুড়ে যেতে দেখলে আপনার সাধ্যমত সাহায্য করবেন না আপনি তাকে? উদ্ধার করতে চেষ্টা করবেন না যতজনকে পারা যায়?'

'করব।'

'তেমনি আমরাও করছি।'

'এতই খারাপ!' অবাক হয়ে চাইলাম আমি লোকটার মুখের দিকে। 'আমাদের অবস্থা এতই খারাপ তাহলে?'

'আপনার কাছে কতটা খারাপ মনে হয়?'

খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। বললাম, 'খুব একটা সুবিধের নয়।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। বলল, 'আপনাদের সবাইকে ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, খুব বেশি লোক চাই না আমরা আমাদের গ্রহে। তাই বাছাই করে নিচ্ছি।'

'কতদিন ধরে কাজ চলছে?'

'বহুদিন।' হাসল লোকটা। 'আপনাকে বলেছি, সম্রাট আকবরের দরবারে আমাদের লোক ছিল। কিন্তু তখন আমরা কেবল দর্শকের ভূমিকায় ছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কি ঘটতে চলেছে আপনাদের ভাগ্যে। সাতচল্লিশ সালে যখন ভারতবর্ষকে ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশরা চলে গেল এদেশ ছেড়ে, তখনই আমরা বুঝে নিয়েছি উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ—ওই বছরেই আমাদের এজেন্সি খুলি আমরা বম্বে, করাচী আর ঢাকাতে। সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত, তাই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত, বড় বড় শহরেই খুলেছি আমরা কাউন্টার, প্রতি বছর হাজার দুয়েক লোক বাছাই করে পাঠানো হচ্ছে ভার্নায়।'

'সাতচল্লিশ সালে...' কি যেন মনে পড়ে যেতে চাইছে আমার। হঠাৎ স্মরণ হল। 'আচ্ছা! ওই বছরই না...'

'ঠিক ধরেছেন, ' আমার প্রশ্নটা আঁচ করে নিয়ে মুচকে হাসল লোকটা। 'ওই বছরেরই শেষের দিকে নিখোঁজ হয়েছিলেন আপনাদের খালেদ চৌধুরী, তেপ্পান্ন সালে শিল্পী ইমরুল হাসান। এই যে ছবিটা দেখছেন...ফোল্ডারের সেই অয়েল পেইটিং দেখাল লোকটা তর্জনীর নখ দিয়ে, ওটা ওখানে বসে এঁকেছেন ইমরুল হাসান, এখনও অক্লান্তভাবে একের পর এক অপূর্ব ছবি এঁকে চলেছেন তিনি। খালেদ চৌধুরী অবশ্য মারা গেছেন গত বছর। এমনিতেই অনেক বয়স হয়েছিল তাঁর। আরও দশটা উপন্যাস লিখে গেছেন তিনি এই কয় বছরে, সব রয়েছে আমাদের লাইব্রেরিতে। এই যে বাড়িটা দেখছেন...'পাতা উল্টো বড় ছবিটার একজায়গায় আঙুল রাখল সে, 'এটাই খালেদ চৌধুরীর বাড়ি ছিল। এখন পাবলিক লাইব্রেরি।'

'আর জাস্টিস আবুল হাশেম?'

'আবুল হাশেম?'

'আর একটা সাড়া জাগানো নিখোঁজ সংবাদ। সিক্সটিফাইভে হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনি।'

'ঠিক বলতে পারছি না। শুনেছি ঢাকা থেকে এক জজ গেছেন বছর দশেক আগে, নামটা খেয়াল নেই নাক চুলকাল। 'তবে আপনাদের জাহিদ রায়হানের ব্যাপারটা জানা আছে আমার পরিষ্কার। আমার হাত দিয়েই...'

'জাহিদ রায়হান! উনিও কি আপনাদের ওখানে?' চোখজোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল আমার। 'মারা যাননি তাহলে তিনি? যুদ্ধের পরপরই...'

'হ্যাঁ। বাহাত্তরের গোড়ার দিকে তাকে নিয়ে যাই আমরা। কাগজে অনেক হৈ-চৈ হয়েয়ে তাঁকে নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত, শেষপর্যন্ত সবাই ধরে নিয়েছে মারাই গেছেন ভদ্রলোক। আসলে মারা যাননি তিনি, অপূর্ব তিনটে হাসির ফিল্‌ম্ তৈরি

করেছেন ওখানে বসে। দারুণ হিট ছবি। ওফ্...হাসতে হাসতে খিল ধরে যায় পেটে। দেখেছি আমি তিনটেই।'

আগ্রহের আতিশয্যে কাউন্টারের উপর কনুই রেখে ঝুঁকে এলাম আমি সামনে। কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'আপনাদের রসিকতা আমর পছন্দ হয়েছে। কতটা, তা বুঝিয়ে বলবার ভাষা আমার নেই।' অনেকটা অনুনয়ের সুরে বললাম, 'কবে, কখন এ রসিকতা সত্যি হবে?'

পলকহীন চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল লোকটা আমার চোখের দিকে, তারপর নিচু গলায় বলল, 'এখনি। যদি আপনি চান।'

মাতাল লোকটার কথা পরিষ্কার মনে পড়ল আমার। ও বলেছিলঃ ওইখানে দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে আপনার ঝটপট। একবার হেলায় হারালে কোনদিন সুযোগ পাবেন না আর। আমি জানি, এ আমার নিষ্ঠুর বাস্তব অভিজ্ঞতা।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। কিছু লোক আছে যাদের দেখতে না পেলে বেশ খারাপ লাগবে আমার; একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল...বেশ পছন্দও হয়েছিল ওকে; ছোট ভাইটা পড়ছে—ওর লেখাপড়ার ব্যাপারে অনেকটা নির্ভর করত বাবা আমার পাঠানো একশো টাকার উপর—তাছাড়া এই পৃথিবীতেই জন্ম আমার। একটা আক্ষেপ আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু যেই ভাবলাম, যদি এখন পিছিয়ে যাই, এখান থেকে বেরিয়ে ছাতা মাথায় ফিরব মেসে, নিরানন্দ সন্ধে ডিঙিয়ে আসবে ক্লান্তির রাত, সকালে উঠে রওনা হব অফিসের দিকে, আরও ক্লান্ত হয়ে বিকেলে ফিরে আসব মেসে, এইভাবে চলতে থাকবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস-অমনি চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠল আশ্চর্য সুন্দর সেই উপত্যকার ছবি, সুখী মানুষদের ছবি, সেই উচ্ছল পাহাড়ী নদীটার ছবি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

'যদি আমাকে নেন, যাব আমি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখটা পরীক্ষা করল লোকটা। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখুন। মনস্থির করে উত্তর দিন। আমরা চাই না আমাদের ওখানে গিয়ে কেউ অসুখী হোক, বা অনুশোচনায় ভুগুক। আপনার মনে যদি সামান্যতম দ্বিধা বা অনিশ্চতয়তা থাকে, তাহলে বরং...'

'কোন দ্বিধা নেই। আমি যাব,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

কাঁচা-পাকা জুলফি চুলকাল লোকটা, তারপর একটা ড্রয়ার টেনে ট্রেনের টিকেটের মত ছোট্ট একটা হলুদ কার্ড বের করল। কার্ডের মাঝ বরাবর লম্বালম্বি ভাবে একটা সিকি ইঞ্চি চওড়া সবুজ দাগ, সেই দাগের উপরে-নিচে ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে কয়েকটা কথাঃ ঢাকা টু ভীনা। ওয়ান ওয়ে ওনলি। ভ্যালিড ওনলি ফর টুডে। নন-ট্রান্সফারেবল। অর্থাৎ আজই রওনা হতে হচ্ছে, আমার, ফিরে আসতে পারছি না আর কোনদিন, এই টিকেট আর কারও কাছে হস্তান্তরও করতে পারছি না।

'কত...মানে, কত দিতে হবে, পকেটে হাত দিলাম। এরা টাকা নেয় কিনা জানি না বলে দোটানা ভাব নিয়ে বের করলাম মানিব্যাগটা।

ব্যাগটার দিকে চাইল লোকটা। 'যা আছে সব। ভাঙতি যা আছে তাও।' হাসল লোকটা। 'টাকার দরকার পড়বে না আর আপনার, কিন্তু আমরা আপনার এই টাকা দিয়ে এখানকার খরচ চালিয়ে নিতে পারব কিছুটা। অনেক খরচ আমাদেরঃ লাইট বিল, ভাড়া, গাড়ির মেইনটেন্যান্স...'

'কিন্তু আমার কাছে বেশি যে নেই!'

'তাতে কিছু এসে যায় না। কাউন্টারের নিচের আর একটা তাক থেকে একটা তারিখ বসাবার যন্ত্র বের করল লোকটা। টিকেটটা যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিল মাথার উপর। একবার একটা টিকেট বিক্রি করে পেয়েছিলাম তেরানব্বই হাজার টাকা। ঠিক ওই রকম আর একটা টিকেট বিক্রি করেছি আমরা পাঁচ পয়সায়।' টিকেটটা বাড়িয়ে ধরল সে এবার আমার দিকে। দেখলামঃ ভ্যালিড ওনলি ফর টুডে লেখাটার নিচে তারিখ পড়ে গেছে।

মানিব্যাগে যা ছিল সব বের করে দিলাম, সব মিলে হল একশো বত্রিশ টাকা, পকেটে হাতড়ে খুচরো পাওয়া গেল সাতাশী পয়সা, সেগুলোও বের করে রাখলাম কাউন্টারের উপর। অবাক লাগল ভাবতে, আজ মাসের তিন তারিখ, অথচ বাকি টাকা সব শেষ!

'এই টিকেট নিয়ে সোজা চলে যান আমাদের কমলাপুর ডিপো অফিসে,' বলল লোকটা। 'হেঁটে যাবেন। পথে কারও সাথে ভুলেও আলাপ করবেন না ভার্না সম্পর্কে। বুঝতে পেরেছেন?'

আমি মাথা ঝাঁকাতেই কোন্ রাস্তা ধরে কোনদিকে কতদূর গেলে পাওয়া যাবে ওদের ডিপো অফিস তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে বিদায় করে দিল সে আমাকে মিষ্টি হাসি হেসে। ছাতটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কমলাপুরের পুল পেরিয়ে আরও বেশ অনেকটা গিয়ে বাজারের কাছাকাছি পাওয়া গেল অফিসটা। ছোট একখানা পুরনো রঙচটা সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছেঃ ড্রিম ডিপো। জরাজীর্ণ অবস্থা ঘরটার। মেঝেটা পাকা, দেয়াল আর ছাত জং ধরা টিনের, সামনে ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা।

অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি, কাদা হয়ে গেছে সরু রাস্তায়। গোটা কয়েক বিছানো ইঁটের উপর সাবধানে পা ফেলে উঠে এলাম বারান্দায়। আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দিলাম ভিতরে। গ্রামের পোস্ট অফিসের মত একটা জীর্ণ কাউন্টার, ওপাশে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র ঘাঁটছে একজন লোক গভীর মনোযোগের সঙ্গে, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। এপাশে গোটা কয়েক বেঢপ ডিজাইনের খটখটে চেয়ার। জনা পাঁচেক লোক বসে আছে চেয়ারে। আমি মাথা গলাতেই পাঁচজোড়া চোখ ফিরল আমার দিকে। নিরুৎসুক দৃষ্টি। কাউন্টারেরও ওপাশে দাঁড়াতে লোকটা বহুকষ্টে কাগজপত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করল তার দৃষ্টি, আমার উপর মোটামুটি ভাবে নজর বুলিয়েই দৃষ্টি স্থির হল এসে আমার হাতে। টিকেট দেখাতে হবে বুঝতে পেরে চট করে বের করলাম ওটা

বুক পকেট থেকে। মাথা ঝাঁকাল লোকটা গম্ভীর ভাবে, অবশিষ্ট খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল বসবার জন্যে, তারপর আবার ডুবে গেল নিজের কাজে। লোকটার চাঁদির ঠিক একহাত উপরে একটা তারের মাথায় জ্বলছে একখানা উলঙ্গ বাল্‌ব্‌।

বসলাম। আমার পাশের চেয়ারে বসে আছে এক তেইশ চব্বিশ বছরের যুবতী, হাত দুটো আঁকড়ে ধরে আছে সাদা একখানা ভ্যানিটি ব্যাগ। এ কেন ভাঁনায় চলেছে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম। দেশে মনে হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের রিসেপশনিস্ট। বসের সঙ্গে গোপন প্রেম ধরা পড়ায় কি ভাগছে এখন বস্‌-গিন্নীর ভয়ে? নাকি ঝগড়া হয়েছে প্রেমিকের সঙ্গে? যাই হোক, মেয়েটা দেখতে ভাল। কে জানে, হয়ত ভাঁনায় গিয়ে দেখা যাবে এরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে আমার ভাগ্য। মনে মনে বুঝলাম, হলে নেহাত মন্দ হবে না ব্যাপারটা। মেয়েটার পাশের দুটো চেয়ারে দুজন প্রৌঢ় নারী-পুরুষ, দুজনই দেখতে স্কুল মাস্টারের মত-সাদামাঠা পোশাক, গাম্ভীর্য, সবকিছুতেই সেই ছাপ। এদের পাশে বসে আছে একজন ইউরোপীয়ান, কি করে বা করত আন্দাজ করতে পারলাম না। তার পাশে বসে আছে একজন প্রবীন লোক, ষাটের কাছাকাছি হবে বয়স। আমাদের দিক থেকে মুখটা একটু ফিরিয়ে আধ-ভেজানো দরজা দিয়ে বৃষ্টির দিকে চেয়ে রয়েছে ভদ্রলোক। অত্যন্ত দামি পোশাক-পরিচ্ছদ, বাম হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে সোনার আঙটিতে বাঁধানো একখানা দামি পাথর। দেখে মনে হচ্ছে, বিরাট কোন ব্যাংক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। টিকেটের জন্যে এই লোক কত টাকা দিয়েছে না জানি!—ভাবলাম।

বৃষ্টি-বাদল দুর্যোগের দিন, সন্ধে ঘনিয়ে এল একটু আগেভাগেই। প্রায় পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষার পর কেমন একটু অধৈর্য লেগে উঠল। শুধু জুতো না, প্যান্টও হাঁটু পর্যন্ত চুপচুপে ভেজা, শীত শীত লাগছে। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটা কাজ করছে তো করছেই, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। কিছু জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছিলাম, এমনি সময়ে একটা ইঞ্জিনের ঝরঝরে আওয়াজ কানে এল। দরজা দিয়ে চেয়ে দেখি ব্রিটিশ আমলের এক পুরনো লক্কড়ে বাস এসে থেমে দাঁড়াল সামনের রাস্তায়। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ইঞ্জিন থেকে, সারাটা শরীর এত জোরে কাঁপছে যে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি কব্জা খসে খুলে পড়ে যাবে দরজা। পুরানো পেইন্টের উপর দরজা জানালা রাঙাবার সবুজ এনামেল পেইন্ট দিয়ে রঙ করা হয়েছিল বাসটা খুব সম্ভব বছর পাঁচেক আগে, এখানে ওখানে চল্টা উঠে গিয়ে চেহারা হয়েছে এখন ঘেয়ো কুকরের মত। টায়ারের থ্রেডগুলো করে ঘষে ক্ষয়ে সমান হয়ে গিয়েছে কেউ বলতে পারবে না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিক চেয়ে বার দুই 'পঁক, পঁক,' ভেঁপু-হর্ন বাজাল ড্রাইভার। চোখ তুলল চুরুটখেকো ব্যস্তবাগীশ, আমাদের ইঙ্গিত করল বাসে গিয়ে উঠবার জন্যে।

এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে, চারপাশে পানি ছিটাতে ছিটাতে কমলাপুর স্টেশনের সামনে ভাল রাস্তায় উঠল ছোট্ট বাসটা। তারপর ঘণ্টায় বারো মাইল বেগে গদাইলস্করী চালে রওনা দিল সোজা পশ্চিম দিকে। দুপারের জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে আমরা ছয়জন বসে আছি বাসের মাঝ বরাবর লম্বালম্বি

ভাবে পাতা একটা বেঞ্চের উপর, চড়চড় শব্দে বৃষ্টি পড়ছে গাড়ির ছাতে, বিষণ্ন ভঙ্গিতে চেয়ে রয়েছি আমরা বাইরের দিকে। এ-মোড়ে, ও-মোড়ে ভিড় দেখলাম; কয়েকটা বাসস্ট্যান্ডে ছাতা মাথায় অপেক্ষা করছে যাত্রীরা বাসের জন্যে-কিছু বোঝাই বাস থামছে না, বিক্ষোভ দেখলাম যাত্রীদের চোখে-মুখে; একটা প্রাইভেট কার ছলাৎ করে একরাশ কাদাপানি ছিটিয়ে একজনের পরিষ্কার কাপড় নষ্ট করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল-রাগ দেখলাম লোকটার মুখে; বাংলা মোটরের কাছে লাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে থেমে দাঁড়াল আমাদের বাস, পিলপিল করে রাস্তা পেরোচ্ছে অনেক ধরনের অনেক মানুষ—অসংখ্য মানুষের মুখ দেখলাম আমি, কিন্তু কারও মুখে হাসি বা খুশির চিহ্নমাত্র দেখলাম না। কী এক মস্ত ভার যেন রয়েছে সবার কাঁধে, বইতে পারছে না, তবু বইতে হচ্ছে বিষণ্ন মনে।

ঝিমুনি এসে গেল আমার গাড়ির ঝাঁকুনিতে। চলছে তো চলছেই, পথের যেন শেষ নেই। একবার চোখ মেলে দেখলাম মিরপুর ব্রিজে পেরোচ্ছি। বেশ গাঢ় হয়ে গেছে সন্ধ্যা, বাঁধা গতিতে চলছে বাস সাভারের দিকে, বামপাশে সমুদ্রের মত বিশাল বিল, জোর বাতাসে ফেনা উঠে গেছে ঢেউয়ের মাথায়। আবার চোখ বুজে এল, ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেল চোখের পলকে—যখন চোখ খুললাম, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চলার বিরাম নেই, এখনও চলছে বাসটা খ্যাড়খেড়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে। তিনি ওয়াটের ছোট্ট একটা বাতি জ্বেলে দিয়েছে ড্রাইভার এপাশে, সেই আলোয় দেখলাম যেমন ছিল তেমনি পাথর হয়ে বসে আছে সবাই যে যার জায়গায়।

নয়ারহাট, ধামরাই ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ বাম দিকে মোড় নিয়ে একটা খোয়া বিছানা রাস্তায় পড়ল বাস। সেই রাস্তা ধরে আধমাইল গিয়ে থেমে দাঁড়াল আবার মোড় নিয়ে। হেডলাইটের ম্লান আলোয় খামারবাড়ি দেখতে পেলাম সামনে। ইঞ্জিন থামিয়ে হেডলাইট অফ করে দিল ড্রাইভার, খামারের কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। ড্রাইভারকে দরজা খুলে নামতে দেখে আমরাও নেমে পড়লাম সার বেঁধে।

বৃষ্টি কমে গেছে। ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা একটা গোলাঘরের দিকে। বেড়ার ঝাঁপ তুলে আমাদের ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করল ড্রাইভার, সার বেঁধে ঢুকলাম, ঝাঁপ নামিয়ে নিজেও ভিতরে চলে এল সে। টর্চ জ্বালল। দেখলাম বড়সড় ঘরটার একপাশে গাদা করা রয়েছে খড়, আসবাব বলতে ঘরের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে পাতা একটা কাঠের বেঞ্চ। মেঝেটা মাটির। কেমন সোঁদা একটা গন্ধ, অনেকটা গোয়ালঘরের মত।

বেঞ্চের উপর আলো ফেলল লোকটা। বলল, 'বসে পড়ুন। প্লীজ সিট ডাউন।' বসলাম সবাই। বলল, 'টিকেট, প্লীজ।' বের করলাম যার যার টিকেট। একটা পাঞ্চিং মেশিন দিয়ে কুট-কুট কেটে দিল লোকটা সবার টিকেট। টর্চের আলোয় দেখলাম, মেঝের উপর গোল অনেক চাকতি পড়ে আছে। বোঝা গেল, বহু লোকের টিকেট পাঞ্চ করা হয়েছে এখানে এর আগে। দরজার কাছে চলে গেল লোকটা, একহাতে ঝাঁপটা তুলে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পিছন দিকে। 'চলি, গুডলাক।

চুপচাপ বসে থাকুন ওখানটায়।' পিছনে আকাশ থাকায় আবছা মত দেখলাম আমরা লোকটাকে। হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, ঝপ করে নেমে গেল ঝাঁপ। বেড়ার ফাঁকে বিন্দু বিন্দু টর্চের ফাঁকে বিন্দু টর্চের আলো দেখা গেল কয়েক সেকেন্ড, তারপর সব অন্ধকার,। খানিক বাদেই শোনা গেল ইঞ্জিনের গর্জন, ঝরঝর আওয়াজ তুলে চলে গেল বাসটা।

চুপচাপ বসে আছি। আমাদের ছয়জনের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোন আওয়াজ নেই। নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে সময়। বাসের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরেও কেটে গেছে পাঁচমিনিট। অস্বস্তি বোধ করছি। কারও সঙ্গে কথা বলবার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু মন্তব্য খুঁজে পেলাম না। কেমন যেন বিব্রত বোধ করছি, বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, নির্জন এক খামারের পরিত্যক্ত গোলাঘরে বসে আছি আমরা বোকার মত, কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে এখানে বসে কি করছি আমরা ক'জন, উত্তর নেই; কোন জবাব দিতে পারব না আমরা। বেশ শীত লাগছে। অস্থিরভাবে পা নাচালাম কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বুঝে ফেললাম সব।

দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে সবকিছু। মুহূর্তে ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় গরম হয়ে উঠল আমার মুখটা। রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম। ঠকানো হয়েছে আমাদের! বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নির্মমভাবে ঠকানো হয়েছে আমাদের সবাইকে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। টাকা পয়সা যা ছিল সর্বস্ব নিয়ে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে। আসলে ঠকবাজের দল ওরা-হায় হায় কোম্পানি। থাকো এখন বসে! যতক্ষণ না হুঁশ হচ্ছে বসে থাক, তারপর যখন আজগুবি গল্পের মোহ কাটবে যেমন ভাবে পার ফিরে যাও ঢাকায়। এদের বিরুদ্ধে নালিশ করেও কোন লাভ নেই। এদের উদ্ভট সব কথায় বিশ্বাস করায় লোকে গালি দেবে আমাদেরই। ছিঃ ছিঃ! কি করে বিশ্বাস করলাম আমি ওসব? কি করে আটকা পড়লাম ওদের কথার জালে? একলাফে উঠে দাঁড়ালাম, অসমান মেঝের উপর দিয়ে দরজার দিকে এগোলাম অন্ধকার হাতড়ে। এক্ষুণি থানায় খবর দেয়া, বা ওই জাতীয় কিছু একটা করার ইচ্ছে ছিল আমার মনে। ঝাঁপটা বেশ ভারি ঠেকল, জোরে ধাক্কা দিয়ে তুলে ফেললাম। বাইরে বেরিয়ে ঝাঁপটা নামিয়ে দিতে গিয়েও পিছন ফিরলাম আর সবাইকে ডাকব বলে।

মরতে মরতে বেঁচে গেছে এমন যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, কিংবা আপনার হয়ত নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে, সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে মানুষ কতকিছু দেখতে, বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে; আর সেসব কত স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে যায় মনের পর্দায়। যেই পিছন ফিরলাম, ওমনি দপ করে তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠল গোলাঘরের ভিতর। হাত থেকে খসে ঝপাৎ করে বন্ধ গেল ঝাঁপটা। কিন্তু সেইটুকু সময়ের মধ্যেই রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের মত তীব্র এক ঝলক নীল আলো দেখতে পেলাম, হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিলাম ওদের ডাকবার জন্যে—জীবনে এত মিষ্টি বাতাস আমি বুকের ভিতর টানিনি। পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই উপত্যকাটা, ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া সবুজ জঙ্গল, সেই পাহাড়ী নদী, তার তীরে ঘরগুলো। পাথরের মত ঝাঁপটা খুলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখ

ধাঁধিয়ে গেছে, গায়ে খামচিই দিলাম কেবল, খুলতে পারলাম না। ততক্ষণে নিভে গেছে আলোটা—বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি গোলাঘরের বাইরে।

বড় জোর তিন সেকেন্ড লাগল আমার ঝাঁপটা খুলে আবার ভিতরে ঢুকতে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। শূন্য গোলাঘর। অন্ধকার। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে জ্বাললাম। কেউ নেই বেঞ্চের উপর—খালি। মাটিতে পড়ে আছে অনেকগুলো গোল চাকতির মত হলুদ টিকেটের কাটা অংশ। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘরের সবাই, কেউ নেই। আমি জানি, উপত্যকা বেয়ে নেমে যাচ্ছে ওরা এখন স্বপ্ননীড়ের দিকে, বিচিত্র এক জগতে পদার্পণের বিস্ময়ে বিহ্বল ওদের অন্তর, চোখে আশার আলো। আনন্দে করছে ওদের বুকের ভিতরটা। হাসছে ওরা-সুখী!

আমি, আবদুল খালেক, এখনও কাজ করি এজিবি অফিসে...টাইপিস্ট। ভাল লাগে না আমার এই কাজ, তবু রোজ যেতে হয়, ফিরি বিকেলে, ক্লান্তপায়ে হেঁটে ফিরে আসি মেসে, নিরানন্দ সন্ধে ডিঙিয়ে ক্লান্তিকর রাত আসে, তারপর বিষণ্ন সকাল, খবরের কাগজ পড়ি, হতাশার খবর, আবার অফিসে যাই। মাসের প্রথম দিকে এক-আধটা বই কিনি, সারামাস সেটাই উল্টাই-পাল্টাই, সময় কাটতে চায় না, সত্যিই, কিছুই ভাল লাগে না আমার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই খাবার খেয়ে চলেছি, একই থালায়, একই পিঁড়িতে বসে, স্বাদ বদলের সঙ্গতি নেই, জানি, কোনদিন সঙ্গতি হবে না। মাঝে মাঝে টিনের বাক্সটা খুলি, ভাঁজ করা কাপড়ের তলা থেকে বের করি একটা হলুদ টিকেট, ওতে লেখা আছেঃ ভ্যালিড ওনলি ফর টুডে, নিচে তারিখ—সে তারিখ পার হয়ে গিয়েছে কবে!

গিয়েছিলাম। পরদিরই। ড্রিম ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। সেই সুদর্শন লম্বা লোকটা আমাকে দেখেই কাউন্টারের ওপাশে একটা ড্রয়ার টেনে বের করে দিল একশো বত্রিশ টাকা সাতাশী পয়সা। গম্ভীর। 'কাল এগুলো ফেলে গিয়েছিলেন কাউন্টারের ওপর,' আমার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, 'কেন, তা আপনিই জানেন।'

এমনি সময়ে কয়েকজন খরিদ্দার এসে ঢুকল, ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। তাদের নিয়ে, ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর রইল না আমার। এরপরেও গিয়েছি—একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবার। ফিরে এসেছি।

আমি আমার সুযোগ হারিয়েছি, কিন্তু আপনাদের সুবিধের জন্যে বলছিঃ দেখে মনে হবে ওটা আর দশটা ট্রাভেল এজেন্সির মতই সাধারণ একটা অফিস। যে কোন বড় শহরে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন—হয়ত অন্য নামে, অন্য পরিচয়ে। সাদামাঠা দু'চারটে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবেন, তারপর সেই ফোল্ডারটার ব্যাপারে সামান্য একটু আভাস দেবেন। কিন্তু খবরদার! যাই করুন না কেন, সরাসরি ওটার কথা বলবেন না। ওকে সময় দিতে হবে আপনাকে একটু ওজন করে বুঝে নেয়ার। যদি আপনাকে পছন্দ হয়, ও নিজেই কথা তুলবে। যদি তোলে, দয়া করে বিশ্বাস রাখবেন, দয়া করে মতিভ্রম ঘটতে দেবেন না নিজের। কারণ, একবার হেলায় হারালে জীবনে আর কোনদিন সুযোগ পাবেন না আপনি। আমি জানি। বিশ্বাস করুন!

সম্পর্ক

হুমায়ূন আহমেদ

মোবারক হোসেন ভাত খেতে বসে তরকারির বাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কী? তাঁর গলার স্বরে অদূরবর্তী ঝড়ের আভাস। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যাবে।

মনোয়ারা অদূরবর্তী ঝড়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে?

'এটা কিসের তরকারি?'

'কৈ মাছের ঝোল।

'কৈ মাছের ঝোলে তরকারি কী?'

'চোখে দেখতে পাচ্ছ না কী দিয়েছি! ফুলকপি, শিম।'

'তোমাকে কতবার বলেছি—ফুলকপির সঙ্গে শিম দেবে না। ফুলকপির এক স্বাদ, শিমের আলাদা স্বাদ। আমার তো দুটা জিভ না যে একটায় শিম খাব আর অন্যটায় ফুলকপি?'

মনোয়ারা হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'যে তরকারি খেতে ইচ্ছা করে সেটা নিয়ে খেলেই হয়। খেতে বসে খামাখা চিৎকার করছ কেন?'

'এই তরকারি তো আমি মরে গেলেও খাব না।'

'না খেলে না খেয়ো। ডাল আছে ডাল খাও।'

'শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাব?'

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'এটা তো হোটেল না যে চৌদ্দ পদের রান্না আছে।'

মোবারক হোসেনের প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে তরকারির বাটি ছুড়ে মেঝে ফেলে দিতে। এই কাজটা করতে পারলে রাগটা ভালো দেখানো হয়। এতটা বাড়াবাড়ি করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। মনোয়ারা সহজ পাত্রী না। তার চীনামাটির বাটি ভাঙবে আর সে চুপ করে থাকবে এটা হবার না। মোবারক হোসেন কৈ মাছের ঝোলের

বাটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধাক্কাটা হিসাব করে দিলেন, যেন তরকারি পড়ে যায় আবার বাটিটাও না ভাঙে।

মনোয়ারা বললেন, 'কী হল? খাবে না?'

মোবারক হোসেন কিছু না বলে ভাতের থালায় হাত ধুয়ে ফেললেন। থালায় ভাত বাড়া ছিল। কিছু ভাত নষ্ট হল। হাত ধোয়ার দরকার ছিল না। তার হাত পরিষ্কার—খাওয়া শুরুর আগেই গণ্ডগোল বেধে গেল।

মনোয়ারা বললেন, 'ভাত খাবে না?'

মোবারক হোসেন বললেন, 'না। তোমার ভাতে আমি 'ইয়ে' করে দেই।'

বাক্যটা খুব কঠিন হয়ে গেল। রাগের সময় হিসাব করে কথা বলা যায় না। তবে কঠিন বাক্যেও কিছু হল না। মনোয়ারা খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তরকারির বাটি, ডালের বাটি তুলে ফেলতে শুরু করলেন। যেন কিছুই হয়নি। মোবারক হোসেন স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। পরিবারের প্রধান মানুষটা রাগ করে বলছে—ভাত খাবে না, তাকে সাধাসাধি করার একটা ব্যাপার আছে না? মনোয়ারা কি বলতে পারত না—ভুল হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কখনো শিম আর ফুলকপি এসসঙ্গে রাঁধা হবে না। কিংবা বলতে পারত—দু মিনিট বোসো চট করে একটা ডিম ভেজে দেই। শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজ কচলে মরিচের ভর্তা বানিয়ে দেই। মরিচের ভর্তা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এই জিনিসটা বানাতে কতক্ষণ লাগে? তা-না, ভাত তরকারি তুলে ফেলছে! ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের এই হল ফসল।

মোবারক হোসেনের তীব্র ইচ্ছা হল বাড়িঘর ছেড়ে গৌতম বুদ্ধের মতো বের হয়ে পড়েন। এ রকম ইচ্ছা তাঁর প্রায়ই হয়। বাড়ি থেকে বেরও হন। রেলস্টেশনে গিয়ে ঘণ্টাখানেক বসে থাকেন। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তাঁর রেলস্টেশন পর্যন্ত। মোবারক হোসেন নান্দাইল রোড রেলস্টেশনের স্টেশনমাষ্টার। রাত ন'টায় একটা আপ ট্রেন ছেড়ে দিয়ে খেতে এসেছিলেন। খেতে এসে এই বিপত্তি-শিম আর ফুলকপির ঘোঁট বানিয়ে বসে আছে।

মোবারক হোসেন মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে শুরু করলেন। এটা হল তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার সংকেত। অতি সহজে তাঁর কানে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে সব সময় মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে হয়। আর এ বছর তুন্দ্রা অঞ্চলের শীত পড়ছে। আগুনের উপর বসে থাকলেও শীত মানে না।

মনোয়ারা বললেন, 'যাচ্ছ কোথায়?'

তিনি জবাব না দিয়ে গায়ে চাদর জড়ালেন।

'স্টেশনে যাচ্ছ?'

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। হাতমোজা পরত লাগলেন। হাতমোজা পরা ঠিক হচ্ছে না। মনোয়ারা মাত্র কিছুদিন আগে হাতমোজা বুনে দিয়েছেন। তার উচিত হাতমোজা নর্দমায় ফেলে দেয়া—কিন্তু বাইরে মাঘ মাসের দুর্দান্ত শীত। খোলা মাঠের উপর রেলস্টেশন। শীত সহ্য হবে না। গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে না

থেকে যদি নান্দাইল রোড থাকতেন এবং মাঘ মাসে গৃহত্যাগ করতেন তা হলে তিনিও হাতমোজা পরতেন। গলায় মাফলার বাঁধতেন।

'রাতে ফিরবে? না ফিরলে বলে যাও। দরজা লাগিয়ে দেব।'

'যা ইচ্ছা করো।'

'আমি কিন্তু শুয়ে পড়লাম। রাতদুপুরে ফিরে এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করবে না।'

'তোর বাপের দরজা? সরকারি বাড়ির সরকারি দরজা। আমার যখন ইচ্ছা ধাক্কাধাক্কি করব।'

'তুই তোকারি করবে না। আমি তোমার ইয়ার বন্ধু না।'

'চুপ। একদম চুপ। No talk.'

মোবারক হোসেন অগ্নিদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির অর্থ তুমি জাহান্নামে যাও। তিনি ঘরের কোনায় রাখা ছাতা হাতে বের হয়ে গেলেন। তিনি বের হওয়ামাত্র দরজা বন্ধ করার ঝপাং শব্দ হল। মোবারক হোসেন ফিরে এসে বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড লাথি বসালেন। এতে তাঁর রাগ সামান্য কমল। তিনি রেলস্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

রাত নিশুতি। ভয়াবহ ঠাণ্ডা পড়েছে। রক্ত-মাংস ভেদ করে শীত হাড়ের মজ্জায় চলে যাচ্ছে। কুয়াশায় চারদিকে ঢেকে গেছে। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। অথচ শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদ আছে। মোবারক হোসেনের পকেটে দুই ব্যাটারির টর্চও আছে। টর্চ জ্বালাতে হলে চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করতে হয়। তিনি তাঁর প্রয়োজন বোধ করছেন না। গত দশ বছর তিনি এই রাস্তায় যাতায়াত করছেন। চোখ বেঁধে দিলেও চলে আসতে পারবেন।

রেলস্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। পয়েন্টসম্যান হেদায়েত স্টেশনেই ঘুমায়। সে মনে হয় আছে। আজ তার বোনের বাড়িতে যাবার কথা। মনে হয় যায়নি। যে শীত নেমেছে যাবে কোথায়? মোবারক হোসেন স্টেশনের বাতি দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলেন। হেদায়েত থাকলে তাকে দিয়ে চিড়া-মুড়ি কিছু আনানো যাবে। ক্ষিধেয় তিনি অস্থির হয়েছেন। উপোস অবস্থায় রাত পার করা যাবে না। বিকেলেও কিছু খাননি। বিকেলে নাশতা হিসেবে মুড়ি এবং নারিকেলকোরা দিয়েছিল। এমন গাধা মেয়েছেলে! নারিকেলকোরা হল ভেজা ন্যাতন্যাতা একটা জিনিস। মুড়িকে সেই জিনিস মিইয়ে দেবে এটা তো দুধের শিশুও জানে। দুই মুঠ মুখে দিয়ে তিনি আর খাননি। এখন অবিশ্যি মনে হচ্ছে ন্যাতন্যাতা মুড়িই তিনি এক গামলা খেয়ে ফেলতে পারবেন। তবে শীতের রাতের আসল খাওয়া হল আগুন গরম গরুর গোশত তার সঙ্গে চালের আটার রুটি। এই গরুর গোশত ভূনা হলে চলবে না। প্রচুর ঝোল থাকতে হবে। মনোয়ারাকে বললে সে ইচ্ছা করে করে ঝোল শুকিয়ে ভূনা করে ফেলবে। চালের আটার রুটি না করে আটার রুটি করবে এবং পরে বলবে...

মোবারক হোসেনের চিন্তার সূত্র হঠাৎ জট পাকিয়ে গেল। কারণ তাঁর চোখে ধক করে সবুজ আলো এসে পড়ল। তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে

সামলালেন। আলোটা এসেছে স্টেশনঘর থেকে। কেউ মনে হয় টর্চ ফেলেছে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বা এ রকম কিছু। হঠাৎ চোখে পড়েছে বলে সবুজ রং মনে হয়েছে। টর্চের আলো সবুজ হবার কোনো কারণ নেই।

নান্দাইল রোড রেলস্টেশনটা এই অঞ্চলের মতোই দরিদ্র। একটি ঘর। সেই ঘরে জানালা নেই। টিকিট দেয়ার জন্যে যে ফাঁকটা আছে তাকে জানালা বলার কোনো কারণ নেই। মোবারক হোসেন যখন এই ঘরে বসে টিকিট দেন তখন তাঁর মনে হয় তিনি কবরের ভেতর বসে আছেন। মানকের নেকের তাঁর সওয়াল জওয়াব করছে। সওয়াল জবাবের ফাঁকে ফাঁকে তিনি টিকিট দিচ্ছেন। সব স্টেশনে একটা টিউবওয়েল থাকে। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে পানি খায়। ফ্লাস্ক ভরতি করে পানি নিয়ে ট্রেনে ওঠে। এই স্টেশনে কোনো টিউবওয়েল নেই। যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। বছর তিনেক আগে দুটা প্রকাণ্ড রেইনট্রি গাছ ছিল। গাছ দুটার জন্য স্টেশনটা সুন্দর লাগত। আগের স্টেশনমাস্টার গাছ কাটিয়ে এগার হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এতে পরে তার সমস্যা হয়েছিল—তাকে বদলি করে দেয়া হয়, তার জায়গায় আসেন মোবারক হোসেন। তাঁর চাকরি এখন শেষের দিকে। এই সময় কপালে কোনো ভালো স্টেশন জুটল না। জুটল ধ্যাদ্দাড়া মান্দাইল রোড। স্টেশনের লাগোয়া কোনো চায়ের স্টল পর্যন্ত নেই। হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছা হলে কেরামতকে পাঠাতে হয় ধোইয়াল বাজার। চা আনতে আনতে ঠাণ্ডা পানি। মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিতে হয়। রেলস্টেশনের সঙ্গে চায়ের দোকান থাকবে না এটা ভাবাই যায় না। এর আগে তিনি যে স্টেশনে ছিলেন সেখানে দুটা চায়ের দোকান ছিল। হিন্দু টি স্টল, মুসলিম টি স্টল। দুটা চায়ের দোকানের মালিকই অবিশ্যি মুসলমান।

মোবারক হোসেন স্টেশনঘরের মাথায় এসে দাঁড়ালেন। চারদিক ধু-ধু করছে। জনমানব নেই। স্টেশনঘরের সামনে থেকে তাঁর চোখে যে আলো ফেলেছিল তাকেও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না। মোবারক হোসেন ঠিক করলেন লোকটাকে দু-একটা কথা বললেন-'মানুষের চোখে টর্চ ফেলা অসম্ভব বেয়াদবি। মহারানী ভিক্টোরিয়াও যদি কারো চোখে টর্চ ফেলেন সেটাও বেয়াদবি।'

স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছিল বলে তিনি দূর থেকে দেখেছেন। এটা সত্যি না। স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছে না। হেদায়েত নিশ্চয়ই বোনের বাড়ি চলে গেছে। মোবারক হোসেন তালা খুলে স্টেশনঘরে ঢুকলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ঘরটা বাইরের মতো হিমশীতল না। উত্তুরে বাতাস তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল। বাতাসের হাত থেকে জীবন রক্ষা পেয়েছে। তিনি হারিকেন জ্বালালেন। তাঁর ভয় ছিল হারিকেনে তেল থাকবে না। দেখা গেল তেল আছে। সারা রাত জ্বলার মতোই আছে।

স্টেশনঘরে তাঁর বিছানা আছে। তোশক, লেপ, চাদর, বালিশ। খাওয়া এবং ঘুমানোর ব্যাপারে তাঁর কিছু শৌখিনতা আছে বলে লেপ-তোশক ভালো। বিছানার চাদরটাও ভালো। যদিও মোবারক হোসেনের ধারণা মাঝে মধ্যে, হেদায়েত নিজের বিছানা রেখে তার বিছানায় শুয়ে থাকে। কারণ তিনি হঠাৎ হঠাৎ বিছানা চাদরে উৎকট

বিড়ির গন্ধ পান। হেদায়েতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে চোখ কপালে তুলে বলেছে—'আমার কি বিছানার অভাব হইছে?' ব্যাটাকে একদিন হাতেনাতে ধরতে হবে।

মোবারক হোসেন বিছানা করতে শুরু করলেন। শীত যেভাবে পড়ছে অতি দ্রুত লেপের ভেতর ঢুকে যেতে হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুম আসবে না-কী আর করা! নিজের বোকামির উপর তাঁর এখনও প্রচণ্ড লাগছে। রাগ করে ভাত না খাওয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে। তারচেয়েও অন্যায় হয়েছে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসা। তিনি কেন বাড়ি ছাড়বেন? এককাপ গরম চা পাওয়া গেলে এই ভয়ঙ্কর রাতটা পার করে দেয়া যেত। মোবারক হোসেন ঠিক করে ফেললেন—একেবারে বেতন পেয়েই একটা কেরোসিনের চুলা কিনবেন। একটা সসপেন, চা-পাতা, চিনি। যখন ইচ্ছা হল নিজের চা বানিয়ে খেলেন। মুড়ির টিনে কিছু মুড়ি থাকল। মুড়ির সঙ্গে খেজুর গুড়। শীতের রাতে মুড়ি আর খেজুর গুড় হল বেহেশতি খানা। ডিম থাকলে সসপেনে পানি ফুটিয়ে একটা ডিম সেদ্ধ করে ফেলা। গরম ভাপ ওঠা ডিমসিদ্ধ লবণের ছিটা দিয়ে খাওয়া...উফ! মোবারক হোসেনের জিভে পানি এসে গেল।

মোবারক হোসেনের খাদ্যসংক্রান্ত চিন্তার সূত্রটি আবারো জট পাকিয়ে গেল। আবারো তার চোখে সবুজ আলো ঝলসে উঠল। এমন কড়া আলো যে আলো নিভলে চারদিকে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার ডুবে যায়। হারিকেনের আলো সেই অন্ধকার দূর করতে পারে না। চিকাদের কিচমিচ জাতীয় কিছু শব্দ শুনলেন। শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। ছায়ামূর্তির মতো কিছু একটা দরজায় দাঁড়িয়ে। সবুজ আলোর ঝলক চোখ থেকে না গেলে ছায়ামূর্তির ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। ভূতপ্রেত না তো? আয়াতুল কুরসিটা পড়া দরকার। সমস্যা হচ্ছে এই সুরাটা তাঁর মুখস্থ নাই। মনোয়ারার আছে। সে কারণে অকারণে আয়াতুল কুরসি পড়ে। কে জানে এখনো হয়তো পড়ছে। খালি বাড়ি মেয়েছেলে একা আছে। ভয় পাবারই কথা। শীতকালে আবার ভূত-প্রেতের আনাগোনা একটু বেশি থাকে।

মোবারক হোসেনের চোখে আলো সয়ে এসেছে। তিনি হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। চিকার কিচকিচ সেখানে থেকেই আসছে। দরজা ধরে একজন মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিচকিচ শব্দটা সেই করছে। যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর যাই হোক ভূতপ্রেত না। ভূতপ্রেত হলে টর্চলাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। ভূতের পায়ে বুটজুতা থাকবে না। মাথায় হ্যাটজাতীয় জিনিসও থাকবে না। চোখে রোদচশমাও থাকবে না। মোবারক হোসেন বিড়বিড় করে বললেন, আপনার পরিচয়?

বলেই মোবারক হোসেন মেয়েটিকে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর ভয় হতে লাগল মেয়েটি বলে বসবে আমি মানুষ না, অন্য কিছু। এখন তাঁর মনে হচ্ছে ভূতপ্রেতের হাতে টর্চলাইট থাকতেও পারে। এটা বিচিত্র কিছু না। একবার তিনি একটা গল্পে শুনেছেন, রাতে এক ভূত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে সাইকেলের চাকা রাস্তায় ছিল না। রাস্তা থেকে আধা ফুটের মতো উপরে ছিল।

ভূত যদি সাইকেল চালাতে পারে তা হলে টর্চলাইটও হাতে নিতে পারে। চোখে রোদচশমাও পরতে পারে। চিকার মতো কিচকিচও করতে পারে।

'আমার নাম এলা। আপনি কি আমার কথা এখন বুঝতে পারছেন?'

মোবারক হোসেন আবারো বিড়বিড় করে বললেন, জি।

'পরিস্কার বুঝতে পারছেন?'

'জি। বাংলা ভাষায় কথা বলছেন বুঝব না কেন?'

'না, আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি না। আমি আসলে কোনো ভাষাতেই কথ বলছি না। আমার চিন্তাগুলো সরাসরি আপনার মাথায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন সেই ভাষাও আমি বুঝতে পারছি না, তবে আপনার মস্তিষ্কের চিন্তা বুঝতে পারছি।'

মোবারক হোসেন ক্ষীণ স্বরে বললেন, জি আচ্ছা। ধন্যবাদ।

'আপনি এই ক্ষমতাকে দয়া করে কোনো টেলিপ্যাথিক বিদ্যা ভাববেন না। এই ক্ষমতা আমার নেই। আমি এই কাজটার জন্যে ছোট্ট একটি যন্ত্র ব্যবহার করছি। যন্ত্রটার নাম এল জি ৯০০০।'

মোবরক হোসেন আবারো যন্ত্রের মতো বললেন, জি আচ্ছা, ধন্যবাদ।

'আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

'জি না।'

'আয়াতুল কুরসি ব্যাপারটা কী? আপনি মনে মনে সারাক্ষণ আয়াতুল কুরসির কথা ভাবছেন। সে কে?'

'এটা একটা দোয়া। আল্লাহপাকের পাক কালাম। এই দোয়া পাঠ করলে মন থেকে ভয় দূর হয়। জিনভূতের আশ্রয় থেকে আল্লাহপাক মানব জাতিকে রক্ষা করেন।'

'তার মানে আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

মোবারক হোসেন শুকনো গলায় বললেন, জি না।

'ভয় না পেলে ভয় কাটানোর দোয়া পড়ছেন কেন?'

মোবারক হোসেন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি ভয় পাচ্ছেন এবং বেশ ভালো ভয় পাচ্ছেন। মেয়েটা কথা বলছে, কিন্তু তার ঠোঁট নাড়ছে না। ভয় পাবার জন্যে এইটাই যথেষ্ট। তার উপর এমন রূপবতী মেয়েও তিনি তাঁর জীবনে দেখেননি। পরীস্থানের কোনো পরী না তো? নির্জন রাতে পরীরা মাঝে মাঝে পুরুষদের ভুলিয়ে ভালিয়ে পরীস্থানে নিয়ে যায়। নানান কুর্কম করে পুরুষদের ছিবড়া ছেড়ে দেয়। এই জাতীয় গল্প তিনি অনেক শুনেছেন। তবে পরীরা যুবক এবং সুদর্শন অবিবাহিত ছেলেদেরই নিয়ে যায়। তার মতো আধুবুড়োকে নেয় না। তাকে ছিবড়া বানাবার কিছু নেই। তিনি ছিবড়া হয়ে আছেন।

'মোবারক হোসেন'

'জি।'

'আমি আপনাকে আমাদের দেশে নিতে পারব না। ইচ্ছা থাকলেও পারব না। আমার সেই ক্ষমতা নেই। আমি এসেছি ভবিষ্যৎ পৃথিবী থেকে, পরীস্থান থেকে নয়। আপনাকে ছিবড়া বানানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

'সিস্টার আপনার কথা শুনে খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক য়্যু।'

'আজকের তারিখ কত দয়া করে বলবেন?'

'মাঘ মাসের ১২ তারিখ'।

'ইংরেজিটা বলুন, কোন সন?'

'জানুয়ারী ৩, ১৯৯৭।'

'আমি আসছি ৩০০১ সন থেকে।'

'আসার জন্য ধন্যবাদ। সিস্টার ভিতরে এসে বসুন। দরজা বন্ধ করে দেই। বাইরে অত্যধিক ঠাণ্ডা।'

মেয়েটি ভেতরে এসে দাঁড়াল। মোবারক হোসেন দরজা বন্ধ করলেন। তারপর মনে হল কাজটা ঠিক হয়নি। দরজা খোলা রাখা দরকার ছিল, যাতে প্রয়োজনে খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। মনোয়ারার সঙ্গে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হওয়াটাই ভুল হয়েছে।

দরজা বন্ধ করার পর এলা টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। মোবারক হোসেন চেয়ার এগিয়ে দিলেন। এলা বসতে বসতে বলল, মনোয়ারা কে? আপনি সারাক্ষণ এই নামটি মনে করছেন।

'জি, আমার স্ত্রী।'

এলা বিস্মিত হয়ে বলল, স্ত্রী? আপনার স্ত্রী আছে! কী আশ্চর্য!

মোবারক হোসেন তাকিয়ে আছেন। তার স্ত্রী থাকা এমন কী বিস্ময়কর ঘটনা য়ে মেয়েটা চোখ কপালে তুলল! রাস্তায় ভিক্ষা করে যে ফকির, তারও একটা ফকিরনী থাকে। তিনি রেলে কাজ করেন। ছোট চাকরি হলেও সরকারি চাকরি। কোয়ার্টার আছে।

'স্ত্রীর উপর কি কোনো কারণে আপনি বিরক্ত হয়ে আছেন?'

'ইয়েস সিস্টার। তার উপর রাগ করেছি বলেই স্টেশনে এসে একা একা বসে আছি।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এল জি ৯০০০ এই পয়েন্ট নোট করছে। বিজ্ঞান কাউন্সিলে আমরা আপনার কথা বলব। র‍্যানডম স্যাম্পলের আপনি সদস্য হচ্ছেন। আশা করি আপনার বা আপনার স্ত্রীর এই বিষয়ে কোনো আপত্তি হবে না।'

কোনো কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন খুবই বিনীত গলায় বললেন, জি না ম্যাডাম।

'এতক্ষণ সিস্টার বলছিলেন এখন ম্যাডাম বলা শুরু করলেন।'

'সিস্টার ডেকে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সিস্টার ডাকের মধ্যে হাসপাতালের গন্ধ আছে। হাসপাতাল মানেই অসুখবিসুখ। সেই তুলনায় ম্যাডাম ডাকটা ভালো।'

'স্ত্রীর উপর যখন রাগ করেন তখন আপনি স্টেশনে থাকার জন্যে চলে আসেন। আর যখন স্টেশনে আসেন না তখন স্ত্রীর প্রতি থাকে আপনার ভালোবাসা?'

'জি না। রাগ করেও অনেক সময় বাসায় থাকি। গতকাল রাগ করেছিলাম, তারপরেও বাসায় ছিলাম।'

'কী কারণে রাগ করেছেন বলতে কি কোনো বাধা আছে?'

'জি না ম্যাডাম। বলতে বাধা নেই।'

'তা হলে বলুন।'

'আজ রাগ করেছি—কারণ, আজ সে ফুলকপি আর শিম একসঙ্গে দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রান্না করেছে।'

'এটা কি বড় ধরনের কোনো অন্যায়?'

'শিম এবং ফুলকপি একসঙ্গে রান্না করা যায়। অনেকে পছন্দ করে। আমি করি না। অনেককে দেখবেন সব তরকারির সঙ্গে ডাল নিচ্ছে। মাছ ভাজা নিয়েছে, তার সঙ্গেও ডাল। মাছ ভাজার এক রকম টেস্ট, ডালের আরেক রকম টেস্ট। দুটোকে কি মেশানো যায়? তা হলে দুধ দিয়ে আর মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে মাখিয়ে খেলেই তো হত! আমার পয়েন্টটা কি সিস্টার ধরতে পারলেন?'

'ধরার চেষ্টা করছি। আপনি আমাকে একেক সময় একেকটা ডাকছেন—কখনো সিস্টার, কখনো ম্যাডাম। আপনি সরসরি আমাকে এলা ডাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

'রাগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গতকাল কী নিয়ে রাগ করেছেন?'

'চা দিতে বলেছি। চুমুক দিয়ে দেখি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডাই যদি খাই তা হলে চা খাবার দরকার কী? শরবত খেলেই হয়! শুধু ঠাণ্ডা হলেও কথা ছিল। দেখি এলাচের গন্ধ। চা কি পায়েস নাকি যে এলাচ দিতে হবে? ম্যাডাম ঠিক বলেছি না?'

'আমি বলতে পারছি না। কারণ, চা নামক বস্তুটি সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।'

'শীতের সময় খুবই উপকারী। নেক্সট টাইম যদি আসেন ইনশাল্লাহ আপনাকে চা খাওয়াব। চা-চিনি-দুধ-সব থাকবে।'

'আর কখনো আসব মনে বলে হচ্ছে না। আপনার স্ত্রী সঙ্গে আর যেসব কারণে রাগারাগি হয় সেটা কি বলবেন? আপনাদের সব রাগারাগির উৎস কি খাদ্যদ্রব্য?'

'জি না ম্যাডাম। এর খাসিলত খারাপ। সবকিছুর মধ্যে উল্টা কথা বলবে। আমি যদি দক্ষিণ বলি—আমার বলাটা যদি তার অপছন্দও হয় দক্ষিণ না বলে তার বলা উচিত পূর্ব বা পশ্চিম-তা বলবে না। সে সোজা বলবে উত্তর।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন বিপরীত?'

'একশ দশ ভাগ বিপরীত।'

'এক শ দশ ভাগ বিপরীত মানে কী? একশ ভাগের বেশি তো কিছু হতে পারে না।'

'আপা কথায় কথা।'

'আপা বলছেন কেন?'

'আপনাকে বড় বোনের মতো লাগছে এই জন্যে আপা বলেছি। দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থী।'

'দোষ-ত্রুটি না, আপনার কথাবার্তা সামান্য এলোমেলো লাগছে। যাই হোক পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই—আপনার এবং আপনার স্ত্রী সম্পর্ক তা হলে ভালো না।'

'আপনিই বলুন ম্যাডাম ভালো হবার কোনো কারণ আছে?'

'আপনারা কি একে অন্যকে কোনো গিফট দেন?'

'একেবারেই যে দেই না তা না—ঈদে চান্দে দেই। না দেওয়াই উচিত। তারপরেও দেই এবং তার জন্যে যেসব কথা শুনতে হয়—উফ্!'

'একটা বলুন শুনি।'

'ঘরের কিচ্ছা বাইরে বলা ঠিক না। তারপরেও জানতে চাচ্ছেন যখন বলি—গত রোজার ঈদে আমি নিজে শখ করে একটা শাড়ি কিনে আনলাম। হালকা সবুজের উপর লাল ফুল। বড় ফুল না, ছোট ছোট ফুল। সে শাড়ি দেখে মুখ বাঁকা করে বলল, 'তোমাকে শাড়ি কে কিনতে বলেছে! লাল শাড়ি আমি পরি! আমি লম্বা মানুষ! বহরে ছোট জাকাতের শাড়ি একটা কিনে নিয়ে এসেছ!'

'জাকাতের শাড়ি ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'গরিব-দুঃখীকে দানের জন্যে দেওয়া শাড়ি। শাড়ি বলা ঠিক না। বড় সাইজের গামছা।'

'শেষ প্রশ্ন করি—আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার এখন তা হলে কোনো ভালোবাসা নেই?'

'ভালোবাসা থাকবে কেন বলুন। ভালোবাসা থাকলে এই শীতের রাতে আমি স্টেশনে পড়ে থাকি?'

এলা নামের মহিলা হাতের টর্চলাইট জ্বালিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চারদিকে সবুজ আলোয় ছয়লাপ করে আবার বাতিটা নেভাল। মোবারক হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি স্টেশনে থাকতে আসায় আমার জন্যে খুব লাভ হয়েছে।

'কী লাভ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আপনার মতামত পেয়েছি। মতামত রেকর্ড করা থাকবে।'

'ম্যাডাম কি এখন চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ চলে যাব।'

'তেমনি খাতির-যত্ন করতে পারলাম না, দয়া করে কিছু মনে নেবেন না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

'খ্যতির-যত্ন যথেষ্টই করেছেন এবং আমি আপনার ভদ্রতায় মুগ্ধ। আপনাকে একটা সুসংবাদ দিতে যাচ্ছি। আমি মনে করি এই সুসংবাদ শোনার অধিকার আপনার আছে।'

'জি ম্যাডাম সুসংবাদটা বলেন। দুঃসংবাদ শুনে শুনে কান ঝালাপালা। একটা সুসংবাদ শুনে দেখি কেমন লাগে।'

'আপনার ভালো লাগবে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী, যেখান থেকে আমি এসেছি সেই পৃথিবীতে পুরুষ সম্প্রদায় নেই। শুধুই নারী।'

মোবারক হোসেনের মুখ হা হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে পুরুষ নেই! শুধুই নারী! এর মধ্যে সুসংবাদটা কোথায় হোসেন ধরতে পারলেন না। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শুধুই পুরুষ নারী নেই এটা শুনলেও একটা কথা ছিল।

এলা বলল, 'পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার শতকরা আশি ভাগ ছিল নারী-পুরুষঘটিত সমস্যা। প্রেমঘটিত সমস্যা। একসঙ্গে জীবন যাপনের সমস্যা। ইতিহাসে এমনও আছে যে শুধু একটি নারীর জন্যে একটি নগরী ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে না?'

'জি আছে। ট্রয় নগরী।'

'গ্যালাকটিক ব্যুরো অব স্টাটিসটিকসের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে সংঘটিত অপরাধের শতকরা ৫৩ ভাগ নারীঘটিত।'

মোবারক হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—খাঁটি কথা বলেছেন। ধর্ষণ, এসিড, মারা, নাবালিকা হত্যা—পত্রিকা খুললেই এই জিনিস। আল্লাহপাক দয়া করেছেন, এখানে পত্রিকা আসে না।

এলা বলল, মানুষকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে বিজ্ঞান কাউন্সিলে একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—পৃথিবীতে পুরুষ এবং মহিলা বলে দু ধরনের মানব সম্প্রদায় থাকবে না। হয় থাকবে শুধু পুরুষ অথবা শুধু মহিলা। যুক্তিসঙ্গত কারণেই শুধু মহিলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ মহিলাদের ভেতরই দু রকমের ক্রমোজোম 'x' এবং 'y' আছে। বুঝতে পারছেন তো?

কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন বললেন, জি। আপনার কথাবার্তা পানির মতো পরিষ্কার। দুধের শিশুও বুঝবে।

'বংশবৃদ্ধির জন্যে একসময় পুরুষ এবং রমণীর প্রয়োজন ছিল। এখন সেই প্রয়োজন নেই। মানব সম্প্রদায়ের বংশ বৃদ্ধি এখন মাতৃগর্ভে হচ্ছে না। ল্যাবরেটরীতে হচ্ছে। শিশুপালনের যন্ত্রণা থেকেও মানব সম্প্রদায়কে মুক্তি দেয়া হয়েছে।'

'ও।'

এলা বলল, বর্তমান পৃথিবী সুন্দরভাবে চলছে। সমস্যাহীন জীবনযাত্রা। তারপরেও বিজ্ঞান কাউন্সিলে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন ওঠে—পুরুষশূন্য পৃথিবীর এই ধারণায় কোনো ত্রুটি আছে কি না। তখনই তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রাচীন পৃথিবীতে স্কাউট পাঠানো হয়। আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। আমাদের পাঠানো তথ্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে—পুরুষশূন্য পৃথিবী আদর্শ পৃথিবী।

মোবারক হোসেন ভয়ে ভয়ে বললেন, আমরা পুরুষরা কি খারাপ?

'আলাদাভাবে খারাপ, না তবে পুরুষ যখন মহিলার পাশে থাকে তখন খারাপ।'

সবুজ আলো আবারো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আলো নিভে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মোবারক হোসেন চোখে কিছু দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে চোখ সয়ে

আসার পর তিনি দেখলেন—ঘরে আর কেউ নেই। তিনি একা। মোবারক হোসেন সিগারেট ধরালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত হলেন এতক্ষণে যা দেখেছেন সবই চোখের ধান্দা। মন মেজাজ ছিল খারাপ, শীতও পড়েছে ভয়াবহ। সব মিলিয়ে চোখে ধান্দা দেখেছেন। একা একটা স্টেশনে থাকা ঠিক না। আবারো চোখে ধান্দা লাগতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে বের হয়ে এসে আবার ফিরে যাওয়াটাও অত্যন্ত অপমানকর। কিন্তু কী আর করা । মানুষ হয়ে জন্ম নিলে বারবার অপমানের তেতর দিয়ে যেতে হয়। বাসায় ফিরে গেলেও খাওয়া দাওয়া করা যাবে না। কিছুটা রাগ তাতে দেখানো হবে।

মোবারক হোসেন বাড়িতে ফিরলেন। মনোয়ারা বলামাত্র হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেন। মনোয়ারা এর মধ্যেই ফুলকপি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল করেছেন। এবং সেই ঝোল এত সুস্বাদু হয়েছে যা বলার না! রান্নাবান্নার কোনো ইতিহাসের বই থাকলে কৈ মাছের এই ঝোলের কথা স্বর্ণাক্ষরে সেই বইয়ে লেখা থাকার কথা। মোবারক হোসেনের খুব ইচ্ছা করছে এই কথাটা স্ত্রীকে বলা। শুনলে বেচারি খুশি হবে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। কারণ মনোয়ার চোখ লাল এবং ফোলা। সে এতক্ষণ কাঁদছিল। মোবারক হোসেন যতবারই রাগ করে বাইরে চলে যান ততবারই মনোয়ারা কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেন। এই তথ্যটা মোবারনক হোসেনের মনে থাকে না। মোবারক হোসেন নরম গলায় বললেন—বউ ভাত খেয়েছ?

মনোয়ারা ভেজা গলায় বললেন, না।

মোবারক হোসেন ভাত মাখিয়ে নলা করে স্ত্রীর মুখের দিকে এগিয়ে বললেন, দেখি হা করো তো।

মনোয়ারা বললেন, ঢং করবে না তো। তোমার ঢং অসহ্য লাগে।

অসহ্য লাগলেও এ ধরনের ঢং মোবারক হোসেন প্রায়ই করেন। এলা নামের মেয়েটাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলা হয়নি।

মোবারক হোসেন মনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন, খাও! ভাত হাতে কতক্ষণ বসে থাকব!

মনোয়ার বললেন, বুড়ো বয়সে ভাত! ছিঃ!

ছিঃ বললেও তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখভরতি লজ্জামাখা হাসি।

নূরুল ও তার নোট বই

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ঢাকায় এসে আমি একেবারে বেকুব হয়ে গেলাম। কোথাও মিলিটারির কোনো চিহ্ন নাই, দোকানপাট খোলা, গাড়ি চলছে, বাস চলছে, রাস্তাঘাটে মানুষজনের ভিড়। ছোট ছোট বাচ্চারা গল্প করতে করতে স্কুলে যাচ্ছে, দেখে কে বলতে দেশে একটা যুদ্ধ চলছে। অথচ ঢাকার বাইরে কী অবস্থা! ট্রেনে এসেছি আজ, ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা আসতে লেগেছে এগার ঘন্টা, গৌরিপুরে চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। শুধু কি তাই? মাঝখানে হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়ে দুইজন মিলিটারি চারজন মানুষকে টেনে বাঁশঝাড়ের পিছনে নিয়ে গেল। গুলির শব্দ হল কয়েকটা—তারপর মিলিটারিগুলি সিগারেট টানতে টানতে ফিরে এল। সত্যি কথা বলতে কী সবার সামনে গুলি করে বসে নি বলে আমার মিলিটারিগুলির প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতা বোধের জন্ম হয়ে গেল। ভয় যে হচ্ছিল না তা নয়। বেশি ভয় পেলে আমার আবার বাথরুম চেপে যায়, ট্রেনের বাথরুমের যা অবস্থা যাওয়ার উপায় নাই, চেপে বসে রইলাম। মনে হতে লাগল কেন খামাখা বের হতে গেলাম, বাড়িতে থাকাই তো ভালো ছিল।

কিন্তু বাড়িতে থাকি কেমন করে? প্রথম প্রথম এক দুইদিন একটু পিকনিক পিকনিক মনে হয়। তারপর মহা যন্ত্রণা। ভালো সিগারেট নাই। চা পাওয়া যায় না, যদি বা চা যোগাড় করা যায় খেতে হয় গুড় দিয়ে। টানা পায়খানায় পুকুর থেকে পিতলের বদনা ভরে নিয়ে যেতে হয়—মহা যন্ত্রণার ব্যাপার। আশপাশে যত মানুষ আছে সবাই দেখে অমুক পায়খানা করতে যাচ্ছে। গোদের উপর আবার বিষ ফোঁড়া, গ্রামের পাশে একদিন মিলিটারি ক্যাম্প করে ফেলল। তারপর যা একটা অবস্থা হল সেটা আর বলার মতো না। দাড়ি শেভ না করে একটু চাপ দাড়ির মতে করে ফেলাম। হাজী সাহেবের সাথে বাবার খাতির আছে বলে রক্ষা, না হলে তো আমার অবস্থা গোপালের মতো হত, মাথার পিছনে ফুটো নিয়ে নীল গাঙে ভেসে বেড়াতাম। শোল মাছ খাবলে শরীরের গোস্ত খেয়ে [illegible] করে ফেলত। হাজী সাহেবই

বাবাকে বললেন আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে, ইউনিভার্সিটি খুলে গেছে এখন গ্রামে পড়ে থাকা ঠিক না। হাজী সাহেব শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। তার কথা ফেলা যায় না। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। মুক্তি বাহিনীর একটা দল ক্যাম্পে এসে হামলা করে বসল। তারপর তো আমার আর গ্রামে থাকার আর কোনো উপায় নাই। মিলিটারি বাড়িঘর জ্বালিয়ে মানুষ মেরে একটা বিশ্রী অবস্থা করে ফেলল। অবস্থা দেখে মনে হল যখন সুযোগ ছিল তখন সাহস করে মুক্তিবাহিনীতে চলে গেলেই হত। কোথায় থাকব, কী খাব, কী করব—এইসব ভেবে তখন গেলাম না। আবার ভয়ও লাগে যুদ্ধ টুদ্ধ করে যদি মরেই গেলাম তাহলে দেশ স্বাধীন হলেই কী আর না হলেই কী?

বাবা তখন ঢাকা যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। পাশের গ্রামের ক্বারী সাহেব ঢাকা যাচ্ছেন তার সাথে চলে যাব। ক্বারী সাহেব সাতচল্লিশ সনে এদেশে এসেছেন। আগে বিহারী ছিলেন এখন দুই দুইটা বাঙালি বিয়ে করে পুরোপুরি বাঙালি হয়ে গেছেন তবে উর্দুটা মনে আছে। এখন হঠাৎ করে সেটা খুব কাছে আসছে। বাবাকে বললেন, কুই ডর নেহি, হাম লে যায়গা-আগে হলে বাংলায় বলতেন, আজকাল কথায় কথায় তার উর্দু বের হয়ে আসে।

ঢাকা আসতে অনেক যন্ত্রণা হল, রাস্তাঘাট বন্ধ, অনেক হেঁটে এসে ট্রেনে উঠতে হল। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই। মানুষ মরছে। যখন তখন ট্রেন থামিয়ে রেখে দেয়। সবাইকে দিয়ে গুলির বাক্স টেনে নামাল একবার। মনে হচ্ছিল আর বুঝি ঢাকা পৌছাব না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌছালাম।

পৌছে অবশ্য মনে হল ব্যাপারটা খারাপ হল না। আরামে থাকার জন্যে সারা দেশে এর থেকে ভালো আর কোনো জায়গা নেই। ইদরিস সাহেবের বাসায় এক রাত থেকে আমি হলে চলে গেলাম। জিন্নাহ হল—মাঝখানে সূর্যসেন হল হয়েছিল এখন আবার জিন্নাহ হল। ইদরিস সাহেব আরো কয়েকদিন থাকতে বলেছিলেন কিন্তু আমি থাকলাম না। আমাকে দেখে এমনি ভাবভঙ্গি করতে লাগলেন যে আমার মেজাজটা খুব গরম হয়ে গেল। তার কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগল আমার বয়সী একজন মানুষ মুক্তি বাহিনীতে যোগ না দিয়ে যেন মহা অন্যায় করে ফেলেছি। সবাই যদি মুক্তি বাহিনীতে যায় তাহলে দেশটা স্বাধীন করবে কাদের জন্যে?

প্রথম দিন ইউনিভারসিটি গিয়ে অনেকের সাথে দেখা হল। রাশেদ, আতাউর, জালাল, টিপু এমনকি দেখি কয়েকজন মেয়েও এসে হাজির। স্যারেরাও আছেন, ক্লাস নিবেন নিবেন করছেন এখনো শুরু করেন নি। আমরা ক্যান্টিনে চা খেয়ে আড্ডা মারলাম, কথা বলার সময় অবশ্যি খুব সাবধান। এদিক সেদিক দেখে কথা বলি। কখন কার সামনে কী বলব তারপর মহা ঝামেলায় ফেঁসে যাব।

নূরুলও হাজির হল একদিন। আমাদের মাঝে নুরুল হচ্ছে সোজা ধরনের। ঢাকাতেই থাকে কিন্তু কথাবার্তা চালচলন মফস্বলের ছেলেদের মতো। জিজ্ঞেস করলাম, কী রে মুক্তিবাহিনীতে গেলি না?

খুব সহজেই সে বলতে পারত তুই গেলি না? তা না বলে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, যেতে তো চাই। কিন্তু কেমন করে যাই বল দেখি? দেশের এই অবস্থায় আমরা যদি না যাই-

তাহলে বসে আছিস কেন?

কেমন করে যাব?

বর্ডার পার হয়ে চলে যাবি।

কেমন করে পার হব? কোন দিক দিয়ে?

আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি না তাই দাঁত বের করে হেসে বললাম যা পর্যটন অফিসে গিয়ে খোঁজ নে!

সারাদিন ইউনিভার্সিটিতে বসে থাকি, চা-সিগারেট খাই। সন্ধ্যেবেলা হলে ফিরে গিয়ে আবার আড্ডা মারি। বড় বড় জিনিস নিয়ে কথা বলি। পড়াশোনা নাই, অফুরন্ত অবসর। বই পড়ার অভ্যাস নাই, ফুটপাত থেকে হালকা ম্যাগাজিন নিয়ে এসে বসে বসে পড়ি। যখন অল্প কয়েকজন থাকি তখন বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলি, আর তো থাকা যায় না। মুক্তিবাহিনীতে যেতেই হয়। সবাই ঘন ঘন মাথা নাড়ি কিন্তু কেউ আসলে যাই না। একটু ভয় করে কোথায় যাব, কী খাব, কোথায় থাকব!

এর মাঝে নূরুল একদিন একটা ছোট নোট বই নিয়ে এল। আমাকে বলল, দেখ।

কী?

মিলিটারি নিয়ে জোক।

মিলিটারি নিয়ে?

হ্যাঁ। ঠিক করেছি মিলিটারি নিয়ে যত জোক বের হয়েছে সেগুলোর একটা কালেকশন বের করব। নাম দেব মিলিটারি কৌতুক; না হয় পাকিস্তানী কৌতুক। কী বলিস?

আমি কিছু না বলে মাথা নাড়লাম।

ভালো না আইডিয়াটা?

ভালো। কয়টা হয়েছে এই পর্যন্ত?

সাঁইত্রিশটা। এই দেখ।

আমি দেখলাম, গোটা গোটা হাতের লেখার সাঁইত্রিশটা জোক। প্রত্যেকের উপরে হেডিং। প্রথমটার নাম "মিলিট্যারি ও দর্জি।" পড়তে গিয়ে আমি হোঁচট খেলাম, কারণ সাধু ভাষায় লেখা। আমি জানতাম সাধু ভাষায় লেখালেখি উঠে গেছে কিন্তু নূরুলের লেখা পড়ে তা মনে হল না। সে লিখেছে :

"একদিন জনৈক দর্জি কাপড় কাটিতেছিল। একজন পাঞ্জাবি মিলিটারি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দর্জি, তুমি কি করিতেছ? দর্জি বলিল, আমি পাঞ্জাবি কাটিতেছি। পাঞ্জাবি মিলিটারি তখন তাহাকে বেদম উত্তম মধ্যম প্রদান করিল। কারণ নির্বোধ পাঞ্জাবি মিলিটারি বুঝিতে পারে নাই যে পাঞ্জাবি বলিতে দর্জি পরিধান করিবার পাঞ্জাবি তা কুর্তা বুঝাইয়াছিল।"

বেশিরভাগ জোকেরই এই অবস্থা। শুধু যে সাধু ভাষায় লেখা তাই নয় জোকটা বোঝানোর জন্যে বাড়তি অনেক ধরনের ব্যাখ্যা। কৌতুক আর কৌতুক নেই, বিশাল গদ্যে পরিণত হয়েছে। গোপাল ভাড়, বীরবল, নাসিরুদ্দিন হোজ্জা এবং শিখদের বোকামি নিয়ে যত গল্প আছে সবগুলাকে মিলিটারি চরিত্রে রূপ দিয়ে সে কৌতুকগুলি লিখে রেখেছে। আমি যতক্ষণ নোট বইটা পড়ছিলাম নূরুল খুব আগ্রহ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পড়া শেষ হাবার পর বলল, কেমন হয়েছে?

ভালো।

তাহলে হাসলি না যে?

জানা জোক তাই।

ও। নুরুল সাবধানে নোট বইটা শার্টের নিচে প্যান্টের মাঝে গুঁজে রেখে বলল, কী মনে হয় তোর? দেশ স্বাধীন হবে তখন এরকম একটা বই দারুণ হিট হবে না?

তা হবে।

তুই যদি আর কোনো জোক শুনিস বলিস আমাকে

বলব।

কিছুদিনের মাঝেই সবাই জেনে গেল নূরুল পাকিস্তানী মিলিটারি নিয়ে জোক সংগ্রহ করছে। আমাদের কারো কোনো কাজ নেই কাজেই সবাই এই কাজে বেশ মন দিলাম। বেশ আগ্রহ নিয়েই নূরুলের জন্যে কৌতুক খুঁজতে থাকি। এর মাঝে টিপু একটা ভালো জোক নিয়ে এল। জোকটা এরকম :

একজন মিলিটারি গিয়েছে মুরগি হাটে। মুরগিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, মুরগিকে তুমি কী খাওয়াও?

মুরগিওয়ালা বলল, চাউল খাওয়াই।

শুনে মিলিটারির কী রাগ। রাইফেলের বাঁট দিয়ে দুই ঘা দিয়ে বলল, শালা গাদ্দার হামকো ইস্ট পাকিস্তানি ভাইয়েরা চাউল খায়—তার খাবার তুমি মুরগিকে দাও?

কয়দিন পর আরেক দল মিলিটারি এসে মুরগিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী খাওয়াও মুরগিকে?

মুরগিওয়ালা এবার চাউলের কথা মুখে আনল না। বলল, গম খাওয়াই।

শুনে মিলিটারি আবার কী রাগ। রাইফেলের বাঁট দিয়ে কয়েক ঘা মেরে বলল, শালা বেনেচোত, হাম লোগ কা খাবার তুমি মুরগি কা দেতা হায়। আমার খার তুমি মুরগিকে খাওয়াও, তোমার এত বড় সাহস?

তার কয়দিন পর আবার কিছু মিলিটারি এল মুরগি হাটে। মুরগিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, মুরগিকে কী খাওয়াও তুমি?

মুরগিওয়ালা এবারে সাবধানে বলল, আমি তো জানি না স্যার। সকালবেলা সবার হাতে একটা করে সিকি ধরিয়ে দিই। তারা বাজারে গিয়ে যার যেটা ইচ্ছা কিনে খায়।

শুনে পাকিস্তানি মিলিটারি মুরগিওয়ালার পিঠে থাবা দিলে বলল, হুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা! তোম সাঁচ্চা পাকিস্তানি।

টিপু বলল খুব সুন্দর করে, শুনে আমরা সবাই হেসে গড়াগড়ি খেলাম, নূরুল ছাড়া। সে গম্ভীর হয়ে জোকটা তার নোট বইয়ে টুকে রাখতে শুরু করল। সাধু ভাষায় টানা হাতে দুই পৃষ্ঠা, ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে নানা রকম ব্যাখ্যা, নানারকম পাদটীকা কার সাধ্যি আছে এটা পড়ে। নূরুলের হাতে পড়ে এই সুন্দর জোকটার এই অবস্থা হবে কে জানত।

কৌতুকের যে অবস্থাই হোক নূরুলের খাতা কিন্তু ভর্তি হতে শুরু করল। অক্টোবর মাসে তার খাতায় একশ এগারটা জোক লেখা হয়েছে জানতে পারলাম। আমার সাথে দেখা হতেই জ্বলজ্বল চোখে বলল, পুরান ঢাকায় নাকি দারুণ কিছু জোক বের হয়েছে।

কী জোক?

আমি তো জানি না। বিশ্বাসী লোক-না হলে বলে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

ঢাকাইয়ারা খুব রসিক জানিস তো?

জানি।

তোর পরিচিত আছে কেউ ঢাকাইয়া?

আমি মাথা নাড়লাম, নাই। আর থাকলেই এখন আমার কাজ নাই তোকে নিয়ে পুরান ঢাকায় রওনা দেব? দেশে একটা যুদ্ধ চলছে জানিস?

তা তো বটেই। নূরুল মাথা নাড়ে।

গত রাত এগারটার সময় কী একটা এক্সপ্লোশান হল। তারপর কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার। গেরিলা অপারেশন শুরু হয়ে গেছে।

তা ঠিক।

তোর বয়সী মানুষেরা এখন হাতে স্টেশগান গ্রেনেড নিয়ে যুদ্ধ করছে আর তুই নোট বইয়ে জোক লিখে বেড়াচ্ছিস, লজ্জা করে না?

ধমক খেয়ে নূরুল একটু মনমরা হয়ে গেল। ব্যাটার মাথায় ঘিলু বলে কোনো পদার্থ নেই। মুক্তিযুদ্ধে যায়নি বলে তাকে আর যেই গালি গালাজ করুক, আমার করার কথা নয়। কিন্তু সেটাও সে ধরতে পারে না।

খুব আস্তে আস্তে ঢাকা শহর পাল্টাতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাটে মিলিটারি অনেক বেশি। হঠাৎ হঠাৎ ভয়ংকর দর্শন ট্রাক বড় রাস্তা দিয়ে যেতে থাকে, পিছনে পাথরের মতো মুখ করে মিলিটারিরা বসে আছে, চকচকে রাইফেল। কোন দূর দেশে নিজের ছেলে মেয়ে ফেলে রেখে এসে এখানে কী অবলীলায় অন্যের ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলছে। ইউনিভার্সিটি এলাকাতেও আর বেশি যাই না। ইসলামী ছাত্র সংঘের ছেলেরা নাকি বদর বাহিনী না কী একটা তৈরি করেছে। যখন খুশি তখন যাকে খুশি

তুলে নিয়ে যাচ্ছে। গুজব শোনা যাচ্ছে নাৎসীরা পোলান্ডে যেভাবে শিক্ষিত মানুষকে মেরে ফেলেছিল, এরাও নাকি সেভাবে সব প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারদের মেরে ফেলবে। কত রকম গুজব যে বের হয়, তার সবগুলিতে কান দিলে তো আর বেঁচে থাকা যাবে না। আমি অবশ্যি আজকাল আর বেশি বের হই না, দরকার কী খামাখা ঝামেলার মাঝে গিয়ে?

এর মাঝে আবার একদিন নূরুলের সাথে দেখা হল। আমাকে দেখে এক গাল হেসে বলল, একটা আইডিয়া হয়েছে।

কী আইডিয়া?

একটা বই পেয়েছি—ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছিল। ওয়ান থাউজেন্ট ডার্টি জোক!

ডার্টি জোক?

হ্যাঁ। নূরুল দুলে দুলে হাসে। সেখান থেকে বেছে বেছে কিছু মিলিটারির জোক হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছি! শুনবি?

অশ্লীল কৌতূকে আমার উৎসাহের কোনো অভাব নেই। বললাম, শোনা দেখি।

নূরুল উৎসাহ নিয়ে তার নোট বই খুলে পড়তে শুরু করে। "জনৈক পাকিস্তানি মিলিটারি ব্যারাক হতে ফিরিয়া খবর পাইল তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাহার স্ত্রী অর্থের বিনিময়ে তাহার এক বন্ধুকে দেহদান করিয়াছে। শুনিয়া সে অট্টহাস্য করিয়া বলিল, আমার বন্ধু বাস্তবিকই স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন! ঐ কাজের জন্যে আমি তো কখনোই আমার স্ত্রীকে অর্থ প্রদান করি না।"

নূরুলের সাধু ভাষার অত্যাচারের পরও জোকটা শুনে আমি হাসি থামাতে পারি না, তাই দেখে নূরুলের উৎসাহ বেড়ে যায়। বলে এটা শোন তাহলে, এটা শোন।

অশ্লীল কৌতুক শুনতে আমার বেশ লাগে। আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে বসে সবগুলি জোক শুনলাম। পড়া শেষ হলে বেশ বিজয়ীর মতো ভঙ্গি করে বলল, কেমন হয়েছে?

ভালো।

বইটা যখন বের হবে একটা হিট হবে না?

যদি বের হয়।

নূরুল যত্ন করে তার নোট বইটা শার্ট তুলে পেটের কাছাকাছি প্যান্টের মাঝে গুজে রাখল। এটা নিয়ে সবসময়েই তার অতিরিক্ত সাবধানতা। আমি বললাম, আজকাল আর এই নোট নিয়ে বের হোস না।

না, বের হব না।

যদি মিলিটারি জানে নোট বইয়ে কী লিখেছিস তোর আর বেঁচে থাকতে হবে না।

তা ঠিক।

মরতেই যদি চাস ভালো একটা কিছু করে মর। মিলিটারির উপর জোক লিখে মরে গেলে ব্যাপাটা হাসির একটা ব্যাপার হয়ে যাবে।

তা ঠিক। নূরুল জোরে জোরে মাথা নাড়ে।

নূরুল বের হচ্ছিল, আমি বললাম, কোন দিকে যাবি?

টি, এন্ড টি থেকে একটা ফোন করব বাসায়।

দাঁড়া, আমিও যাব।

রিক্সা করে টি, এন্ড টিতে এসে ভেতরে ঢোকার সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম গেটে কালো কাপড় পরা দুজন মিলিশিয়া দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আমাদের জান শুকিয়ে গেল—আগে জানলে কি আর এখানে পা দিই? ইচ্ছে হল ফিরে যাই কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ করে এখন ঘুরে গেলে আরো বেশি সন্দেহ করবে।

গলা নামিয়ে বললাম অবস্থা কেরাসিন।

নূরুল শুকনো গলায় বলল, কী করি এখন?

কী আবার করবি ভেতরে ঢোক।

নূরুল কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ততক্ষণে একজন মিলিশিয়া এসে নূরুলকে সার্চ করতে শুরু করেছে। পেটে হাত দিতেই নোট বইটা লেগেছে, ভেবেছে রিভলবার, বোমা বা সেরকম কিছু সাথে সাথে ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটল। মিলিশিয়াটি একটা চিৎকার করে হাতের অটোমেটিক রাইফেলটা নূরুলের গলায় ধরে এক ধাক্কায় তাকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরল। আমি দেখলাম রক্তশূন্য মুখে নূরুল খাবি খেয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে—দুইহাত উঠে গেছে উপরে। ভয়ংকর মুখে মিলিশিয়াটি তাকিয়ে আছে নূরুলের দিকে, মনে হয় গুলি করে দেবে এখনি। ভয়ে আমার কাপড় নষ্ট হবার মত অবস্থা।

মিলিশিয়াটি নূরুলের শার্ট তুলে সাবধানে পেয়ে গুঁজে রাখা জিনিসটি দেখল। রিভলবার বোমা সেরকম কিছু নয় সাধারণ একটি নোট বই, মিলিশিয়াটি সহজ হল একটু। নোট বইটা টেনে বের করে বলল, ইয়ে কেয়া হ্যায়? এটা কী?

নূরুল কথা বলতে পারছে না। প্রাণপণে চেষ্টা করে শুকনো গলায় বলল, নো-নো— নোটবুক।

মিলিশিয়াটি নোট বইটি উল্টেপাল্টে দেখে। আমি দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকি, যদি কোনোভাবে পড়তে পারে, তাহলে কি অবস্থা হবে আমাদের?

মিলিশিয়াটি আবার হড়বড় করে কী বলল, ভালো বুঝতে পারলাম না। মনে হয় জিজ্ঞেস করল, নোট বই পেটের মাঝে লুকিয়ে রেখেছ কেন?

নূরুল প্রাণপণে কিছু একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। আমার দিকে তাকাল নূরুল—আমি ঢোক গিলে বললাম, সাইজটা বড় পকেটে আটে না বলে ওখানে রাখা। বললাম উর্দুতে—অন্তত আমি যেটাকে উর্দু জানি সেই ভাষায়।

মিলিশিয়াটি তখনো লেখাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, একসময় মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কী লেখা আছে এখানে?

নূরুল ততক্ষণে খানিকটা জোর ফিরে পেয়েছে। তোতলাতে তোতলাতে বলল, ক্লাস নোট।

কীসের ক্লাস নোট?

ইসলামিক হিস্ট্রি। মোঘল ডাইনাস্টি।

মিলিশিয়াটি নূরুলের হাতে নোট বইটা ফেরত দিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। নূরুলের প্যান্টের দিকে তাকায় তারপর হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠে তার সঙ্গীকে ডাকে। প্যান্টের দিক আমিও দেখলাম, ভয়ে নূরুল কাপড়ে পেশাব করে দিয়েছে। প্যান্ট ভিজে চুইয়ে সেই পেশাব তার পায়ের কাছে এসে জমা হচ্ছে।

আমি আর নূরুল রিকশা করে ফিরে যাচ্ছিলাম। কেউ কোনো কথা বলছি না। নীলক্ষেত্রের মোড়ে রিকশাটা ঘুরে যাবার সময় পথে একটা ডাস্টবিন পড়ল, নূরুল নোট বইটি ছুড়ে ফেলে দিল ডাস্টবিনে।

আমি না দেখার ভান করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দাদুতাড়ুয়া

মহাশ্বেতা দেবী

'কাকড়াড়ুয়া' বলে একটা কথা তোমরা শুনেছ। ব্যাপারটা যে আসলে কী, গ্রামের ছেলেরা জান, শহরের ছেলেমেয়েরা জান কি?

কাক বা অন্য পাখি এসে পাকা ধান খাবে বা উঠোনের মাচা থেকে পাকা কুমড়োটা ঠোকরাবে। এরকম হয়েই থাকে। তাই গ্রামের লোকজন একটা মাটির হাঁড়ির পেছনে তুষো কালি মাখায়। তারও চোখ মুখ আঁকে। সেটা বাঁশে ঢুকিয়ে একটা ছেঁড়া জামা বাঁশে গলিয়ে হাঁড়ির মুখে বেঁধে ধান খেতে, ঘরের চালে বা উঠোনে বাঁশটা পুঁতে রাখে। পাখি দেখলে ভাববে, ও বাবা। এ আবার কে!

'দাদুতাড়ুয়া' বলে কোনো শব্দ তোমরা কেউ শোননি। এটা দাদুতাড়ুয়ার গল্প।

গরমের ছুটি হয়েছে। রাজাদের বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড পৌঁছল। রাজার বাবাকে লেখা। গোপালাদাদু লিখছেনঃ এ বছর কিছু আগেই যার মনে করছি। তেসরা পৌঁছে যাব মনে করছি। গরমটা খুব বেশি পড়েছে। পুরো গরমটা আরামে কাটিয়ে একেবারে আষাঢ়ে পুরীতে রথ দেখে ফেরার ইচ্ছে।

চিঠিটা দেখেই রাজার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। একে তো দার্জিলিং যেতে পারেনি বলে ওর মেজাজ বেশ খারাপ। মা আর বাবা ছোটো বোন পাখিকে নিয়ে গেছেন। কী ব্যাপার? না, জামাইবাবু বদলি হয়ে যাচ্ছেন। রাজাকে কেন নিয়ে যাননি? না, ছেলের যে স্কুলে খুললে পরীক্ষা। এমন যাচ্ছেতাই স্কুলে একমাত্র ছেলেকে ভরতি কর কেন বাপু, যেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা? বেশ। রেখে গেছে দিনদার জিম্মায়। রাজাকে দিয়ে গেছে পনেরো দিনে হাত খরচ সাকুল্যে দশটা টাকা। দিনুদাকে তো ভালোই ক্যাশ দিয়ে গেছে। সে সবসময়ে রাজাকে দুধ নিয়ে তাড়া করছে। তা ছাড়া সকালে মাস্টার, দুপুরে মাস্টার!

রাজা নিরুদ্দেশ হবে বলেই ভাবছিল। প্রাণের বন্ধু রানাও রাজি। বিশেষ করে ওদের গুরু ভীমেশ্বেরদা যখন নিরুদ্দেশ হবে বলে সবই ঠিক করেছে! ভীমেদা অবশ্য ওদের বোঝাচ্ছে অনেক।

আমার মনে ব্যথা লেগেছে, আমি যাচ্ছি, তোরা যাবি কোন দুঃখে?

এত ব্যথা লাগল যে নিরুদ্দেশ হবে?

ওরে! গাধার দল! থিয়েটার নামার আগে নিরুদ্দেশ না হলে এই হতভাগ্য ক্লাব আমার মর্যাদা বুঝবে না। শুধু নিরুদ্দেশ হব না, গ্যাং ফিট করে দিয়ে যাব। চারটে করে ছেলে প্রতি সিনে বেড়াল ডাকবে।

বের করে দেবে।

আরও চারটে ঢুকবে।

বের করে দেবে।

বাইরে দাঁড়িয়ে হল্লা করবে। তারা বাবা ওপাড়ার ছেলে। এই পাড়ার ন্যাকা ন্যাকা ভদ্দর-ভদ্দর ছেলে নয়।

থিয়েটারটা পণ্ড করবে?

করব না? কথা বললে তিনটে সুর বেরোয়, মানছি। তা আমার তো ছিল বৃদ্ধ অশরীরী মহিমবাবুর পার্ট। স্টেজে ঘুরব। এক ক্রিমিনাল দেখতে পাবে। আর কেউ দেখতে পাবে না। শেষে ভয়ের চোটে বাপধনকে 'খুন করেছি' বলতেই হবে।

হ্যাঁ, চমৎকার পার্ট ছিল।

আমার কীরকম একটা সুযোগ গেল বলতে পারিস? ওঃ ফিলমে ফিট হতে যেত।

সিনেমায়?

নয়তো কী? রাজুদা, সুভাষদা, তোরা অবশ্য নাম শুনিসনি। সবে পরিচালক হচ্ছে। ওদের ডেকেছিলাম...ওরা দেখলে...ছিঃ ছিঃ আমার ইজ্জত গেল! কেন? না, ওই যে পলাশের দাদু, কবে যাত্রা করত না কী করত যেহেতু সে হাজার টাকা চাঁদা দিচ্ছে, ওকেই ওই পার্ট দিতে হবে। অবিচার! অবিচার!

তুমি না থাকলে আমরা কি দুঃখ পাব না?

মানে এত দুঃখ পাবি, যে নিরুদ্দেশও হবি?

নিশ্চয়ই।

ওঃ। তোদের মতো ছেলে...

কোথায় যাবে?

সব ফিট করে রেখেছি। মেসোর ভেড়ি, আছে রাজাতলায়। সাতদিন থাকব। সেঁটে মাছ খাব। তারপর কাগজে 'বাবা ফিরে আয়' দেখে তবে ফিরব।

মেসোর ভেড়ির বড়ো বড়ো মাছ, আর মাসির হাতের খাসা রান্নার কথা রাজারা অনেক শুনেছে। ভীমদা বলেছে, চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে করে বাবার বিষ চোখে পড়েছি। আর দিচ্ছি না। এবার ভেড়িতেই লেগে যাব। নাঃ, বাবা দোকানে বসতে দেবে না, বলে তোর মাথায় চর্বি। আমাদের দুঃখ কি একটা রে?

তোমার মাসি জানিয়ে দেবে না?

না, না, যেসব আমি দেখব। তা, চল তোরাও যখন চাইছিস।

এর মধ্যে গোপাল দাদুর চিঠি!

মায়ের জ্যাঠাইমার মাসতুতো কাকা কেমন করে রাজার দাদু হবেন, তা রাজা বোঝেই না। 'দাদু' তো সম্পর্কে হয় না। ব্যবহারে হয়। মায়ের সম্পর্কে এমন দাদু রাজার আরও কয়েকজন আছেন। তাঁরা কী ভালো, কী ভালো, এসে থাকলেও ভালো লাগে।

তাঁদের এমন 'গুল্লো সাগর' নেই। গোপাল দাদু আসবেন শুধু হাতে। যদ্দিন থাকবেন নো টেলভিশন, যখন-তখন প্রত্যয় সমাস অব্যয় জিজ্ঞেস করবেন, খেলার সময় বেঁধে দেবেন, আর কী গুলপো, কী গুলপো!

যেমন, ইস! ট্রেনে উঠে মনে হল, বাগানের খাসা ল্যাংড়া আম এক ঝুড়ি আনব। বা—নাঃ পরের বার পুকরের মাছ তোদের খাওয়াবই। একেবারে টাটকা, তরতাজা, স্বাদই আলাদা।

আনো না যখন, গুলপো কেন বাপু? দিব্যি তো বাগানের ফল, পুকুরে মাছ বিক্রি কর। মস্ত বাড়িও বানিয়েছ। স—ব শুনেছে রাজা। গোপালদাদুর আরেক ভাইয়ের কাছে।

এতেও কী নিস্তার আছে। বলবেন, আমরা বুঝলে রাজা, আজ হয়তো ছড়িয়ে আছি, কিন্তু গ্রামের সূত্রে টান আমাদের শিকড়ে।

সুতরাং প্রতিটি রবিবার নষ্ট। আজ ওঁর সঙ্গে যাও বাদুড়বাগানের ভাইয়ের কাছে। অন্যদিন যাও—চন্দননগরে কাকার কাছে।

রাজা একদিন বলেছিল, মা! তোমাদের গ্রামের লোকরা সবাই এত দূরে দূরে থাকেন কেন?

যার যেখানে বাড়ি!

গোপালদাদু অমনি ফ্যাচর ফ্যাচর হেসে বললেন, বুঝলি খুকি! আমাকে নিয়ে যেতে হয় তো! বিরক্ত হয়। গ্রামের টান ও কী বুঝবে?

গ্রামের কথা বললেই রাজার মা মুচ্ছো যান। আহা, সেই পূজো-পাব্বান! আহা, সেই পায়েস পিঠে।

গোপালদাদু বলেন, আমি তো জানি, কলকাতায় থেকে থেকে ওর চরিত্রই গড়ে উঠছে না। আমি সেই জন্যেই ওকে নিয়ে...আমাদের মতো হতে হবে, বুঝলে রাজা? সেই মজঃফরপুরে...সেই আমি আর ক্ষুদিরাম...ওঃ। ওর যখন ফাঁশ হল, গানটা বেঁধেছিল কে, জান? দিস ওলড গোপাল দত্ত।

বাবা গোপালদাদুকে অত পছন্দ করেন বলে রাজার মনে হয় না। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলার উপায় নেই মায়ের কাছে।

কী আর জ্বালাতন করেন বাপু? তুমি যখন আপিসে যাও, উনি পার্কে হাঁটেন।

হ্যাঁ। অতগুলো লুচির পর না হাঁটলে...

যাও! তুমি যখন ফেরো, তখন উনি রাজাকে পড়াতে বসেন।

যাকগে। ছেলেমেয়েদের পড়া নষ্ট না হলেই আমি বাঁচি।

রাজার মা সহাস্য মুখে বলেন, ভাগ্যে দুটো ঘর আরও করেছিলে। রাজার ঠাকুরদা ঠাকুমা মারা যাবার পর আমার তো...আমি বাপু লোকজন ভালোবাসি।

ওঁর কি আর কেউ নেই?

ও মা! জান না? ওঁর সব অঙ্ক কষা থাকে। পাঁচ বছর এর কাছে যাব, পাঁচ বছর ওর কাছে...আমার তো ভাবলেই কান্না পায় যে,দু-বছর বাদে উনি আর আসবেন না, খবর যা পাব, একেবারে শেষ খরব!

না না, ভেবো না। তোমাদের আত্মীয়স্বজন কম তো না। সব জায়গায় পাঁচ বছর করে ঘোরা হয়ে গেলে আবার উনি আসবেন। উনি ক্ষুদিরামের সময়ের লোক, প্রায় একশো বছর বেঁচেছেন। আর একশো বছর নির্ঘাত—

রাজার মা খুবই সহজ সরল। রাজার মা সহাস্য বদনে বলেন, ওঁর যখন একশো বছর সত্যিই হবে, তখন একটা ফাংশান করবে?

ওরে বাব্বা! যাই, যাই আপিসের গাড়ি আসছে।

দিনুদাও মহাখাপ্পা। থাকবে কয়েক মাস, নিত্যি খেতে বসে বলবে ও মাছটা বাসি, ও রান্নাটা বাজে, আজ পাটপাতা ভাজা খাব, নিম ঝোল, এ কী বাপু?

তা নিরুদ্দেশ যাত্রার সব ঠিকঠাক। এর মধ্যে গোপালদাদুর চিঠি! রাজা ভীমের কাছে দৌড়োলে, কেস খুব খারাপ হয়ে গেছে ভীমদা! আবার সেই নিচ প্রত্যয় আসছে!

ভীম বলল—হুম।

এখন?

উপায় হবে। ভাবতে হবে। বিকেলে দিনুদাকে মাংসের কাবাব বানাতে বলিস। তোমাদের বাড়িতে বসেই প্ল্যানটা বলব।

রাজা দিনুদার গায়ে পড়ে গেল, বাবার বন্ধুরা এলে হরদম ভাজো। আমি একটা দিন বলছি—।

দীনুদা বলল,—ঠিক আছে।

ভয়ানক বিপদ যে!

কী বিপদ?

গোপাল দাদু আসছেন। রথ অবদি থাকবেন!

অ্যাঁ?

দিনুদা কী বুঝল সেই জানে, কিন্তু বিকেলে কাবাব, ঘুগনি, কফি সব ঠিকঠাক সাজিয়ে দিয়ে বলর, আমি গিয়ে একটা পুজো দিয়ে আসি। হে মা শেতলা! বুড়োর মন থেকে এ বাড়ির ঠিকানাটা ভুলিয়ে দাও।

ভীম বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও! ঠাকুর দেবতার ইচ্ছেতেও অনেক সময়ে কাজ হয়।

রাজাকে বলল, এখন প্ল্যান যা করেছি, মাস্টার প্ল্যান। দিনদাকেও দলে নিতে হবে।

কী প্ল্যান?

ভীম মুচকি হেসে বলল, বলব রে, বলব। ওঃ, মনে খুব বল পাচ্ছি, জানিস? রবীন্দ্রনাথই তো বলেছেন, সৎকাজ করে যেই, মনে তার ভয় নেই!

কোন কবিতায় বলেছেন?

সে বলা সম্ভব নয়। একটা লোক যদি কয়েক হাজার পদ্য লেখে, তাহলে...এই যে গোয়ালারা দুধে জল মেশায়, কী ভয় পায়? পায় না। কেন না ওরা জানে খাঁটি দুধ যত জনকে দিতে পারত, জল মিশিয়ে তার ডবল লোককে দিতে পারছে।

রানা বলল, আচ্ছা রাজা, মজঃফরপুরে সত্যিই কি ওঁর...?

রাজা বলল, সব সত্যি। অন্য দাদুরা বলেছেন, আর বাবার আপিসের কে যেন বলছিল, গোপাল দত্ত নাম করা কৃপণ আর বেজায় ধনী।

নেভার আম কিংবা লিচু?

নেভার।

নাঃ, এরকম লোককে টাইট দেয়া খুব সৎ কাজ। তাইতো রবীন্দ্রননাথ বলেছেন,

যখনই দেখিবে অতীব কিপটে দাদু, নির্ভয়ে তাঁরে টাইটটি দিবে চাঁদু।

ওঃ, এরকম কত ভালো পদ্য যে লিখে গেছেন...হায়রে কেউ খবরই রাখে না।

তুমি জানলে কী করে?

পরীক্ষায় পাস করার জন্যে 'সাফল্যের হাজার উপায়' কিনেছিলাম না? কী মেমারি! কোনো পদ্য ভুলিনি। যাক গে! তাহলে সব কথা পাক?

নিশ্চয়ই।

পরদিনই গোপালদাদু তাঁর পেল্লায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা, থলি, দাঁতন, জলের সোরাই, সব নিয়ে এসে পড়লেন। বললেন, খুকিরা নেই?

দার্জিলিং গেছে।

গেছে নয়, গেছেন। নাঃ, বছর খানেক টানা না থাকলে তোমার চরিত্র...আপনার বেলের পানা।

এই যে দুনু! দাঁড়াও, বিছানাটা পেতে ফেলি। সদাই করিবে নিজের কাজ! জীবনে কখনো পাবে না। লাজ! কার লেখা পদ্য তা জানো?

না, বাবু।

আমার! রবীন্দ্রনাথ পিঠ চাপড়ে, বলতেন রাইট, গোপাল, রাইট! আমার তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন। বাঙালির ছেলে গাছপালা চাষবাস গোরু গোয়াল করে গায়ে দাঁড়াব, পথ দেখাব।

ঘর তো ওঁর চেনা। বিছানা পাতলেন, দাঁতন করে স্নান করলেন। চোদ্দোটা লুচি খেলেন। পার্ক চলে গেলেন।

এসে দেখেন রাজা ওঁর জুতো পালিশ করছে, দিনু ওঁর পছন্দমতো সব রান্না করছে। দেখে খুব খুশি হলেন না, একথাটা খুকিকে লিখতে হচ্ছে! তোমার ছেলের মধ্যে অনেক সদগুণ দিস টাইম দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ, প্রতি বছর নিয়মিত আবার সাহচর্য লাভ!

খেতে বসে অবশ্য বললেন, আমি ডায়েট বদলেছি কাল থেকে আমাকে দু-বেলাই হালকা করে মুরগির ঝোল দেবে। আর বিকেলে ল্যাংড়া আম...তা আমার বাগানের মতো আর কোথায় পাব?

দিনুদা বলল, আমের সময়টা চলে এলেন?

হুঁ হুঁ বাবা, বাড়িতে কাউকে খেতে হচ্ছে না। পাঁচশো গাছ। সব ফল বিক্রি করে এসেছি। আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল, মাছ, স—ব বিক্রি।

সন্ধ্যেবেলা ল্যাংড়া আম খেয়ে, পার্কে ঘুরে এসে গোপালদাদু চিঠি লিখতে বসলেন। তাড়া তাড়া পোস্টকার্ড ওঁর সঙ্গেই থাকে।

রাজা বলল, আমি অঙ্ক কষছি দাদু।

খুব ভালো।

কিছুক্ষণ বাদেই ওঁর গলা শোনা গেল, কে, কে ওখানে? কে তুমি? রাজা আর দিনু দৌড়ে গেল।

ও কে?

কোথায় কে?

ওই যে! লম্বাপানা বুড়োটা, জানালা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে?

কোথায় কে দাদু?

সে কী! তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

না তো!

ওই যে হাসছে! একী! শব্দ হচ্ছে না কেন?

দিনু বলল, ওই গুরুপাক আহার। তাতে ল্যাংড়া আম...

আরে! চলে যাচ্ছ যে? দেখি...

রাজা আর দিনু ওঁকে চেপে বসাল। রাজা বলল, কোথায় কে? আপনি ভুল দেখেছেন।

ভুল দেখলাম?

তা ছাড়া কী হবে?

তাহলে...চলো, নিচের ঘরেই বসি। ঠিক সন্ধ্যেবেলা ভুল দেখলাম?

গোপালদাদু নিচে গিয়ে বসলেন। রীতিমতো বিচলিত। কী যেন ভাবছেন আর ভাবছেন। রাতে তেমন মন দিয়েও খেলেন না। বললেন, ভাবছি, রাতে আলো জ্বেলে শোব।

তাই শোবেন।

পরদিন উনি বাদুড়বাগানে গেলেন। বললেন, রাজা! যাবে নাকি?

দিনুদা বলল, এবারে আর ওকে পাচ্ছেন না বাবু। সকালে একজনন মাস্টার, দুপুরে একজন, সন্ধ্যেবেলা বন্ধু আসবে, আঁক করবে, এবার ওর বড়ো কড়াকড়ি।

রাতে দিনুদা বলল, বাবু! দরজা বন্ধ করে শোবেন কিন্তু। বড্ড চুরিচামারি হচ্ছে।

তুমি সব দরজা জানালা ভালো করে—

হ্যাঁ,হ্যাঁ, একেবারে।

রাত এগারোটা নাগাদ ভীম ঢুকল পেছনের দরজা দিয়ে।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গোপালদাদুর সে কী চিৎকার—কে? কে তুমি?

দিনু দৌড়ে, এল, রাজাও!

কী হল?

ও কে? আমার মশারির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে আঙুল তুলে ডাকছে?

কোথায় কে?

ওই তো। ওঃ, কী ভয়ংকর চাহনি। আমি...আমি একা দেখছি কেন? ওঃ, ওঃ, ওই যে চলে যাচ্ছে।

কোথা দিয়ে?

ইডিয়ট!...দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দিনু ঘন ঘন মথা নাড়ল,—বাবু! বিশ্বাস না করেন তো দেখে যান। নিচে প্রতিটি ঘরে তালা, কোলাপসিবল গেট প্রতি দরজায়। গ্রিলের জানালা তাও বন্ধ।

গোপাল দাদু কেঁদে ফেললেন, বিশ্বাস করো তোমরা। আমি না দেখলে...দিনু চটে গেল, নতুন বাড়ি। বিশ বছরও হয়নি। বাবু, মা বাস করলেন। মারা গেলেন। রাজার দিদির বিয়ে হল। কত সময়ে আমরা একলা থাকি, কেউ কিছু দেখল না। আপনি এবারে...নিশ্চয় কিছু পাপ করেছেন...নইলে ভূতপ্রেত পাছু ধরবে কেন?

ভূ...ত!

নইলে কী? আপনার সঙ্গেই এসেছে মনে হচ্ছে। চলো রাজা, আজ তোমার ঘরে শুই। ছোটো ছেলেটা! আহা, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে।

না, না, দিনু তুমি আমার ঘরে শোও।

রাজা বলল, না না। আমি একা শোব না।

দিনু বলল, তাহলে নিচতলাটা একবার দেখে আসি। মাঝের দরজা খোলা রেখে তুমি আমি পাশের ঘরে শুই।

হ্যাঁ দিনুদা!

গোপলদাদু আলো জ্বেলেও ঘুমাতে পারলেন না। ঘুমোলেন সকালের দিকে, উঠলেন বেলায়।

দিনুদা গম্ভীর মুখে বলল, হাত বাড়ান।

কেন?

আপনার জন্যে সাত সকালে মন্দিরে গেলাম। জাগ্রত ঠাকুর! পুরুতমশাই বলল, বাড়িতে মেলেচ্ছ খাবার ঢোকাবে। সেদ্ধ ভাত খাবে, আর তোমার তিনজনেই হাত এই লাল সুতো বেঁধে রাখবে।

যাক। তবু রক্ষে। তবে রান্নাবান্না...।

ওসব মুরগি, পেঁয়াজ চলবে না।

রাজা খেতে পারবে?

পারতেই হবে। আজ আবার শনিবার। শনিবারটা—

তা দিনু! আজ না হয় আমিও সিনেমা দেখব তোমাদের সঙ্গে টেলিভিশনে।

গোপাল দাদুর মুখে টেলিভিশনের কথা!

পার্কে গিয়ে গোপালদাদু খুব বেইজ্জত হলেন। দিনু সকলকে বলেছে, আমি বা রাজা কিছু দেখছি না, উনি শুধু পিশাচু দেখছেন। এ কীরকম একটা বদনাম নয় বাড়ির ওপর? এতকাল ধরে বাড়ি হয়েছে, ভিতপুজো থেকে কোনটা হয়নি।

গোপালদাদুকে তো সবাই চেনে। পলাশের দাদু বললেন, এ মশাই পাড়ার বদনাম। নতুন কলোনি, বিশ বছর হয়েছে, আমাদের পাড়ায় ভূত?

স্বচক্ষে দেখলাম।

অথচ ওরা দেখছে না?

না মশাই।

আমার মনে হয়...আচ্ছা, কোনো দৈবাদেশ লঙ্ঘন করেছেন কি?

দৈবাদেশ!

সন্ধোবেলা হঠাৎ মনে পড়ল, কী যেন এক মাতার আদেশ লেখা পোস্টকার্ড এসেছিল বটে। তাতে পরিষ্কার লেখাছিল—একশো আটটা পোস্টকার্ড...কাকে লিখতে হবে?...যারা লেখেনি তাদের যেন কী হয়েছে...এঃ কিছুই মনে আসতে পারছি না কেন? ইহ, সে চিঠিটা তো মজঃফরপুরে পড়ে আছে। একবার ফিরতে পারলে...

ওঃ অন্ধকার মানে আতঙ্ক, অন্ধকার, মানে...

আজ অবশ্য টেলিভিশন দেখবেন। ওঃ, কপাল বটে! সিনেমার নাম 'কঙ্কালের প্রতিহিংসা'। এ কী ষড়যন্ত্র রে বাবা! উঠে যাবেন? যাবেনই বা কোথায়? রাজা, রানা, দিনু, সবকটা একেবারে সেঁটে বসে দেখছে। হাতে লাল সুতোটা আছে তো?

ছবি দেখছেন, দেখছেন, এমন সময়ে তাঁর ঘাড়ে কে নিশ্বাস ফেলল।

চমেক ঘাড় ঘোরাতেই গোপালদাদু, 'ওঁ বেঁ বাঁবাঁ আঁমাকেঁ ডাঁকছেঁ যেঁ,' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

কে ডাকছে? ধেত জমাটি জায়গাটা...

ওঁই তো...আঁঙুল তুঁলে...

দিনু বলল,—কোথায়?

রানা তো হেসেই ফেলল।

গোপালদাদু কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'লাঁল সুঁতোটাঁ সুঁতোটাঁ' বলতে বলতে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান হতে হতেও অনুভব করলেন ঠাণ্ডা শক্ত আঙুল তাঁর হাতের সুতো ছিঁড়ছে।

মনে হল, কে যেন কানের কাছে বলছে, আয়। আয়।

ব্যস পুরো আজ্ঞান, অবশ গোপালদাদু।

ফ্রিজের বরফে রীতিমতো ঠাণ্ডা করা আঙুল ভীমের। সে বলল, অ্যাকশান! আমি মেকাপ ছেড়ে আসি। তোরা ডাক্তার ডাক। দেখ, টেঁসে গেল নাকি?

দিনু বলল, না, না। বাথরুমে নিয়ে জল ঢালছি। এমন আহার দু-বেলা টাঁসবে না। জ্ঞান ফিরতে আধঘন্টা লেগেছিল। ডাক্তারও এসেছিলেন। প্রেত দর্শন? মাথার দোষ নেই তো?

দিনুদা বলল, আমার তো তাই মনে হচ্ছে গো। ফি বছর আসেন, আহার নিদ্রা কুম্ভকর্ণের মতন। কোনোবার তো...এবারে একা উনিই দেখছেন আর দেখছেন আমরা কেউ কিছুটি দেখিনি।

গোপালদাদু চোখ মেলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,—আজকের রাতটা কাটলে কালই বিদায় হচ্ছি দিনু! প্রেতপিশাচের অভিশাপ—

দিনুদা বলল, এ তবে তোমার সঙ্গে এসেছে। কই, এ বাড়িতে কোনোদিন...

ডাক্তারও বললেন, নেভার।

ভীমও ততক্ষণেও এ ঘরে। সে বলল, না, এটা পাড়ার বদনাম হচ্ছে।

আমি বাড়ি যাব।

নিশ্চয়ই যাবেন। আমি আপনাকে টিকিট কেটে তুলে দিয়ে আসব। পরদিনই গোপালদাদু রওনা হলেন। ভীম ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল। তারপর রাজাদের বাড়িতে জমপেশ ভোজ হল একখানা। দিনুদা বলল, কত লোক খেতাব পায়। তা আমি তেতামার খেতাব দিলাম দাদুতড়ুয়া!

ভীম বলল, বাপরে কঞ্জুস! ট্রেনে শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, একটা দিয়ে বলে, জোয়ান ছেলে! বাসেই চলে যাও বাবা।

এই হল দাদুতাড়ুয়ার গল্প। অবিশি, এর উপসংহারটুকু বাকি রয়ে গেল। পলাশের দাদু হঠাৎ পা মচকে পড়ে থাকলেন। ফলে ভীম আবার পেয়ে গেল অশরীরী মহিমের পাটটা।

আর দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে রাজার মা বললেন, গোপালদাদু এ কী লিখেছেন, কিছুই বুঝছি না। মা খুকি! তোমার বাড়িতে ভৌতিক উপদ্রবে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাড়িতেও বলিতেছে, আমারও সংকল্প, এভাবে এ বয়সে আর মজঃফরপুর ছাড়িয়া ঘুরিব না। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছি, তাগা তাবিজ লইয়াছি, কিন্তু বিদেশে আর যাইব না। যাহ হউক, তুমি অবিলম্বে তান্ত্রিক ডাকাইয়া গৃহশোধন করাইবে। অন্যথা করিয়ো না।

দিনুদা বলল, ওনার মাথায় দোষ হয়েছে বউমা! নইলে ঘরে আমি রাজা, রানা, সবাই, একা উনি দেখছে, আমরা কেউ দেখলাম না?

রাজার মা ভিতু মানুষ! তিনি বললেন, যাহোক, একটা কিছু করতে হবে।

দিনুদা বলল, মোটেই না। পাড়ার সবাই ছ্যা-ছ্যা করবে। এ বাড়ি কেন, এ পাড়ায় কোনো ভূতপ্রেত নেই।

থিয়েটারটা সবাই দেখেছিল। দেখে রাজার বাবা কী বুঝলেন কে জানে, থিয়েটার দেখে ভীমের নামে একটি মেডেল ঘোষণা করলেন।

দিনুদা বলল, দাদাবাবু ঠিক বুঝেছে।

রাজা বলল, মা! মেডেলটা দেবার দিন ভীমদাকে খাওয়াতে হবে, খাওযাবে তো?

খাওয়াব, খাওযাব। কিন্তু গোপালদাদুর জন্যে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল রে। রাজাও করুণ মুখ করল, আমারও।

ঝুনুমাসির বেড়াল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঝুনমাসি একদম বেড়াল পছন্দ করতেন না। বেড়ালরা নাকি বড্ড নোংরা হয়। তারা যখন-তখন ছাদে যায়, ছাইগাদার ওপর ঘোরে, আবার সুযোগ পেলেই টুক করে বিছানার ওপর লাফিরে ওঠে। বেড়ালরা এমনই আদুরে যে, বিছানায় না শুলে তাদের ঘুমই আসে না। একদিন তো ঝুনুমাসি তাঁর বিছানার উপর কোথাকার একটা উঁটকো বেড়ালকে দেখে একেবারে কেঁদেই ফেলেছিলেন।

সেই বিড়াল একদিন ঝুনুমাসিক জব্দ করে দিল।

বাড়ির কাজের লোকদের ঝুনুমাসি হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন বেড়াল না আসে। বেড়াল দেখলেই তাড়াতে হবে। একটা গোঁফওয়ালা হাঁড়িমুখো বেড়াল প্রায়ই জালানা দিয়ে উঁকি মারে। আমরা হইহই করে সেটাকে তাড়া করে যাই।

এত পাহাড়া-টাহারা দিয়েও শেষ পর্যন্ত কিছু করা গেল না। এর মধ্যেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল কী করে যেন একটা বাচ্চা বেড়াল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রায় একটা উলের বলেন মতন ঝুনুমাসিরই খাটের কাছে লাফালাফি করছে।

ঝুনুমাসি একেবারে আঁতকে উঠলেন। চ্যাঁচামেচি করে ডাকলেন। সবাইকে। বললেন, এক্ষুণি তাড়াও, এক্ষুণি বিদেয় করো হতভাগাকে।

আমরা হ্যাট, হুশ হুশ করলাম। বেড়ালটা যাবার নামই করে না। আমাকে হাততালি দিতে দেখে সে ভাবল বুঝি সেটা একটা খেলা। অমনি হাততালির সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি দিতে লাগল। তাই দেখে ঝুনুমাসির ছেলে পল্টু হেসে ফেলতেই ঝুনুমাসি তার দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর বললেন, হাসছিস কী! তোর হাসি দেখলে লাই পেয়ে যাবে না?

বেড়ালকে তো ভয় দেখালেই পালায়। কিন্তু এই বেড়ালছানটা যে একটুও ভয় পাচ্ছে না! আমরা যতই তাড়া করি, ততই সে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে খেলা দেখায়।

ও বোধ হয় এখনও ভয় পেতেই শেখেনি। সুখনের হাতে মস্ত বড়ো একটা ডান্ডা, কিন্তু ওইটুকু বেড়ালকে তো আর মারা যায় না। সুখন লাঠিটা নিয়ে ওর পাশে ঠুকতে লাগল। তাতেও ভয় পায় না। ফুড়ুত ফুড়ুত করে তালে তালে লাফায়।

ছোটোমাসি বললেন, উসকো কান পাকড়কে বাহিরে ফেলে দাও।

বেড়ালকে হাতে করে তুলে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কে তুলবে। সবাই তাই ভাবছে। এমন সময় বেড়ালটা ধপাশ করে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজে একেবারে স্থির হয়ে গেল।

ঝুনুমাসি ভয় পেয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে বললেন, ওমা, বেড়ালটা মরে গেল নাকি? বাড়িতে বেড়াল মরলে ভীষণ পাপ হয়। এই সুখন, তুই ওইটুকু প্রাণীটাকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেললি?

সুখন জিভ কেটে বললো, না মাইজি, মা কালীর দিব্যি, আমি একবারও একে মারিনি। শুধু ভয় দেখিয়েছি।

তাহলে মরে গেলে কী করে? অত বেশি ভয় দেখালি কেন, নিশ্চয়ই হার্টফেল করেছে।

পল্টুটা বলল, মরেনি মা, চোখ পিটপিট করছে।

ঝুনুমাসি ধমক দিয়ে বললেন, মরেনি, কিন্তু মরতে কতক্ষণ। কী অলুক্ষুণে কাণ্ড! বাড়িতে বেড়াল মরে যাবে? কত পাপ হবে!

আমি বললাম, মরবে কেন? এতক্ষণ খেলা করে হাঁপিয়ে গেছে, তাই জিরিয়ে নিচ্ছে।

ছোটোমাসি তক্ষুণি হুকুম দিলেন, জটার মা, শিগগির এক বাটি দুধ নিয়ে এসো। দুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে নিক, তারপর ওকে ভালোয় ভালোয় বাড়ির বাইরে রেখে আসবে।

জটার মা একটা বাটিতে খানিকটা দুধ নিয়ে এল। ঝুনুমাসি সেটা দেখেই আবার বকুনি দিয়ে উঠলেন, এটুকু দুধে বেড়ালের পেট ভরে? বেড়াল কি তোমার আমার মতন ভাত খায়? তোমাকে কিপটেমি করতে কে বলেছে?

আবার বাটি দুধ আনা হল। দুধের গন্ধ পেয়েই বেড়ালছানাটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তারপর দুধ খেতে লাগল চুকচুক শব্দ করে। আমরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

সবটা দুধ শেষ করে সে খুব আরাম করে জিভ চাটল খানিকক্ষণ। পল্টু বলল, মা এবার আমি ওকে রাস্তায় ফেলে আসব?

ঝুনুমাসি বললেন, রাস্তায় নয়, ফুটপাথে। দেখিস খুব সাবধানে, যেন গাড়ি-টাড়ি চাপা না পড়ে।

কিন্তু তার আগেই বেড়ালটা একটা কাণ্ড করল। সে এক দৌড়ে গিয়ে ঝুনুমাসির পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। এবং এই প্রথম সে খুব মিষ্টি করে আস্তে ডাকলো, মিউ-উ!

তখনই আমরা বুঝে গেলাম। ওটা মোটেই বেড়ালছানা নয়। ছদ্মবেশী কোনো মহামানব। এ নিশ্চয়ই মানুষের ভাষা জানে। না হলে কী করে বুঝল যে, ঝুনুমাসিই ওকে তাড়াতে চাইছেন।

ততক্ষণে ঝুনুমাসি একেবারে গলে জল হয়ে গেছেন। পা সরিয়েও নিলেন না। নরমভাবে বললেন, আহা রে, মা ষষ্ঠীর জীব, বড্ড মায়া লাগে! রাস্তাঘাটে কোথায় গিয়ে মরবে! থাক, এখন থাক।

সেই থেকে বেড়ালছানাটা থেকেই গেল। ঝুনুমাসির সব ঘেন্না চলে গেল। এখন তিনি উল বুনতে বসলেই বেড়ালটা লাফিয়ে এসে তাঁর কোলে বসবে। পল্টুর চেয়েও তার আদর অনেক বেশি।

প্রথম কয়দিন তার অনেকগুলো নাম রাখা হয়েছিল। মিনি, পুষি, বিধুমখী, পুঁচকি, গুলগুলি, ভুলভুল, দুষ্টু, মিষ্টি—এইসব। শেষ পর্যন্ত তার নাম হল ফ্লসি। ইংরেজি নামটা ঝুনুমাসিরই বেশি পছন্দ। লোক কুকুর পুষলেই ইংরেজি নাম দেয়, বেড়ালেনই বা কেন ইংরেজি নাম হবে না? বেড়াল কি কুকুরের চেয়ে কম?

ফ্লসি সারা বাড়ি তুরতুর করে ঘুরে বেড়ায়। সে খুব সৌখিন, কক্ষনো নোংরা থাকে না। সবসময় সেজেগুজে ফুটফুটে! ঝুনুমাসি তাকে মাছের কাটা খাওয়াবার অভ্যেস করাননি। মাছের কাঁটা ওরা মুখ করে এখানে-সেখানে নিয়ে গিয়ে নোংরা করে। তাই ফ্লসিকে শুধু দুধ খাওয়া অভ্যেস করানো হল। কখনো-সখনো এক-আঘ টুকরো মাছ তাকে দেওয়া হয় বটে, তাও কাঁটা বেছে যাতে সেটা খাওয়ার টেবিলের নিচেই শেষ করে।

ফ্লসি সত্যিই মানুষের কথা বোঝে। বাড়িতে লোকজন এলে ঝুনুমাসি যেই বলেন, ফ্লসি, একটু নাচ দেখাও তো। অমনি সে দু-হাত তুলে দাঁড়ায়। তারপর টেবিলের একেবারে পাশে একটা বিস্কুট রেখে দিলে সে লাফিয়ে উঠে সেটাকে মুখে করে নেয়। সকলেই অবাক হয়ে যায়। ঝুনুমাসি গর্বের সঙ্গে বলে, এত সুন্দর বেড়াল থাকতে কেন যে লোকে কুকুর পোষে, তাও তো বুঝি না।

প্রথম প্রথম সে যেখানে-সেখানে, এমনকি দরজার সামনে হিসি করে দিত। ঝুনুমাসি একদিন তার কান ধরে ছাদে নিয়ে গিয়ে একটা কোণ দেখিয়ে বলেছিলেন, এইটা তোর বাথরুম, বুঝলি পোড়ামুখী। ফের যদি অন্য জায়গা নোংরা করবি...

কী আশ্চর্য, তারপর থেকে ফ্লসি ঠিক ছাদেই বাথরুম করতে যায়!

এক বছরের মধ্যেই ফ্লসি বেশ বড়ো হয়ে উঠল। দারুণ সুন্দর হয়েছে চেহারা রাজকুমারীর মতন সে সগর্বে বারান্দার রেলিঙের ফুটোয় মুখ বাড়িয়ে রাস্তা দেখে। কক্ষনো সে রাস্তার বাজে বেড়ালদের সঙ্গে মেশে না। সবচেয়ে মজার হচ্ছে তার চোখ দুটো চোখ—দু-রকম—একটা নীল আর একটা হলদে। তোমরা বিশ্বাস করছ না? সত্যি এরকম হয়। আমার নিজের চোখে দেখা।

সেবার পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাবার সময়ও ঝুনুমাসি ফ্লসিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে একা একা সে কার কাছে থাকবে? ঝি—চাকরা যদি যত্ন না করে? প্রথম কথা ছিল দার্জিলিং যাবেন। কিন্তু বেড়াল কি অত ঠাণ্ডা সহ্য করতে

পারবে? বেশি শীতে যদি ফ্লসির লোম উঠে যায়? তাই মত বদলে ঝুনুমাসি দার্জিলিং না গিয়ে ঘুরে এলেন পুরী থেকে।

ঝুনুমাসির এক মাসি আছেন। তার নাম টুনুমাসি। ইনিও কিন্তু খুব বড়ো নন। ঝুনুমাসিরই প্রায় সমান বয়েসি। এই টুনুমাসি অনেক দিন ধরে থাকেন দিল্লিতে, কয়েকদিনের জন্য এসেছেন কলকাতায়। একদিন বেড়াতে এলেন ঝুনুমাসির বাড়িতে। অনেকদিন পরে এসেছেন তো তাই সকলেরই খুব আনন্দ। কথা বলতে বলতে তিনি বসার ঘরের সোফার ওপরে বসে পড়েই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে বাবারে, এ-কী?

কেউ লক্ষ করেনি, ফ্লসি শুয়ে ছিল সোফার এক কোণে। এ বাড়ির সব জায়গায় তার অবাধ অধিকার। টুনুমাসি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, এ ম্যাগো। একটা বেড়াল এল কোত্থেকে। অ্যাঁ দেখলেই ঘেন্না লাগে। এই যা, যাঃ।

ফ্লসি যাবে কেন? তার জ্ঞান হবার পর কেউ তো কখনো তাকে তাড়িয়ে দেয়নি। সে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। টুনুমাসি তখন ফ্লসির ঘাড় ধরে তুলে বেশ জোরে ছুঁড়ে দিলেন মাটিতে। বললেন, যা বেয়োঃ! দূর হ!

আমরা সবাই আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। ফ্লসির এরকম অপমান! কেই কোনোদিন তাকে ছুঁড়ে ফেলেনি। ঝুনুমাসির মুখখানা থমথমে।

টুনুমাসি বললেন, কলকাতাতে বড্ড বেশি বেড়াল। আমাদের দিল্লিতে এ উৎপাত নেই! বেড়াল দেখলেই আমার এমন ঘেন্না করে!

ঝুনুমাসি বললেন, তুমি অত জোরে ছুঁড়ে দিলে? যদি পা-টা ভেঙে যায়।

ওদের আবার পা ভাঙবে। ছাদ থেকে ফেলে দিলেও মরে না! সারা বাড়ি নোংরা করে, অসুখ-বিসুখ ছড়ায়!

একবছর আগে ঝুনুমাসিরও ঠিক এই মতই ছিল। সেটা যে এর মধ্যে বদলে গেছে তা আর টুনুমাসি জানবেন কী করে। সুতরাং তিনি আরও কিছুক্ষণ বেড়ালের নিন্দে করে গেলেন। ঝুনুমাসি শুধু একবার বললেন, সব বেড়াল একরকম হয় না।

যাইহোক, একটু বাদেই টুনুমাসি দিল্লির গল্প শুরু করতেই বেড়ালের কথা চাপা পড়ে গেল। আমরা সবাই রাত দশটা পর্যন্ত গল্পে মশগুল হয়ে রইলাম।

সে রাতে আর ফ্লসিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। টুনুমাসি তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর সে দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে দেখা যায়নি। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা ফ্লসিকে খোঁজাখুঁজি করলাম। ঝুনুমাসি কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন।

পরের দিনও ফ্লসি ফিরে এল না। তার পরের দিনও না। একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

বেড়ালেও কি অভিমান হয়? আমাদের সকলের সামনে, এমনকি ঝুনুমাসির সামনেই একজন তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তক্ষুণি তো আমরা কেউ তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করিনি! সেই অভিমানে ফ্লসি চিরদিনের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে গেল?

আমরা পাগলের মতন খোঁজাখুঁজি করলাম কয়েকদিন। ঝুনুমাসি সবসময় কান্নাকাটি করছেন। আমাদের মধ্যে একমাত্র পল্টুই তেমন ভালোবাসত না ফ্লসিকে। এখন তার মায়ের অবস্থা দেখে সে নিজেও ফ্লসিকে ফিরিয়ে আনার সবরকম চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতেই পাওয়া গেল না।

দিন সাতেক বাদে ঝুনুমাসি আমাদের কারোকে না জানিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন।

ফ্লসি, ফিরে এসো।

তোমাকে আর কেউ কোনোদিন মারবে না!

তুমি যা যাও তাই পাবে!

তোমার জন্য আমি শয্যাশায়ী!

ইতি তোমার মা

ঝুনু সেই বিজ্ঞাপন পড়ে সবচেয়ে বেশি হাসলেন ঝুনুমাসির বর। আমাদের ছোটোমেসো। তিনি ঝুনুমাসিকে বললেন, তুমি তো তোমার বেড়ালকে অনেক কিছুই শিখিয়েছিলে জানি! তাকে কি খবরের কাগজ পড়তেও শিখিয়েছিলে নাকি! তার চেয়ে বলো, পুলিশের মধ্যে আমার অনেক বন্ধবান্ধব আছে,তাদের খবর দেব?

এই সময় ঠাট্টা-ইয়ারকি ঝুনুমাসির একদম ভালো লাগে না। তিনি কান্নায় ফোঁসফোঁস করতে করতে বললেন, জানি, তুমি তো ফ্লসি মরে গেলেই খুশি হও। সে কি রাস্তায়-ঘাটে হাঁটতে শিখেছে কখনো। না জানি এতদিনে তার কী হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ছেটোমেসোই লিখে দিলেন খবরের কাগজে আর একটা বিজ্ঞাপনঃ

হারাইয়াছে! হারাইয়াছে!

একটি ফুটফুটে সাদা রঙের বিড়াল

কপালে শুধু টিপের মতন একটি কালো দাগ

লেজ ঠিক আড়াই ইঞ্চি মোটা

বয়েস এক বছর এক মাস

খুব শান্ত স্বভাব, মাছের কাঁটা খায় না

কেউ সন্ধান দিলে একশো টাকা পুরস্কার!

সেই বিজ্ঞাপন পড়ে দলে দলে লোক আসতে লাগল। প্রত্যেকেরই কোলে একটি বা দুটি বেড়াল, কেউ কেউ থলেতে ভরে অনেকগুলো বেড়ালছানাও আনে। গেটের কাছে আমি পল্টু আর সুখন মিলে একটি কমিটি বসালাম। সব বেড়াল পরীক্ষা করে দেখি। ফ্লসির মতন সুন্দর একটাও নয়।

ঝুনুমাসিকে নিয়েই হল মুশকিল। উনিও আমাদের কমিটিকে থাকতে চান। তার ফল হল সাংঘাতিক।

দুপুরের দিকে তিনটে ছেলে এল, সঙ্গে একটা জাঁদরেল খয়েরি রঙের বেড়াল। মুখখানা দারুণ রাগী রাগী। তাকে জোর করে ধরে রাখা হয়েছে। একটি ছেলে ঝুনুমাসিকে দেখেই বলল, মাসিমা, আপনার বেড়াল হারিয়েছে? এই নিন!

ঝুনুমাসি তিন পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, এটা তো আমার বেড়াল নয়।

তাতে কী হয়েছে। বেড়ালতো সবই এক!

না, না আমি আমার সেই বেড়ালটাই শুধু চাই!

নিন না, সস্তা করে দিচ্ছি! আপনি একশো টাকা পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন তো? পঞ্চাশ টাকা দিন, ত হলেই এটা ছেড়ে দেব!

না, অন্য বেড়াল আমার চাই না!

তাহলে পঁচিশ টাকা দিন। আচ্ছা, দশ টাকা?

বলছি তো, অন্য বেড়াল নোব না আমি।

ছেলেটি এবার নিরাশ ভাবে বলল, নেবেন না? ঠিক আছে, তাহলে এটাকে লেকের জলে ডুবিয়ে মারব।

ঝুনুমাসি ভয় পেয়ে বললেন, কী করবে?

জলে ডুবিয়ে মারব।

কেন, মেরে ফেলবে কেন?

এটা সাংঘাতিক বদমাস! যেখানেই ছেড়ে দিই, ঠিক বাড়ি ফিরে যাবে। একবার হাওড়ায় ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। একবার ব্যারাকপুর। তাও রাস্তা চিনে ফিরে এসেছে! উঃ! এ পর্যন্ত সাতাশখানা মাছ ভাজা চুরি করেছে। একে মারব না?

ঝুনুমাসি ধমক দিয়ে বললেন, না, মারবেনা। ভগবানের জীবনেক কেউ কখনো এমনি এমনি মারে?

দশ টাকা দিয়ে সেই বিশ্রী বেড়ালটাকে রাখতে হবে আমাদের!

কালো রঙের দাগটা পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু পল্টু সেই জায়গাটায় আঙুল দিয়ে ঘষতেই দেখা গেল রং উঠে আসছে। ওটা এঁকে আনা হয়েছে। তাছাড়া ফ্লসি কখনো আমাদের দেখে ফ্যাঁচফ্যাঁম করে?

ধরা পড়ে যাওয়ায় বুড়ো লোকটি একটু দুঃখিত ভাবে বললেন, যাঃ, তাও মিলন না। সারা শহর খুঁজে খুঁজে সাদা বেড়াল ধরে আনলাম!

তারপর তিনি বেড়াল দুটোকে মাটিতে ছেড়ে দিলে বললেন, যাঃ যা!

আমরা বললাম, একী! এখানে বেড়াল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? এখানে ছাড়া চলবে না!

লোকটি এবার রেগেমেগে বললেন, তাহলে কি আমি ফেরত নিয়ে যাব নাকি? বেড়াল কি কেউ কখনো ফেরত নেয়? কোনোদিন শুনেছেন?

সে বেড়ালও রয়ে গেল বাড়িতে। সন্ধ্যের মধ্যে দশ-বারোটি বেড়াল জমে গেল। অনেকেই বেড়াল নিয়ে এসে আর ফেরত নিয়ে যায় না। একশো টাকার পুরস্কার লোভে রাস্তার ছেলেরা এক-একটা ধরে এনেছে রাস্তা থেকে! পুরস্কার না পেয়ে রাগের চোটে সে বেড়াল ছেড়ে যাচ্ছে এ বাড়িতেই। দু-একটা অবশ্য এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। কিন্তু ঝুনুমাসি সব কটার জন্য দুধ বরাদ্দ করে দিলেন। তিনি নিজে থেকে কোনো বেড়ালই তাড়াবেন না।

সন্ধ্যেবেলা দু-জন প্যান্ট-পরা লোক একটা টেমপো ভরতি করে নিয়ে এল একশো পঁচিশটা বেড়াল। শাড়ির দোকানে যেমন একটা শাড়ি পছন্দ না হলেই সঙ্গে

সঙ্গে আর-একটা শাড়ি আর করে দেখায়, এরাও তেমন এক একটা বেড়ালের ঘাড় ধরে তুলে জিজ্ঞেস করে, এটা আপনাদের? এটা নয়? তাহলে এটা?

এক-এক করে একশো পঁচিশটা বেড়ালেই দেখা হল। কোনোটাই ফ্লসি নয়! লোক দুটো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তাহলে আর কী হবে! চলো হে গঙ্গাচরণ!

ঝুনুমাসি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এত বেড়াল পেলেন কোথা থেকে? এগুলো নিয়ে কী করবেন?

একটা লোক বলল, আমরা লেবরেটরিতে সাপ্লাই দিই।

লেবরেটরিতে? সেখানে কী হয়?

সেখানে বেড়ালের ওপর নানারকম ওষুধ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এদের কেটেকুটে দেখা হয়। আমরা পার পিস তিন টাকায় বিক্রি করি।

পার পিস মানে?

এক-একটা তিন টাকা! ভাবলুম আপনারটা যদি মিলে যায়, তাহলে একশো টাকা পাওয়া যাবে।

তার মানে এতগুলো বেড়ালকে আপনার মারতে পাঠাচ্ছেন? নামান, নামান, গাড়ি থেকে নামান, সবগুলোকে!

সে এক প্রায় পাগলের কাণ্ড। সারা বাড়িতে প্রায় দেড়শো বেড়াল। ঝুনুমাসির ধারণা, তাঁর ফ্লসিকেও নিশ্চয়ই কেউ লেবরেটরিতে চালান দিয়েছে। তিনি আমাদের বলতে লাগলেন, যা, সব লেবটেরি দেখে আয়। সেখানে যত বেড়াল দেখবি কিনে নিয়ে আয়।

ছোটোমেসো রাত্তিরে বাড়ি ফিরে প্রায় নাচতে লাগলেন। কোথাও পা ফেরার উপায় নেই। সব জায়গায় বেড়াল তিনি ঝুনুমাসিকে, তুমি পাগল হয়েছে, না আমি চোখের ভুল দেখছি? এ কখনো হয়? এটা বাড়ি না চিড়িয়াখানা? হটাও, সব কটাকে হটাও!

ঝুনুমাসি বললেন, আমি যদি থাকি, বেড়ালও থাকবে!

সারা বাড়িতে ম্যাও মিয়াঁও ক্যাঁও কিঁও কিঁও চিঁও ওয়াঁও এইরকম নানারকম ডাক। কতরকম সাইজের কতরকম বেড়াল। এর মধ্যে মানুষের থাকা সত্যি অসম্ভব। আমরা ভাবলুম, ঝুনুমাসির জন্য ডাক্তার ডাকব কি না!

রাত্তিরে খেতে বসবার উপায় নেই। খাবার টেবিলের চারপাশে দেড়শো বেড়াল। অনেকগুলোই লাফিয়ে টেবিলে উঠে আসছে। সুখন একট লাঠি নিয়ে সেগুলো তাড়াতে গেলেও যায় না!

হঠাৎ ঝুনুমাসি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই তো! চুপ, ওই তো শোন!

সেই চিৎকারে সবাই চুপ করে গেল। এমনকী বেড়ালগুলো পর্যন্ত। আমরা শুনতে পেলাম, বন্ধ সদর দরজার বাইরে কে যেন মিষ্টি গলায়, ডাকছে, মিউ!

ঝুনুমাসি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। অমনি ফ্লসি ভেতরে এসে ঝুনুমাসির পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। ঝুনুমাসি তাকে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে কেঁদে

ফেললেন। তাকে আদর করে বলতে লাগলেন, ওরে সোনা, তুই কোথায় গিয়েছিলি, তুই মায়ের ওপর রাগ করেছিলি? আহা! তোর বুঝি খুব লেগেছিল সেদিন?

ঠিক মনে হচ্ছে মা মেয়ের অভিমান ভাঙাছে।

অন্য বেড়ালগুলো ফ্লসির এই আদর মোটেই ভালো চেখে দেখল না। কয়েকটা বিচ্ছিরি চেহারার হুলো বেড়াল রীতিমতন রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

ছোটোমেসো বললেন, যাক পেয়েছে তো! তোমার আদরের বেড়ালকে পেয়েছ তো? এবার বাকিগুলো সব তাড়াও।

কিন্তু বেড়াল কি সহজ? যে বাড়িতে বেড়ালকে একবার আদর করে খাবার দেওয়া হয়েছে, সে বাড়ি ছেড়ে তারা কিছুতেই যাবে না। ঝুনুমাসির কোল চেপে ফ্লসি খুব ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। এত বেড়াল সে-ও সহ্য করতে পারছে না।

আমি সুখন আর পল্টু তিনটি লাঠি নিয়ে বেড়ালগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাড়ির বাইরে পাঠাই। একটু বাদেই তারা ঠিক ফিরে আসে। একসঙ্গে অত বেড়ালকে আটকানো অসম্ভব। জানালা দিয়ে, ছাদ দিয়ে ফিরে আসবেই।

আর দুটো দিন এরকম অবস্থায় কাটাবার পর বোঝা গেল, একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে এ বাড়িতে থাকাই অসম্ভব। রাস্তায় ঘাটে একসঙ্গে এত বেড়াল ছেড়ে আসা যায় না। লোকেরা আপত্তি করবে। শেষপর্যন্ত একটা বুদ্ধি মেসোশায়ই বার করলেন। রং তুমি দিয়ে অনেকগুলো কাগজে পোস্টার লেখা হয় :

প্রদর্শনী, বিরাট প্রদর্শনী
অভূতপূর্ব বিড়াল প্রদর্শনী
ধর্মতলা কার্জন পার্কে আজ সন্ধ্যে ছটায়
আপনার গৃহপালিত বিড়াল আনুন
প্রথম পুরস্কার একহাজার টাকা
আরও অন্যান্য অনেক পুরস্কার!

এই পোস্টার মেরে দেওয়া হল কার্জন পার্কের কাছাকাছি সব রাস্তায়। তারপর এ বাড়ির সবকটা বেড়ালকে তোলা হল একটা লরিতে। ভোরবেলা।

সেই লরি ভরতি বেড়াল এনে ছেড়ে দিলাম কার্জন পার্কে।

লরি ছাড়বার পর ছোটোমেসো বললেন, কার্জন পার্কে অনেক ইঁদুর আছে, বেড়ালগুলো ভালো থাকবে। তাছাড়া প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাওয়ার লোভে কেউ ওদের পুষ্যি নিতে পারে। মোটকথা ব্যবস্থাটি ভালোই হয়েছে, কী বল?

বাড়ি ফিরে ঝুনুমাসিকে সব শোনাতে হল। ফ্লসি তাঁর কোলের কাছে শুয়ে অন্য বেড়ালগুলো তাড়াবার জন্য ঝুনুমাসি খুব খুশি নন। সব শুনেটুনে তিনি ফ্লকির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সত্যি সত্যি একটা বেড়ালের প্রর্শশনী যদি হত, তাহলে আমার ফ্লসিই নিশ্চয়ই ফাষ্ট হত। তাই না?

আমরা কেউ কোনো প্রতিবাদ করলাম না।

ঘুষ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মেজোমামার বই বাড়ছে, বড়োমামার বাড়ছে জীবজন্তু আর মাসিমার চড়ছে মেজাজ। আজ মাসিমার স্কুল বন্ধ। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া পর আমাকে বললেন, চলো গেলে পড়ি। আমাদের লাইফে তো বসার কোনো সময় নেই।

লেগে পড়া মানে দু-জনে মিলে খুঁজে খুঁজে বের করা বড়োমামার জীবজন্তুরা কী কী অপকর্ম করছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা। বড়োমামার কুকুরের সংখ্যা আপাতত সাত। শোনা যাচ্ছে আরও দুটো আসছে। একটা গোল্ডেন রিট্রিভার, আর একটা হাউন্ড। গোল্ডেন রিট্রিভারের রূপের বর্ণনা শুনে শুনে আমাদের এখন মনে হতে শুরু করেছে—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ নয়, গোল্ডেন রিট্রিভার। বড়োমামাকে প্রশ্ন করেছিলুম—বড়োমামা, সব কিছুর একটা সীমা আছে তো! এত কুকুর কী হবে? সাতটা আছে, দেখতে দেখতে নয়টা হবে। এরপর তো কুকুর রাখার আর জায়গা থাকবে না।

সে তুমি বুঝবে না। আমি গবেষণা করছি। আমার গবেষণার জন্যে কুকুরের প্রয়োজন।

গবেষণার তো কিছু দেখছি না। ওরা খাচ্ছেদাচ্ছে ঘেই ঘেউ করছে আর দুষ্টুমি করছে। আর আপনি একে বিস্কুট ছুঁড়ে দিচ্ছেন, ওর মাথায় চাঁড়া মারছেন। এর নাম গবেষণা!

শোনো শোনো, ও তোমার মেজোবাবুর গবেষণা নয়। আমার এই গবেষণা সমস্ত কুকুর জাতির স্বভাব পালটে দেবে। এই যে কুকুর কুকুরে দেখা হলেই খেয়োখেয়ি সেই খেয়োখেয়ি আর হবে না। সব কুকুর ভাই ভাই হয়ে যাবে। মানুষ যেটা ভুলে গেছে। আমার এইটা হল কুকুরদের ট্রেনিং ক্যাম্প। ধরো এখানে সাতশো কী আটশো কুকুরকে ট্রেনিং দিয়ে দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিলুম। সেই ট্রেইনড কুকুর তখন এক-এক এলাকার কুকুরকুলকে মানুষ করে দেবে। একেবারে মানুষ।

মেজোমামা পরিকল্পনা শুনে বলেছিলেন, একেবারে মানুষ হলে তো সবই একই হয়ে গেল। আবার খেয়েখেয়ি। তুমি কী করতে চাইছ? কুকুরকে মানুষ, না মানুষকে কুকুর, না কুকুরকে কুকুর। আগে ঠিক করে নাও।

থাক তোমাকে আর গুলিতে দিতে হবে না। তুমি হলে সেই কথামালার শৃগাল, বাঘকে যে খাঁচায় বন্দি করে ছেড়েছিল। আমি আমার মতো চলি, তুমি তোমার মতো। তোমার ছাইপাঁশ গবেষণায় আমি নাক গলাই?

মাসিমা বললেন, এই দেখ বড়দার খরগোশ মেজদার অক্সফোর্ড ডিক্সনারির এ থেকে ডি পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছে। মেজদা একবার দেখলেই খেপে যাবে। আর খেপে যাবারই তো কথা।

এই দেখো, মাসি, বড়োমামার সেই ধেড়ে বেড়ালটা এমন সুন্দর সোফার ফোমটাকে আঁচড়ে কীরকম দাগ দাগ করে দিয়েছে।

সে কী রে, এই তো পরশু নতুন করে দিয়ে গেল। আর পারি না। এ বাড়িতে ওই কুকুর বেড়াল ছাগলই থাক চল আমরা পালাই।

তিনটে চাদর বড়োমামার কুকুরে ফালাফালা করেছে। আমি জানি বড়োমামা বলবেন, ও কিছুই না। সাতটা কুকুরের উচিত ছিল সাতটা চাদর ফালা করার। তারপর গলাটাকে ধীর করে বলবেন—কী হয়েছে কী, চাদরের ঝোলা অংশ তো ভালোই ঝালর মতো করে দিয়েছে। ডেকরেশান।

মাসিমা বললেন, তাহলে, ওই সপ্তাহে বড়োবাবুর পেয়ারের জন্তুরা কী কী উপকার করল—তিনটে চাদর খতম। সোফার ফোমলেদারে বেড়ালের নখের নকশা। মেজোবাবুর ইংরেজি ডিক্সেনারির এ থেকে ডি হজম। শিকার ধরতে গিয়ে বড়োবাবুর পেয়ারের হুলো আমরা বাঁয়া তবলাটা চুরমার করেছে। সবচেয়ে শয়তান ছোটো কুকুরটা; তোর হাওয়াই চপ্পলটাকে সজনে ডাঁটার মতো চিবিয়েছে। একটা সপ্তাহের পক্ষে যথেষ্ট, কী বলিস বুড়ো!

এখনও তো তুমি গোরু আর ছাগলের দিকে যাওনি মাসি। এ পাড়ায় কী হয়ে আছে কে জানে?

ও ছেড়ে দে, বাগানে তো একদিকে চলছে বৃক্ষরোপণ উৎসব, আর একদিকে বৃক্ষহনন। বড়োকর্তার পেয়ারের লক্ষ্মী তো বিশ্বপেটুক। সব কয়টা কলাগাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। আর প্রাণের ছাগল রামু তো দেখি আজ দুপুরে বাগানের বেড়াটাকে টেস্ট করার চেষ্টা করছে। আর তিন দিন। তিনটে দিন পরে দেখবে বেড়া ফাঁক। বড়ো কর্তাকে বললেই বলবে, রির্সাচ হচ্ছে গবেষণা। ছাগলের হজম শক্তি দেখেছিস কুশি। ওদের হজম রস থেকে একটা ওষুধ যদি কোনোরকমে বের করতে পারি তো, মার দিয়া কেল্লা। মানুষ তখন ছাতার বাঁট খেয়ে হজম করবে। দুটো পাগলে আমার জীবনটা শেষ করে দিলে!

মেজো মামা অতটা নয়।

ওই একই। টাকার এপিট আর ওপিঠ। বাড়িতে বই রাখার আর জায়গা আছে? সেদিন বলেছে, আলমারি থেকে সব কাগড় জামা বের করে দিয়ে বড়ো মাপের

বইগুলো রাখবে। যুক্তিটা শুনবি, কাপড়জামা পুঁটলি করে সেখানে হোক রাখা যায়, দামি দামি বই তো আর পুঁটলি পাকানো যায় না। বই হল জ্ঞানের ভাণ্ডার, গুচ্ছের জামাকাপড়ে কী হবে।

মেজোমামা বলছিলেন, জানিস বুড়ো, বই দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না, অথচ জানিস শেষ মাসে না আমার দশপয়সার মুড়িও জোটে না।

রাখো তো ওসব বাহারের কথা। দিন দিন ভুঁড়িটা কীরকম বাড়ছে দেখছিস, না খেলে ভুঁড়ি হয়?

না, সে ভুঁড়ি হবার কারণ আছে। সে কথাও আমাকে বলেছেন। কী কষ্ট রে বুড়ো, একেবারে ডবল টানা। ডবল টানটা কী জানো। সকালে খেতে বসে দুজনের খাবার খেয়ে নেন দুপুরে টিফিন আর খেতে হয় না।

সে না হয় সকালে। আর রাতে? সেদিন রাতে গল্প করতে করতে পঞ্চাশখানা লুচি খেয়েছে। ভাবতে পারিস বুড়ো! পঞ্চাশখানা লুচি!

সে কথাও আমাকে বলেছেন। বললেন লুচি মানে কী? লুচি মানে এয়ার, বাতাস, ফক্কিকারি জিনিস। একশোটা ফুলকো লুচিতে কতটা ময়দা থাকে? তুই লুচির সংখ্যা দেখবি না ময়দার ওজন দেখবি। তোর বিজ্ঞান কী বলে?

ওসব ছেলেভোলানো কথা তুই শুনিস, আমাকে বোঝাতে আসিস নি। মেজদা চিরকালই ভোজবিলাসী। আমি সেদিন লন্ড্রিতে জামা পাঠাতে গিয়ে বুকপটেক থেকে রেস্তোরাঁর বিল পেয়েছি। বাষট্টি টাকার চিকেন তন্দুরি খেয়েছে।

যাক গে কারো খাওয়া নিয়ে কথা বলতে নেই।

না আমি তা বলছি না; তবে কি জানিস, বেশি খাওয়া ঠিক নয়। শরীর তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, এই আর কি!

এইবার আমি একটা নোটিশ দেব। এ বাড়িতে বই আর বাড়বে, জীবজন্তুও বাড়ানো চলবে না। সবকিছুরই একটা সীমা আছে।

মাসি, জ্ঞান যে অসীম!

তুই থাম! কটা বই পড়ে রে!

মেজোমামা বলেন বইয়ে মলাটে হাত দিলেই অর্ধেক পড়া হয়ে যায়। আর বাকি অর্ধেক। সেই হিসেবে তো হাজার কয়েক বই পড়তে হবে। আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে কে খুব চিৎকার করে ডাকছে, বাবু, বাবু!

আমরা ছুটে গেলুম। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কাঁধে ঝুলছে বিশাল এক তারের খাঁচা, খাঁচায় অনেক পাখি কিচিরমিচির করছে।

মাসিমা বললেন, কী ব্যাপার!

ডাগদার সাব।

ডাগদার সাব বাড়ি নেই।

মাসি বেশ রেগে রেগে উত্তর দিচ্ছে।

লোকটি বললে, ডাকদার সাব ভেজিয়েছেন। এই যে চিঠি!

মাসিমা চিটিঠা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে, পড়।

আমি জোরে জোরে পড়লুম, কুশি বোনটি আমার রাগ করিসনি। জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এরপর আর মনে হয় কিছু বলার থাকে না। খাঁচাটায় ডেলিভারি নিয়ে নিস। তোর হিসেব থেকে লোকটাকে এখন তিনশো টাকা দিয়ে দিস। আমি তোকে সুদ সমেত চারশো টাকা দেব। মনে রাখিস জীবে দয়া। জিভে দয়া নয়। যা মেজো-র ধর্ম।

মাসিমা সাধারণত ইংরেজি বলেন না, আজ এত রেগে রেগে আছেন যে, চিঠিটা শেষ হওয়া মাত্রই লোকটিকে বললেন, গেট আউট।

সে গেট-আউট-এর কী বুঝবে। সে হাসি হাসি মুখে বললে, হ্যাঁ মা।

মাসিমা তখন বললেন, বেরোও, দূর হও।

লোকটি বেশ মজার মানুষ। সে একটু নাচের ভাব করে বলল, দূর হটো ভাই দুনিয়াওয়ালে হিন্দোস্তাঁ হামারা হায়।

মাসিমা বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, এটাকে হাটা না বুড়ো।

ও হটবে না মাসি, বড়োমামা যা বলেছেন তুমি তাই করে দাও।

পাখিগুলো দারুণ দেখতে। আমিই বুদ্ধিটা বড়োমামাকে দিয়েছিলুম। উত্তরের বারান্দাটা বেশ করে জাল দিয়ে ঘিরে মুনিয়া আর বদরি পাখি পুষুন। মনে হবে স্বর্গে আছি। আর ওদের বাচ্চা হবে। ছোটো ছোটো বাচ্চা ফুরফুর করে উড়বে। মাসি খুব গজগজ করতে করতে তিনশোটা টাকা লোকটির হাতে দিলেন।

খাঁচাটা কোথায় রাখব মা?

আমার মাথায়।

মা আমর রাগ হয়েছে!

আহা, কী বাংলা! লোকটি আপমনে বাগানে ঢুকে গেল। গান চলছে কিনা। গান থামেনি। খাঁজটাকে ভেতরের বারান্দায় রেখে সবে কী একটা বলতে যাচ্ছে, আর বড়োমামার সাত-সাতটা বড়ো ছোটো কুকুর একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করে তেড়ে এল। লোকটি কী ভালো ছুটতে পারে। আবার কী সুন্দর লাফাতে পারে। এক লাফে বাগানের বেড়া টপকে সোজা পুকুরে। জল থেকে উঠে এসে বললে, নাইতে তো বেশ ভালো লাগে তো বাবু।

তুমি আগে কখনো চান করনি?

সে দশ বছর আগে। যেবার গঙ্গাসাগর গিয়েছিলুম। চান করবার সময় কোথায়?

তোমার কী এমন কাজ।

বা বা আমার কা নেই? আমাকে তো সব সময় পাখি পাহারা দিতে হয়।

কেন?

বাঃ, বেড়াল খেয়ে নেবে না?

লোকটি বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বড়োমামার কুকুরগুলো কিছু দূর তেড়ে এসে আর আসেনি। ওরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে মজা পায়।

লোকটি বললে, আবার ঠাণ্ডা না লেগে যায়! হঠাৎ চান করলুম তো!

এই গরমে ঠাণ্ডা!

ছেলেবেলায় আমার একবার বঙ্কা হয়েছিল।

বঙ্কা আবার কী?

সে তুমি বুঝবে না, ডাক্তারবাবু জানেন। সে খাঁশি খালি খাঁশি। আরেব্বপ। তা জানো, আমি চান করলুম আর আমার মায়ের দেওয়া তিনটি নোটও চান করল। বরাত ভালো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, চারটে তো বাজল?

তা বাজুক না! চারটে বাজলে কী হয়?

সুর করে বললে, বাবুদের বাড়িতে চা হয়, হ্যাঁ গো তোমাদের চা হয়ে গেছে? দেখো না একটু ম্যানেজ করো না। তোমাদের কুকুরের জন্যেই তো আমি জলে পড়ে গেলুম। আমি চেনা তাই। অচেনা হলে চিৎকার করতুম। চিৎকার করলে লোকে জড়ো হত। লোক হড়ো হলে জুলুম হত। দিনকাল তো ভালো নয়। দেখো না, আদা দিয়ে এক কাপ চা যদি হয়।

লোকটা তো খুব চালু! বড়োমামার সব পার্টিই সমান।

তাহলে খুচরো একটা টাকা দাও। দোকানে চা খাই। আমার তো আবার সব একশো টাকার নোট।

আমার পকেটে একটা টাকা ছিল, লোকটাকে দিলুম। যেতে যেতে বললে, দোকানের চা ঠিক বাড়ির মতো হয় না।

ভেতরে যাবার জন্যে যা বাড়িয়েছি, ধরস ধরধর করে একটা টেম্পো এসে দাঁড়াল, ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বললে, মুখার্জি বাড়ি?

হ্যাঁ মুখার্জি বাড়ি।

ড্রাইভার তার চেলাকে বললে, মোড়ের মাথার লোকটি ঠিকই বলেছিল। দেখবেন যে বাড়িতে কুকুর জিভ বের করে হ্যা হ্যা করছে, সেই বাড়িটাই মুকুজ্যে বাড়ি! প্যালা ছাদের দিকে একবার তাকা! দৃশ্য। দৃশ্য মানুষ খেতে পাচ্ছে না, দশ-বারোটা কুকুর। বড়লোকদের কী দশা প্যালা!

মাসিমা বেরিয়ে এসেছেন, এবার আবার কী?

বোঝা যাচ্ছে না মাসি!

ড্রাইভার ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিতে দিতে বললে, লেটার আছে, লেটার, পড়লেই বুঝতে পারবেন দিদি। আবার একটা চিঠি। এবার মেজোমামা। কুশি, বোনটি আমার, রাগ করিসনে বোন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, হঠাৎ সেই পরমকরুণাময়ের দয়ায়, আমার হাতের মুঠোয় হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ এসে গেল, আর আমি জয় মা বলে খপাত করে ধরে ফেললুম। আজ একটা প্রাচীন লাইব্রেরি বিক্রি হয়ে গেল। আমি বেছে বেছে কিছু প্রাচীন পুঁথি আর গ্রন্থ এই টেম্পো করে তোর কাছে পাঠালুম। তুই করুণাময়ী। তুই জগদম্বা, তোকে পুজোর সময় আমি বোম্বাই নিয়ে যাব। আমি বড়োকত্তা নই। আমার কথার দাম আছে। তুই মালটা ডেলিভারি নিয়ে, টেম্পো ভাড়া তিরিশ টাকা দিয়ে দিস। ত্রিসংসারে আমার কে আছে বল, তুই ছাড়া। আপাতত আমার ট্যাঁক গড়ের মাঠ। খুব সাবধানে নামাস।

অধিকাংশই জরাজীর্ণ। জোরে নিশ্বাস লাগলেও ড্যামেজ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মানে কর এক গাড়ি পাঁপড় ভাজা। এর মধ্যে একটা পুঁথিতে নানা টোটকার কথা লেখা আছে। মনে হয় চুল পড়া বন্ধেরও টোটকা আছে। একদিন তোকে পড়ে মানে করে দোব যদি সময় পাই। সোনা মেয়ে। আমার সন্টুটা আমার মন্টুটা। আমি এখনও বেছে চলেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মনে হয় আরও এক টেম্পো পাঠাতে পারব। বই, শুধু বই। কী ঐশ্বর্য। ইতি, তোর মেজদা।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে, এই জঞ্জাল কোথায় ফেলব দিদি?

ডাস্টবিনে।

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। আমি মাথা খাটিয়ে কয়লার ঘরটা দেখিয়ে দিলুম।

প্রথম এলেন বড়োমামা। দু-হাত সামনে বাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে অন্ধ মানুষের মতো হাঁটছেন। একটা করে পা অনেকটা উঁচুতে সাবধানে ফেলছেন। মাঝে, মাঝে টলে যাচ্ছেন। যাব্বাবা! এ আবার কী হল। জলাতঙ্কের মতো ভূমি আতঙ্ক নাকি? বড়োমামার কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। সেটা ওইভাবে লেফট রাইট করে চলার জন্যে ধপাক ধপাক করে দুলছে। বড়োমামা তো মেজোমামার মতো সাইডব্যাগ নেন না, বরং ঠাট্টা করেন। প্রফেসারদের জার্সি হল, কড়া মাড় দেওয়া পাঞ্জাবি আর সাইডব্যাগ আর তার চোখ খারাপ হোক আর না হোক, মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই বড়োমামার কাঁধে ব্যাগ!

আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাসিমাকে ডাকলুম। বড়োমামার বোধ হয় স্ট্রোক হচ্ছে। মাসিমাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন প্রথম। বড়োমামা ওইভাবে এগিয়ে চলেছেন উঠান দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে। ওঃ মাসিমার লক্ষ বটে! আমি অতটা নজর করে দেখিনি। বড়োমামার চোখে চশমা প্রথম। মাসিমা এগিয়ে গিয়ে একটান মেরে চশমাটা খুলে নিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই বাইফোকাল।

বড়োমামা বললেন, বাঁচালি কুশি। বাইফোকাল। কী অবস্থা রে। সব যেন ঢেউ খেয়েছে। এই তো দেখছিস সব সমান, চশমাটা পর, দেখবি সব উঁচু-নিচু শীতলাতলার কাছে তো দম করে পড়েই গেলুম। ওই যে দেখছিস তলার দিকে গোল চা মতো দাগ কাচের ওপর ওইটাই মারাত্মক। তুই বল, ওইটুকু জায়গা দিয়ে চোখ চালানো যায়।

পড়ে না গিয়ে চশমাটা তো চোখ থেকে খুলে নিলেই পারতে।

যাঃ, তা কখনো হয়। চশমা তো পরার, জন্যে, পড়ার জন্যে।

তুমি তো পড়ার বদলে পড়ে গেলে। তোমার কাঁধে কী?

ও কাঁধে! বড়োমামা লাজুক হাসলেন, মেজোকে উপহার দেব কিন্তু বই রে কুশি।

আবার বই—মাসিমা প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি।

আর তখনই ঢুকলেন মেজোমামা। তাঁর কোলে ভারী সুন্দর একটা বাচ্চা কুকুর।

মাসিমা বললেন, এ কী, কুকুর! কুকুর তো তোমার সাবজেক্ট নয়!

আমার কে ছাত্র দিলে। বড়দাকে প্রেজেন্ট করব।

কী ব্যাপার বলো তো। দু-জনে এত ভাব। বড়দা তোমার জন্যে বই এনেছে। ঝেশে কাশো তো। এ যেন দু-জনের ঘুষ দিচ্ছ।

বড়োমামা বইয়ের ঝোলটি, মেজোমামার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ফ্যান্টাসটিক কিছু বই। ফর ইউ!

মেজোমামা কুকুরছানাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ফ্যান্টাস্টিক কুকুর, চিওয়া ওয়া।

বড়োমামা বললেন, বেশ এবার তুমি তাহলে কাজের কথা বলো!

তুমি আগে বলো।

আমি উত্তরের বারান্দাটা জাল দিয়ে ঘিরে পাখি রাখব। ওই দেখো খাঁচা।

আমি তোমার ঘরের দুটো দেয়াল চাই। র‍্যাক ফিট করে বই রাখব। ওই দেখো এক টেম্পো বই। এদিক-ওদিক তাকালেন। আমার বই!

আমি বললুম, কয়লার ঘরে রাখা হয়েছে।

কয়লার ঘরে! কয়লার ঘরে মা সবরস্বতী!

মেজোমামা পড়ি কি মরি করে ছুটলেন সেখানে! বড়োমামার পেয়ারের গোরু লক্ষ্মী এক খাবলা মা সরস্বতী মুখে পুরে চোখ বুজিয়ে চিবোচ্ছে আরামসে, আর চামরের মতো ন্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে মশা তাড়াচ্ছে।

নয়নচাঁদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গভীর রাতে একটা শব্দ শুনে নয়নচাঁদবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

এমনিতেই নয়নচাঁদের ঘুম খুব পাতলা। টাকা থাকলেই দুশ্চিন্তা। আর দুশ্চিতা থাকলেই অনিদ্রা! অনিদ্রা থেকেই আবার অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য থেকে ঘটে উদরাময়। সুতরাং টাকা থেকেও নয়নচাঁদের সুখ নেই! সারা বছর কবরেজি পাঁচন, হোমিওপ্যাথি গুলি আর অ্যালোপ্যাথির নানা বিদঘুটে ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন কোনোমতে।

ঘুম ভাঙতেই নয়নচাঁদ চারদিকে চেয়ে দেখলেন। রাত্রিবেলা এমনিতেই নানা রকমের শব্দ হয়। ইঁদুর দৌড়ায়, আরশোলা খরখর করে কাঠের জোড় পটপট করে ছাড়ে, হাওয়ার কাগজ ওড়ে, আরও কত কী। তাই নয়নচাঁদ তেমন ভয় পেলেন না। তবে আধো ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে হয়েছিল শব্দটা হল জানালায়। জানালার শিকে যেন টুং করে কেউ কেটা ঢিল মেরেছিল।

বিছানার মাথায় দিকেই জানালা, জানালার পাশেই একটা টেবিল। তাতে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস। নয়নচাঁদ টর্চ জ্বেলে জলের গেলাসটার দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেলেন। টেবিলের উপর একটা কাগজের মোড়ক পড়ে আছে।

নয়নচাঁদ উঠে বড়ো বাতি জ্বেলে মোড়কটা খুললেন। যা ভেবেছেন তাই। ঢিলে জড়িয়ে কে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাঁকে, সাদামাটা একখানা কাগজে লাল অক্ষরে লেখা ঃ নয়নচাঁদ, আমাকে মনে আছে? সামান্য দেনার দায়ে আমার ভিটোয় ঘুণ্ড চরিয়েছিলে; আমার বউ আর বাচ্চারা ভিখিরি হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘুরছে। অনেক সহ্য করেছি, আর না। আগামী অমাবস্যায় তোমার ঘাড় মটকাব। ততদিন ভালোমন্দ খেয়ে নাও। ফূর্তি করো, গাও, নাচো, হাসো। বেশি দিন তো আর নয়। ইতি-তোমার যম জনার্দন।

নয়নচাঁদ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। চাকরবাকর, বউ, ছেলেমেয়েদের ডাকার চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

জনার্দনকে খুব মনে আছে নয়নচাঁদের। নিরীহ গোছের মানুষ। তবে বেশ খরচের হাত ছিল। প্রায়ই হ্যান্ডনোট লিখে নয়নচাঁদের কাছে থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করত। কখনো টাকা শোধ দিতে পারেনি। নয়নচাঁদ মামলায় জিতে লোকটার বাড়িঘর সব দখল করে নেয়। জনার্দন সেই দুঃখে বিবাগি হয়ে কোথায় চলে যায়। মাসখানেক বাদে নদীর ওপারে এক জঙ্গলের মধ্যে একটা আমড়া গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার পচা গলা লাশটা পাওয়া যায়। তার বউ ছেলেপিলেদের কী হয়েছে তা অবশ্য নয়নচাঁদ জানেন না। সেই ঘটনার পর বছর তিন-চার কেটে গেছে।

নয়নচাঁদের ভূতের ভয় আছে। তাছাড়া অপঘাতকেও তিনি খুবই ভয় পান। খানিকক্ষণ বাদে শরীরের কাঁপুনিটা একটু কমলে তিনি খেলেন এবং বাড়ির লোকজনকে ডাকলেন। রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে পারল না। এই রহস্যময় চিঠি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা গবেষণা হতে লাগল।

পরদিন সকালে গোয়েন্দা বরদাচরণকে ডেকে পাঠানো হল। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাড়ারই লোক।

বরদাচরণ লোকটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক নিয়মে কোনো কাজ করতে তিনি ভালোবাসেন না। তাঁর সব কাজেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন কোনো বাড়িতে গেলে তিনি কখনো সদর দরজা দিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকবেন না। এমনকী খিড়কি দরজা দিয়েও না। তিনি হয় পাঁচিল টপকাবেন, নয়তো গাছ বেয়ে উঠে ছাদ বেয়ে নামবেন। এমনকি জানালা ভেঙেও তাঁকে ঢুকতে দেখা গেছে।

নয়নচাঁদের বাড়িতে বরদাচরণ ঢুকলেন টারজনের কায়দায়। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত বটগাছ আছে। সেই বটের ঝুরি ধরে কষে খানিকটা ঝুল খেয়ে বরদা পাশের একটা জাম গাছের ডাল ধরলেন। সেটা থেকে লাফিয়ে পড়লেন একটা চালতা গাছে। সেখান থেকে নয়নচাঁদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে অবশেষে একটা রেইন পাইপ ধরে তিনতলায় জানালায় উঁকি দিয়ে হাসিমুখে বললেন, এই যে নয়নবাবু কী হয়েছে বলুন তো?

জানালায় আচমকা বরদাচরণকে দেখে নয়নচাঁদ ভিরমি খেয়ে প্রথমটায় গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁকে ফের সামাল দেওয়া হল। বরদাচরণ ততক্ষণে ধৈর্যের সঙ্গে জানালার বাইরে পাইপ ধরে ঝুলে রইলেন।

অবশেষে যখন ঘটনাটা বরদাচরণকে বলতে পারলেন নয়নচাঁদ, তখন বরদা খুব গম্ভীর মুখে বললেন, তাহলে এ জানালাটাই! এটা দিয়েই ঢিলে বাঁধা চিঠিটা ছোঁড়া হয়েছিল তো?

হ্যাঁ বাবা বরদা।

জানালাটা খুব নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে বরদা বললেন, হুম, অনেকদিন জানালাটা রং করাননি দেখছি।

না। খামোকা পয়সা খরচ করে কী হবে? জানালা রং করালেও আলো হাওয়া আসবে, না করালেও আসবে। ঝুটমুট খরচে যাব কেন?

তার মানে আপনি খুব কৃপণ লোক, তাই না?

কৃপণ নই বাবা, লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে হিসেবি বলতে পার।

কাল রাতে আপনি কী খেয়েছিলেন?

কেন বাবা বরদা, রোজ যা খাই তাই খেয়েছি। দুখানা রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি।

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি খুব ই কৃপণ, ভীষণ কৃপণ।

না বাবা, কৃপণ নই। হিসেবি বলতে পার।

আমার ফিস কত জানেন? পাঁচশো টাকা, আর খরচপাতি যা লাগে।

নয়নচাঁদ ফের ভিরমি খেলেন। এবার জ্ঞান ফিরত তাঁর বেশ সময়ও লাগল।

বরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, কৃপণ বা হিসেবি বললে আপনাকে কিছুই বলা হয় না। আপনি যাচ্ছেতাই রকমের কৃপণ। বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে কৃপণ লোক আপনিই।

নয়নচাঁদ মুখখানা ব্যাজার করে বললেন, পাড়ার লোক হয়ে তুমি পাঁচশো টাকা চাইতে পারলে? তোমার ধর্মে সইল?

আপনার প্রাণের দাম কি তার চেয়ে বেশি নয়?

কিছু কম হবে বাবা। হিসেব করে দেখেছি আমার প্রাণের দাম আড়াইশো টাকার বেশি হয়।

তবে আমি চললুম, ভিজিটা বাবদ কুড়িটা টাকা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।

নয়নচাঁদ আঁতকে উঠে বললেন, যেয়ো না বাবা বরদা, ওই পাঁচশো টাকাই দেবখন।

বরদাচরণ এবার পাইপ বেয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, চিঠিটা দেখি।

চিঠিটা নিয়ে খুঁটিয়ে সবটা পড়লেন। কালিটা পরীক্ষা করলেন। কাগজটা পরীক্ষা করলেন। আতশকাচ দিয়ে অক্ষরগুলো দেখলেন ভালো করে। তারপর নয়নচাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, এটা কি জনার্দনেরই হাতে লেখা?

ঠিক বুঝতে পারছি না। জনার্দন কয়েকটা হ্যান্ডনোট আমাকে লিখে দিয়েছিল। সেই লেখার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

বরদা বললেন, হুঁ, মনে হচ্ছে গামছাটা তেমন টেকসই ছিল না।

তার মানে কী বাবা? এখানে গামছার কথা ওঠে কেন?

গামছাই আসল। জনার্দন গলায় গামছা বেঁধে ফাঁসে লটকেছিল তো! মনে হচ্ছে গামছা ছিঁড়ে সে পড়ে যায় এবং বেঁচে যায়। এ চিঠি যদি তারই লেখা হয়ে থাকে

তো বিপদের কথা। আপনি বরং কটা দিন একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করুন। আমোদ-আহ্লাদও নিন প্রাণভরে।

তার অর্থ কী বাবা? কী বলছ সব? আমি জীবনে কখনো ফূর্তি করিনি। তা জান?

জানি বলেই বলছি। টাকার পাহাড়ের ওপর শকুনের মতো বসে থাকা কি ভালো? অমাবস্যার তো আর দেরিও নেই।

নয়নচাঁদ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, জনার্দন যে মরেছে তার সাক্ষীসাবুদ আছে। লাশটা সনাক্ত করেছিল তার আত্মীয়রাই।

তবে তো আরও বিপদের কথা। এ যদি ভূতের চিঠি হয়ে থাকে তবে আমাদের তো কিছুই করার নেই।

নয়নচাঁদ এবার ভ্যাক করে কেঁদে বললেন, প্রাণটা বাঁচাও বাবা বরদা, যা বলো তাই করি।

বরদা এবার একটু ভাবলেন। তারপর মাথাটা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, দেখছি।

এই বলে বরদাচরণ বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তিন দিন পর। মাথায় চুল উসকোখুসকো, গায়ে ধুলো, চোখ লাল। বললেন, পেয়েছি।

নয়নচাঁদ আশান্বিত হয়ে বললেন, পেরেছ ব্যাটাকে ধরতে? যাক বাঁচা গেল।

বরদা মাথা নেড়ে বললেন, তাকে ধরা অত সহজ নয়। তবে জনার্দনের বই ছেলেমেয়ের খোঁজ পেয়েছি। এই শহরেরই একটা নোংরা বস্তিতে থাকে, ভিক্ষে সিক্ষে করে পরের বাড়িতে ঝি—চাকর খেটে কোনো রকমে বেঁচে আছে।

অ, কিন্তু সে খরবে আমাদের কাজ কী?

বরদা কমটমট করে চেয়ে থেকে বললেন, চিঠিটা যদি ভালো করে পড়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ভূতটার কেন আপনার ওপর রাগ! তার বউ ছেলেমেয়ে ভিখিরি হয়ে যাওয়াটা সে সহ্য করতে পারছে না।

তা বটে।

যদি বাঁচতে চান তো তাদের আগে ব্যবস্থা করুন।

কী ব্যবস্থা বাবা বরদা?

তাদের বাড়িঘর ফিরিয়ে দিন। আর যাসব ক্রোক করেছিলেন তাও।

ওর বাবা! তার চেয়ে মরাও ভালো।

আপনি চ্যাম্পিয়ন।

কীসে বাবা বরদা?

কিপটেমিতে। আচ্ছা, আসি, আমার কিছু করার নেই কিন্তু।

দাঁড়াও দাঁড়াও। অত চটো কেন? জনার্দনের পরিবারকে সব ফিরিয়ে দিলে কিছু হবে?

মনে হয় হবে। তারপর আমি তো আছিই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নয়নচাঁদ বললেন, তাহলে তাই হবে বাবা।

অমাবস্যার আর দেরি নেই। মাঝখানে মোটে সাতটা দিন। নয়নচাঁদ জনার্দনের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ঘটিবাটি এবং সোনাদানা সবই তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। জনার্দনের বউ আনন্দে কেঁদে ফেলল। ছেলেমেয়েগুলো বিহ্বল হয়ে গেল।

বরদা নয়নচাঁদকে বললেন, আজ রাতে রুটির বদলে ভালো করে পরোটা খাবেন। সঙ্গে ছানার ডালনা আর পায়েস।

বলো কী?

যা বলছি তাই করতে হবে। আপনার প্রেসার খুব লো। শকটাক খেলে মরে যাবেন।

তাই হবে বাবা বরদা। যা বলবে করব। শুধু প্রাণটা দেখো।

নয়নচাঁদ পরোটা খেয়ে দেখলেন, বেশ লাগে। কোনোদিন খাননি। ছানার ডালনা খেয়ে আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। আর পায়েস খেতে খেতে পূর্বজন্মের কথাই মনে পড়ে গেল তাঁর। না, পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই।

সকালবেলাতেই বরদা জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন।

এই যে নয়নচাঁদবাবু, কেমন লাগছে?

গায়ে বেশ বল পাচ্ছি বাবা। পেটটাও ভুটভাট করছে না তেমন।

আপনার কাছারি ঘরে বসে তাগজপত্র সব দেখলাম। আরও দশটা পরিবার আপনার জন্য পথে বসেছে। তাদের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিলে কেসটা হাতে রাখতে পারব না!

বলো কী বাবা বরদা? এরপর আমিই পথে বসব।

প্রাণটা তো আগে।

কী আর করেন, নয়নচাঁদ বাকি দশটা পরিবারের যা কিছু দেনার দায়ে দখল করেছিলেন তা সবই ফিরিয়ে দিলেন। মনটা একটু দমে গেল বটে, কিন্তু ঘুমটা হল রাত্রে।

অমাবস্যা এসে পড়ল প্রায়। আজ রাত কাটলেই কাল অমাবস্যা লাগবে।

সন্ধ্যেবেলা বরদা এসে বললেন, কেমন লাগছে নয়নচাঁদবাবু, ভয় পাচ্ছেন না তো!

ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি বাবা।

ভয় পাবেন না। আজ রাতে আরও দুখানা পরোটা বেশি খাবেন। কাল সকালে যত ভিখিরি আসবে কাউকে ফেরাবেন না। মনে থাকবে?

নয়নচাঁদ হাঁপ—ছাড়া গলায় বললেন, তাই হবে বাবা, তাই হবে। সব বিলিয়ে দিয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাব, যদি তাতে তোমার সাধ মেটে।

পরদিন সকালে উঠে নয়নচাঁদের চক্ষু চড়ক গাছ। ভিক্ষে দেওয়া হয় না বলে এ বাড়িতে কখনো ভিখিরি আসে না। কিন্তু সকালে নয়চাঁদ দেখেন, বাড়ির সামনে শয়ে শয়ে ভিখিরি জুটেছে। দেখে নয়নচাঁদ মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভাঙার পর বেজার মুখে উঠলেন। সিন্দুক খুলে টাকা বের করে চাকরকে দিয়ে আনালেন। ভিখিরিয়া যখন বিদায় নিল তখন নয়নচাঁদের হাজার খানেক টাকা খসে গেছে।

নয়নচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। হাজার টাকা যে অনেক টাকা!

দুপুরে একরকম উপোসকরেই কাটালেন নয়নচাঁদ! টাকার শোক তো কম নয়।

নিজের ঘরে শুয় থেকে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। যখন তন্দ্রা ভাঙল তখন চারদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। ঘরে কেউ আলো দিয়ে যায়নি।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে নয়নচাঁদ চ্যাঁচালেন, ওরে কে আছিস?

কেউ জবাব দিল না।

ঘাড়টা কেমন সুড়সুড় করছিল নয়নচাঁদের বুকটা ছমছম। চারদিকে কীসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে অদৃশ্যে। ফিসফাস কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

নয়নচাঁদ সভয়ে কাঠ হয়ে জানালাটার দিকেও চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ সেই অন্ধকার জানালায় একটা ছায়ামূর্তি উঠে এল।

নয়নচাঁদ আর সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তেড়ে উঠে জানালার কাছে যেয়ে বললেন, কেন রে ভূতের পো, আর কোন পাপটা আছে আমার শুনি? আর কোন কর্মফল বাকি আছে? খোড়াই পরোয়া করি তোর?

একটা টর্চের আলোয় ঘরটা ভরে গেল হঠাৎ জানালার বাইরে থেকে বদচারণ বললেন, ঠিকই বলেছেন নয়নবাবু। আপনার আর-পাপ-টাপ নেই। ঘাড়ও কেউ মটকাবে ন। অমাবস্যা একটু আগে ছেড়ে গেছে।

বটে?

তবে ফের অমাবস্যা আর কতক্ষণ? এবার থেকে যেমন চালাচ্ছেন তেমনিই চালিয়ে যান। সকালে ভিখিরি বিদেয়, দুপুরে ভরপেটখাওয়া, বিকেলে দানধ্যান সৎচিন্তা, রাত্রে পরোটা, মনে থাকবে?

নয়নচাঁদ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, থাকবে বাবা থাকবে।

হস্তদন্ত

তারাপদ রায়

সমস্যার পর সমস্যা।

অস্থির হয়ে পড়েছেন হরেন মিত্র। এতই অস্থির হয়েছেন তিনি যে এক-এক সময় আশঙ্কান্বিত বোধ করছেন, পাগল না হয়ে যাই।

না, এখনও পাগল হয়ে যান নি তিনি। কিন্তু এত সমস্যার ধাক্কা সামলানো সহজ নয়।

বিপদ আর সমস্যা কখনো একা আসে না। এক সমস্যার ঘাড়ে এসে আরেক সমস্যা চেপে বসে। ঘরের দেয়ালের দিকে তাকালেন হরেনবাবু, সেখানে ইস্কুলের একটা বাতিল ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো আছে। সেখানে এখনও ঝকঝক অক্ষরে লেখা আছে 'ন্যালাখ্যাপা',সেই ন্যালাখ্যাপার সমস্যা না মিটতেই এখন ঘাড়ে এসে পড়েছে 'হস্তদন্ত।'

হরেববাবুর বর্তমান বৃত্তান্ত আরম্ভ করার আগে হরেন মিত্র লোকটির ইতিহাসও একটু বলে নিই।

হরেন মিত্র সম্পর্কে 'লোকটি' বলা অবশ্য সঠিক হল না। হরেনবাবু কিছুদিন আগেও কলাখোপা রামসুন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বাড়ির অবস্থা খারাপ নয়। বাগুইহাটিতে পৈতৃক বাড়িতে থাকেন। পঞ্চাশের এদিকে বয়েস, বিয়ে করেননি। সংসার চালাবার দায় বা ঝমেলা নেই। এই বাড়িতেই তাঁর দুই ভাইপো থাকে। তাদের আলাদা আলাদা হেঁসেল, বিয়ের পর বউদের মধ্যে সদাসর্বদা খিটিমিটি লাগায় হরেনবাবুই মধ্যস্থতা করে তাদের ভিন্ন করে দিয়েছেন। এতে অবশ্য পরবর্তী কালে হরেনবাবুরই সুবিধে হয়েছে। দুই ভাইপোর হেঁসেলে এক মাস করে অনুগ্রহণ করেন, বিনিময়ে তাদের কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

শিক্ষক-জীবনে হরেনবাবু অত্যন্ত মারকুটে ছিলেন।

ছাত্রদের বেধড়ক পেটাতেন। শুধু তাই নয়। এক তরুণ কাজে নতুন যোগদান করেছিলেন। টি-শার্ট এবং জিনস পরা সেই শিক্ষকটি ক্লাসে ঢোকার মুখে, জীবনে প্রথম ক্লাশ নেওয়া তাই একটি সিগারেট টেনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনোবল সংগ্রহ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় নেই নতুন শিক্ষককে হরেনবাবু আগে দেখেননি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধুমপানরত অবস্থায় তাঁকে দেখে ছাত্রভ্রমে হরেনবাবু তাঁর কান ধরে বারান্দা ওপরে নিল ডাউন করিয়ে দেন।

এই ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে হরেনবাবুকে শিক্ষকতার চাকরিটি মানে মানে ছাড়তে হয়। কিছু প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ছিল, সামান্য পেনশনও পাবেন। তাতে মোটামুটি চলে যাচ্ছে।

তা ছাড়া হরেনবাবু নতুন একটা কাজ জোগাড় করেছেন। তাঁর পাড়ায় কলেজ স্ট্রিটের একজন প্রকাশক আছেন। সেই প্রকাশকের বইগুলোর তিনি প্রুফ দেখে দেন।

প্রুফ দেখা খুব কঠিন কাজ। তবে হরেনবাবু একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং বানান সচেতন। তিনি খুব ভালো প্রুফ দেখেন। প্রকাশক মশায়েরও তাঁর ওপর খুবই আস্থা।

কিন্তু এই প্রুফ দেখতে গিয়েই যত বিপদ আর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বিপদ প্রকাশক মশায়ের যিনি পাড়ায় ভূতোবাবু নামে পরিচিত। ভূতাবাবু ছাপোষা মানুষ; বইয়ের ব্যবসা করেন। তবে তিনি তো পণ্ডিত লোক নন। তা ছাড়া খুব পণ্ডিত লোকও হরেনবাবুর কাছে সহজে পার পাবে না।

হরেনবাবুর যেটা সমস্যা, ভূতোবাবুর সেটাই বিপদ। প্রুফ দেখতে দেখতে কথায় কথায় সময়ে অসময়ে হরেনবাবু ভূতোবাবুর কাছে ছুটে আসেন।

মাসখানেক আগের একটা ঘটনা বলি।

রাত এগারোটা, ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ ঘন ঘন কলিংবেলের আওয়াজ জানালার খড়খড়ি তুলে ভূতোবাবু দেখেন সদর দরজায় ছাতা মাথায় হরেনবাবু দাঁড়িয়ে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে হরেনবাবুকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ভূতোবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার হরেনবাবু? এই বৃষ্টির মধ্যে, এত রাতে?

হরেনবাবু ভেজা ছাতটা দরজার এক পাশে রাখতে রাখতে বললেন, আপনার বনবিহারীবাবুর উপন্যাসের প্রুফটা দেখতে গিয়ে দারুন সমস্যায় পড়ে গেছি।

এই অসময়ে কী এমন সমস্যা হল? কপিতে কোনো গোলমাল? ভূতোবাবু ঘুমচোখে প্রশ্ন করেন।

হরেনবাবু বলেন, না, কপিতে কোনো গোলমাল নেই। কপি চমৎকার, কিন্তু ওই যে বনবিহারী লিখেছেন...ভুবন চক্রবর্তী মানুষটি একটু ন্যালাখ্যাপা গোছের।...তা এই ন্যালাখ্যাপা কথাটার মানে কী?

ভূতোবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, ডিক্সনারি দেখেছেন? সেখানে নেই?

হরেনবাবু বললেন, তা একটু আছে। কিন্তু শব্দটা এল কোথা থেকে?

বিরক্ত হয়ে ভূতোবাবু বললেন, তা যেখান থেকেই আসুক। বনহিহারীবাবু বড়ো লেখক, তিনি যখন শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আপনি প্রুফ দেখে ছেড়ে দিন।

হরেনবাবুর মাথায় যেন আকাশ পড়ল। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, এ কী বলছেন আপনি? আপনি একটা বই ছাপছেন, সেই বইয়ে এমন একটা শব্দ আছে, যেটা কোথা থেকে এসেছে আপনি কিছু জানেন না। এ হয় নাকি?

মধ্যরাতে আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! আপাতত হরেনবাবুকে এড়ানোর জন্যে ভূতোবাবু বললেন, ঠিক আছে, আমি-দু-একদিনের মধ্যে বনবিহারীবাবুর কাছ থেকে জেনে এসে আপনাকে বলব।

প্রশ্নটা শুনে বনবিহারীবাবু হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন। প্রবীন প্রতিষ্ঠিত লেখক, ভূতোবাবু তাঁকে আর ঘাঁটাতে সাহস পাননি। পাড়ায় এসে হরেনবাবুকে বলেছিলেন, বনবিহারীবাবুর আন্ত্রিক হয়েছে, নার্সিংহোমে আছেন। তাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

হরেনবাবু বললেন, খবরের কাগজ যে দেখলাম, বনবিহারীবাবু ভবানীপুর হিতসাধিনী সভার শতবর্ষ উৎসবে কালকেই সভাপতি হয়েছেন।

কোনো রকমে আমতা আমতা করে ভূতোবাবু বললেন, তারপরেই তো ঘটনাটা ঘটল। হিতসাধিনী সভার শতবর্ষ উৎসবে কালকেই সভাপতি হয়েছেন।

কোনো রকমে আমতা আমতা করে ভূতোবাবু বললেন, তারপরেই তো ঘটনাটা ঘটল। হিতসাধিনী সভার শেষে ওখানেই চা-শিঙাড়া-জিলিপি দিয়ে জলযোগ করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বমি, পেট ব্যথা। তারপরে ওই ভবানীপুরেই নার্সিং হোমে তাঁকে ভরতি করা হয়।

হরেনবাবু কী বুঝলেন কে জানে! ওই ন্যালাখ্যাপা শব্দ নিয়ে তিনি আর ভূতোবাবুকে জ্বালাতেন করেননি। সমস্যাঙ্কুল 'ন্যালাখ্যাপা' শব্দটি তিনি তাঁর ব্ল্যাকবোর্ডে তুলে দিয়েছেন।

এই ব্ল্যাকবোর্ডটির একটি ব্যাপার আছে। শিক্ষকতা থেকে স্বেচ্ছা-অবসরের পর ফেরাওয়েলের সময় তিনি ছাত্র বা শিক্ষকদের তরফ থেকে কোনো উপহার না নিয়ে বিদ্যালয়ে একটি পুরোনো ব্ল্যাকবোর্ড চেয়ে নেন।

তারপর সেই ব্ল্যাকবোর্ডটির নামকরণ করেন 'সমস্যা'। যেসব শব্দ নিয়ে সমস্যা হবে, সেগুলোর কোনো সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই লেখা থাকবে, যাতে সমস্যাটি সবসময় চোখের সামনে থাকে।

আজ সপ্তাহে চারেক 'ন্যালাখ্যাপা' শব্দটি ব্ল্যাকবোর্ড আলো করে রয়েছে। এরই মধ্যে গতকাল আবার 'হন্তদন্ত' যোগ হয়েছে।

তরুণ কবি মোজাম্মেল হকের নতুন কাব্যগ্রন্থটির নাম 'হন্তদন্ত'। নাম কবিতাটিও 'হন্তদন্ত'। বইটি ভূতোবাবুর প্রকাশ করছেন।

নাম কবিতাটি এইভাবে আরম্ভ হয়েছে,

'হসন্তগুলো কোথায় পালাল
হন্তদন্ত তদন্ত করা ভালো।'

বইয়ের নাম, কবিতার নাম, তার ওপরে প্রথম দ্বিতীয় পঙক্তিতে আবার হন্তদন্ত, সব মিলে হরেনবাবুকে বিপর্যস্ত করে দিল।

ন্যালাখাপার সমসা না মেটার তিনি অন্য কোনো সমস্যার জড়িত হতে চাইছিলেন না। কিন্তু উপায় নেই 'হন্তদন্ত' তাঁর ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। সঙ্গে অনেক প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে।

লোকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। এসে বলে, আজ ব্যাপারটা একটা হন্তদন্ত করতে চাই। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে হরেনবাবু ভাবেন, এই দুই হন্তদন্তের মানে তো এক হতে পারে না।

আর শেষ পর্যন্ত মানে যাইহোক, হন্তদন্ত কথাটা তৈরি হল কী করে? মনের গভীরে প্রশ্নর বুদ্ধদ উঠছে তো উঠছেই, শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে হরেনবাবু ন্যালাখ্যাপার নিচে লিখলেন হন্তদন্ত।

ইচ্ছে করলে এখন তিনি ভূতোবাবুকে গিয়ে ধরতে পারেন, কবি মোজাম্মেলের কাছ থেকে জেনে আসার জন্যে হন্তদন্তের ব্যাপারটা। কিন্তু তাঁর ওপরে হরেনবাবুর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু ন্যালাখ্যাপা নয়, তারপরেও অর্ধচন্দ্র, হাঁড়িকাঠ এবং গোঁফ খেজুর নিয়ে ভূতোবাবু রীতিমত বিশ্বাসঘাকতা করেছেন।

তবে এগুলো সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারেনি। কলাখোপা ইস্কুলে গিয়ে পেনশনের তাগাদা দেওয়ার সময়ে স্কুলে লাইব্রেরি থেকে পুরোনো আমলের অতিকায় বাংলা অভিধান থেকে এগুলোর অর্থ ও বুপত্তি পেয়ে গেছেন এবং সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কয়েকদিন আগে জগাখিচুড়ির পাল্লায় পড়েন হরেনবাবু অথচ জগাখিচুড়ির ব্যাপারটা খুব সহজে সমাধান হয়েছিল।

'জগাখিচুড়ি' হাসির গল্পের পাঁচ নম্বর লেখক গয়ারাম দাসের আশু প্রকাশিতব্য গল্প সংকলন। হাসির গল্পের লেখকদের নম্বর ফুটবলের নম্বরের মতো। যত বড়ো লেখা তত বেশি নম্বর, পাঁচ হল সব চেয়ে বড়ো নম্বর।

'জগাখিচুড়ি' বইটার প্রুফ হাতে পেয়ে গয়ারামবাবুকে পাড়ার বুথ থেকে ফোন করেছিলেন হরেনবাবু। গয়ারাম তাঁর পুরোনো বন্ধু, এক সময়ে কলাখোপা ইস্কুলে, তিনি ড্রিল মাস্টার ছিলেন। সেই সঙ্গে সংস্কৃত্বে সেকেন্ড পণ্ডিত। সংস্কৃতি উঠে গেল, ড্রিল উঠে গেল। গয়ারাম মনের দুঃখে মাস্টারি ছেড়ে হাসির গল্প লিখতে লাগলেন।

গয়ামের সঙ্গে হরেনবাবু বন্ধুত্ব আজও হয়নি। গত বছরই গয়ামের মেয়ের বিয়েতে তিনি নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছেন। গয়ারামকে ফোন করামাত্র তিনি হরেনবাবুকে জগাখিচুড়ির বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত করে ফোনেই শোনালেন।

জগা নামে এক পাগল থাকত কালীঘাট মন্দিরের চত্বরে। তার হাবভাব পাগলদের মধ্যে ছিল অতি অস্বাভাবিক। কোমরে খাপরির তলোয়াড়, হাতে বাঁশের তিরধনুক, কপালে কাঁঠালপাতার মুকুট—সে সবসময় বীর রাজার বেশে থাকত। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা কালীঘাট বাজারের সবজি আর মুদি দোকানিদের কাছ থেকে অল্প করে সবজি-চাল-ডাল-নুন-মশলা চেয়ে নিত। ভালো খারাপ নানা রকম চাল,

মুগ-মসুর-ছোলা সবরকম ডাল, কচু থেকে কাঁজকলা, ফাটা আলু, শুকনো বেগুন যে যা দিত—তাই জগা নিয়ে ঝুলিতে ভরত। তারপর রাতে ইটের উনুনে বিরাট মাটির হাঁড়িতে সব মিলিয়ে রান্না হত। সেই খিচুড়ি মন্দিরের সব ভিখিরির সঙ্গে ভাগ করে জগা খেত।

সেই থেকে জগাখিচুড়ি। জগাখিচুড়ি নাকি ছিল অতি উপাদেয়। গয়ারাম আরও বলেছিলেন যে ওই জগা ছিল সাধুপুরুষ, নিজের মৃত্যুর কথা সে বুঝতে পারে। সেদিন রাতে জগাখিচুড়ি রেঁধে সবাইকে খাইয়ে সে মন্দিরের সামনে কাঠের তলোয়াড় নিয়ে একা একা লড়াই শুরু করে আর গলা খুলে গান গাইতে থাকে,—

'যম জিনিতে যায় রে জগা
যম জিনিতে যায়।'

সেই রাতেই জগা মৃত্যুবরণ করে।

জগাখিচুড়ির কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হরেনবাবু। সামান্য একটা চালু কথার পিছনে কত বড়ো গল্প। সেই থেকে তাঁর আরও ঝোঁক বেড়ে গেছে সব গোলমেলে শব্দের মমার্থ জানার।

অবশ্য ন্যালাখ্যাপা শব্দটা এর পর প্রায় ঘাড়ের থেকে নামিয়ে দিয়েছেন হরেনবাবু। ধরে নিয়েছেন ওটাও ওই জগাখিচুড়ির মতো ন্যালা নামে কোনের খ্যাপার ব্যাপার।

কিন্তু এখন হন্তদন্ত ঘাড়ে ভূতের মতন চেপেছে। হরেনবাবু কলাখোপা ইস্কুলে গিয়ে সুবল চন্দ্র মিত্রের 'বাঙ্গালা অভিধান, খুঁজে এসেছেন। সেখানে হন্তদন্ত নেই। ভুতোবাবু কাছে জিজ্ঞাসা করেও কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া আগেই বলেছি, তাঁর ওপরে এখন আর হরেনবাবু বিশ্বাস নেই। অবশ্য কবি মোজাম্মেল হককে গিয়ে ধরা যেতে পারে। কিন্তু হয়তো দেখা যাবে, সে ছোকরাও কিছু জানে না। তার কবিতাগুলোর গ্রুফ দেখার সময়েই হরেনবাবুর মনে হয়েছিল এই ব্যক্তি অনেক কিছু না বুঝে অনুমান লিখেছে।

দিশেহারা হয়ে গেছেন হরেনবাবু। এই অবস্থায় একদিন অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে গিয়ে একটা ইটে হোঁচট খেয়ে রাস্তার মুখ থুবড়েড় পড়ে গেলেন হরেনবাবু। পথের লোকজন তাঁকে টেনে তুলে পাশের ডাক্তারখানার নিয়ে গেল।

পাড়ার মধ্যেই, ডাক্তারবাবু চেনা। তিনি ভালো করে দেখলেন। সামনের একটা দাঁত ভেঙে আর ঠোঁটটা একটু কেটে গেছে। ওষুধপত্র দেওয়া হল।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি আপনাকে মাঝমধ্যেই দেখি, রাস্তা দিয়ে এমন অন্যমনস্ক চলাফেরা করেন। সর্বক্ষণ এত কী ভাবেন মশায়?

ভাঙা দাঁতের গোড়ার জিব বুলিয়ে হরেনবাবু বললেন, একটা শব্দের মানে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি।

ডাক্তারবাবু বললেন, শব্দের মানে নিয়ে চিন্তা? কী সে শব্দ?

হরেনবাবু বললেন, 'হন্তদন্ত'।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'হন্তদন্ত'! এই শব্দ নিয়ে এত মাথাব্যাথা? আপনি নিজেই এখন হন্ত দন্ত। হন্ত মানে হত, দন্ত মানে দাঁত, পুরো মানে আপনার দাঁত হত হয়েছে।

হরেনবাবু অবাক। ডাক্তারবাবু কত সহজে শব্দটার মানে ধরতে পেরেছেন। ফাটা ঠোঁট আর ভাঙা দাঁতের দুঃখ ভুলে নিশ্চিন্ত মনে তিনি বাড়ি রওনা হলেন।

বাঘ

মনোজু বসু

বনকাপাসি গ্রামে এরকম অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কোনো দিন ঘটে।

সকালবেলা তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে মহাশয় গাড়ু হাতে বাঁশবাগানের মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন কেঁদো বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্যে গাড়ু ফেলিয়া তিন লাফে বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। ডাকটা কোন্ দিক হইতে আসিয়া তাহা সঠিক সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। কোন্ দিকে যে চূড়ান্ত নিরাপদ জায়গা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল জাল কাঁধে ছিদাম মালো উত্তর-মুখো বিলের দিকে চলিয়াছে।

—শুনিস নি ছিদাম?

ছিদাম কিছু শুনিতে পায় নাই।

—শেষকালে দিনমানেও কেঁদো ডাকতে আরম্ভ করলো!

কথার মাঝখানেই পুনরায় বাঘের ডাক এবং যেন আরও একটু নিকটে।

ছিদামের মাছ ধরা হইল না, ফিরিল, পা-গুলি একটু ঘন ঘন ফেলিয়াই। বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের বয়স হইয়াছে এবং বাতের দোষ আছে তিনি তো দৌড়াইতে পারেন না,—কোনোগতিতে মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, একপাশে পাইক নিমাই হুঁকা শোলক করিতেছে এবং ভিতরে মিত্তিরের সেজো ছেলে বুধো তারক চক্কোত্তির সঙ্গে দাবা খেলিতেছে। বাঁড়ুজ্যে বাঘের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিনজনেই জোয়ান। বুধো এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর হইতে সড়কি বাহির করিয়া আনিল, নিমাই পাইক লইল তাহার তাহার পাঁচহাতি লাঠি, এবং হাতের কাছে জুতসই আর কোনো অস্ত্র না দেখিয়া তারক চক্কোত্তি একটানে একটা বড়ো ডাল ভাঙিয়া কাঁধে করিল। তিন বীরপুরুষ বাহির হইয়া পড়িল—আগে তারক, মাঝে বুধো, শেষ নিমাই।

ঐ-ঐ আবার বাঘ ডাকে!

একেবারে পাড়ার মধ্যে! দিঘির পাড়ে কিংবা হলুদ ভুঁইয়ের মধ্যে। সর্বনাশ—দিন দুপুরে হইল কী! তারক পিছাইয়া পড়িল। মাত্র জিওলের ডাল সম্বল করিয়া গোঁয়ার্তুমিটা কিছু নয়। নিমাই কহিল—ফেরা যাক সেজো কর্তা, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনি।

বুধো তাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু আর আগাইল না, সড়কিটা শক্ত ধরিয়া সন্তর্পণে সেখানে দাঁড়াইল।

ঐ—ফের!

একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমবাগানের আড়ালে—দশ হাতও হইবে না। বাবারে! তারেক ও নিমাই দৌড় দিলো। বুধা একা একা কী করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে মোড় ঘুরিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—

বাঘ নয়, দুজন মানুষ!

একজনের মাথায় উপরে চৌকা লালচে রঙের কাঠের বাক্স, বাক্সর উপর গামছায় বাঁধা পুটুঁলি। অপরের বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে অবিকল ধুতুরাফুলের মতো গড়নের বৃহদাকার একটি চোঙা। সেই চোঙা এক-একবার মুখে লাগাইয়া শব্দ করিতেছে, আর যেন সত্যকার বাঘের আওয়াজ হইতেছে।

বুধো লোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের উঠানে দাঁড়াইল।

বাঁড়ুজ্যে তখনও ছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও দু-চারজন জুটিয়াছে। বাঘের গল্প হইতেছে—পাঠশালায় পড়িবার সময় একবার বাঁশের বাড়ি দিয়া মিত্তির একটা গো—বাঘার সামনের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন—সেই সব অনেক কালের কথা। গল্প ভালো জমিয়াছে, এমন সময় উহারা আসিল।

—কী আছে তোমার ওতে?

—গ্রামোফোন—গান আছে, এক্‌টো আছে, সাহেব-মেমের হাসি—একেবারে যেন ঠিক সত্যি, ছাদ ফেটে যাবে মশাই।

বাঁড়ুজ্যে বলিলেন—তুমি আর নতুন কী শোনাবে বাপু! আমাদের এই গাঁয়ে যাত্রা বলো আর ঢপ-কবি বৈঠকি বলো, কোন কিছুই বাকি নেই। গেল বারেও ঠাকুরবাড়ি যাত্রা হয়ে গেল—নীলকণ্ঠ দাসের দল। নীলকণ্ঠ দাসের নাম শোনো নি হাকোবার নীলকণ্ঠ?

রাম মিত্তির বলিলেন—সাহেব-মেম তো ইংরাজিতে হাসে। ও ইংরাজি-মিংরাজি আমরা কেই বুঝতে পারবো না। তবে গান-এক্‌টো,—তা তুমি কি একলাই সব করো? কিসের দল বললে তোমরা?

চোঙা হাতে লোকটি বলিল—গ্রামোফোন—কলের গান। আমি কিছু করবো না মশাই, সব এই কল দিয়ে করাবো।

বলিয়া সে সঙ্গীর মাথায় বাক্সটি দেখাইল।

প্রিয়নাথ থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল। গ্রাম সুবাদে রাম মিত্তিরের ভাইপো বলিয়া তাহার সামনে তামাক খায় না। একটা শেষ টান মারিয়া

একটু আগাইয়া হুঁকাটা আশ্বিনী শীলের হাতে দিয়া সে বলিল—তোমার ঐ বাক্স এক্‌টো করবে? কাঠ কখনও কথা কয়? মন্তোর-তন্তোর জানো নাকি?

বামুন পাড়ার নিত্যাঠাকরুণ দিঘির ঘাটে স্নান করিয়া ঘড়া কাঁথে ঘটি হাতে সবেগে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পথের সকল অশুচিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কথাটা তাঁহার কানে গেল। মন্ত্র থামাইলেন না, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তান্তটি শুনিলেন।

এ পাড়া ও পাড়ায় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল—মিত্তিরবাড়ি এক আশ্চর্য কল আসিয়াছে তাহা মানুষের মতো গান ও এক্‌টো করে। খুকিরা এবং যেসব ছেলে পাঠশালায় যায় না, সকলেই ছুটিয়া। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা অবশ্য এমন গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করিল না—তবু দেখিতে গেল।

চোঙাওয়ালা লোকটার নাম হরসিত—জাতে পরামানিক। উঠানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু নিতান্তই নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতেছে ঃ এতো যে লোক জমিয়াছে তাহার যেন নজরেই আসিতেছে না। চক্কোত্তিদের বুঁচি খানিক আগে আসিয়াছে। আঙুল দিয়া টেপিকে দেখাইয়া দিলো, ঐ সেই কল। কিন্তু টিপকে বোকা বুঝাইলেন হইল! ছোট চৌকা কাঠের বাক্স—উহাই নাকি আবার গান গায়। যাঃ!

সকলে রাম মিত্তিরকে ধরিয়া বসিল—তুমি কায়েতদের সমাজপতি, এ গান তোমাকে দিতে হবে। রাম মিত্তিরের হইয়া সকলে দর কষাকষি আরম্ভ করিল। টাকায় আটখানি করিয়া গান, দু টাকায় সতেরো খানা অবধি হইতে পারে—তার বেশি নয়। এক্‌টোর দর অন্যত্র হইলে বেশি হইত। কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন বলিতেছেন, তখন তা আর কাজ নাই। মোটের উপর হরসিতের বিবেচনা আছে। এক টাকায় নয়খানি রফা হইল।

তখন পকেট হইতে একটা চক্‌চকে গোলাকার বস্তু, হাতল, কাঁটার কৌটা প্রভৃতি বাহির করিয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া চৌকা বাক্সে হরসিত সেগুলি পরাইয়া ফেলিল, চোঙাটিও বাক্সের গায়ে বসাইল। তারপর গামছার পুঁটুলি খুলিয়া হাত-আয়না, চিরুনি ও কাপড় সরাইয়া বাহির করিল কারো পাতলা পাথর—

কাহারও আর নিঃশ্বাস পড়ে না।

হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—বায়নার টাকা দিন। অগ্রিম দেবেন না, বলেন কী মশাই? আমার সাহেববাড়ির কল—

থালায় করিয়া টাকাটি ঠিক আসেবের মধ্যস্থলেই রাখা হইল, যে-যে পেলা দিতে চাহিবে, তাহাদের কাহাও যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়। তারপর হরসিতে কলের উপর একখানা পাথর বসাইয়া টিপিয়া দিলো, আর পাথর চরকির মতো ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই ঘুরন্ত পাথরে যেই আর-একটা মাথা বসাইয়া দেওয়া, অমনি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল তবলা, বেহালা, ইংরাজি বাজনা, ঢোল, করতাল—বোধকরি পৃথিবীতে সুর-যন্ত্র যা কিছু আছে সবগুলিই।

ইতিমধ্যে হৈ হৈ করিয়া একপাল ছেলে আসিয়া পড়িল, এই উপলক্ষে পাঠশালা ছুটি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেরা আর কতটুকু গণ্ডগোল করিতে পারে? কলের

মধ্যে যেন এককুড়ি পাঠশালার একত্রে সমস্বরে নামতা পাঠ হইতেছে। হাঁ—কল যে সাহেববাড়ির, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরসিত বলিয়াছিল—ছাত ফেটে যাবে, সেটাই বুঝি সত্য-সত্য ঘটিয়া বসে!

কিন্তু এত যে গোলযোগ, পাথরখানা বদলাইয়া দিতেই চুপচাপ। ক্রমশ শোনা গেল চোঙের ভিতর হইতে একলা, গলায় গীত হইতেছে—ধিনতা ধিনা পাকা নোনা। একেবারে স্পষ্ট আর অবিকল মানুষের গলা। মানুষ দেখা যায় না, অথচ মানুষই গাহিতেছে।

মন্টুর অনেকক্ষণ হইতে মনে হইতেছিল, ঐ চোঙের ভিতর কাহারা বসিয়া বাজাইতেছে—ঠিক তাহার বুড়ো দাদু যেমন দুলিয়া দুলিয়া তেহাই দিয়া থাকেন, তেমনি আবার তেহাই দেয়। এবারে গান শুনিয়া তাহার আর একফোঁটা সন্দেহ রহিল না।

চোঙের অধিবাসী সেই গায়ক ও বাদক-সম্প্রদায়কে দেখিতে ছেলেদের দল ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু কলের ভিতর হরসিত এমনি করিয়া দলসুদ্ধ পুরিয়া ফেলিয়াছে যে কাহাকেও দেখিবার জো নাই।

বাঁড়ুজ্যে ঠিক সামনে বসিয়াছেন। গান-বাজনার আসবে এই স্থানটি তাঁহার নিত্য কালের। বনকাপাসিতে কত মজলিস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ওস্তাদ তো একজনও আসিল না যে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের পায়ের ধুলা না লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল।

প্রিয়নাথ বলিল—ও বাঁড়ুজ্যে মশায়, গান-বাজনায় চুল তো পাকালেন, কত গানই গেয়ে থাকেন, এমন সুর-লয় শুনেছেন কখনও? নাপতের পো ডাকিনী-সিদ্ধ, অপ্সরী-কিন্নরী ধরে এনে গান গাওয়াছে যেন।

গানের পর গান চলিল। একটা গানের একজায়গায় ভারি তানের প্যাঁচ মারিতেছিল। অশ্বিনী শীল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল—কী কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি! দেবতা-টেবতা-বেহ্ম-বিষ্টুর চেয়ে ওরা কম কিসে? বাঁড়ুজ্যে মশায়, আপনার সেতারের টুং-টুং আর রামপ্রসাদীগুলি এবার ছাড়ুন।

কলের বলবান রাগিনীর তলায় অশ্বিনীর গলা চাপা পড়িল, বাঁড়ুজ্যে তাহার সদুপদেশ তাহার সদুপদেশ শুনিতে পাইলেন না।

কিন্তু বাঁড়ুজ্যের আর কী আছে ঐ সেতারের ঐ সেতারের টুং-টুং ছাড়া চকমিলানো পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে—চাম্‌চিকার বসতি। সেখানে থাকিবার লোক তিনটি—মন্টু, তার দিদিমা এবং তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে স্বয়ং। নারীণীও ছিল—সেই সকলের শেষ। সাত বছর আগে মন্টুকে ছমাসের এতটুকু রাখিয়া সেও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ছয় ছেলের মা বাঁড়ুজ্যে গিন্নি একে একে সব কয়টিকে বিসর্জন দিয়া এই শেষের ধন মরা-মেয়ের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পাড়ার সকলে আসিয়া আর সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু বাঁড়ুজ্যের চোখে জল নাই। রাম মিত্তির কাঁদ কাঁদ গলায় কহিলেন—বুক বাঁধো বাঁড়ুজ্যে, ভগবানের লীলা। তখন বাঁড়ুজ্যে স্ত্রী-কে দেখাইয়া বলিলেন—ঐ যে অবুঝ

মেয়েমানুষ উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, ওকে গিয়ে তোমরা প্রবোধ দাও—আমার কাছে আসতে হবে না, ভাই। শুধু তিনি তাকের উপর হইতে সেতারটি নামাইয়া দিতে বলিলেন।

এতকাল বাদে কিনা অশ্বিনী শীল তাঁহাকে সেতার বাজনা ছাড়িয়া দিতে বলিল।

এক একটা গান হইয়া গেলে হরসিত কাঁটা বদলাইয়া আগের কাঁটা ফেলিয়া দিতেছিল। তাই কুড়াইতে ছেলেমহলে। কাড়িকাড়ি! একবার আর একটু মন্টু কলের উপর গিয়া পড়িত। হরসিত তাড়া দিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্যে মন্টুকে ডাক দিলেন—তুই দাদু আমার কাছে আয়—এসে ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো!

নারীণীর সেই ছয় মাসের মন্টু কত বড়ো হইয়াছে!

কিন্তু মন্টু আসিল না উহার অনেক কাজ। কাঁটা কুড়ানো তো আছেই, গানও লাগিতেছে বড়ো ভালো। তাছাড়া চোঙের ভিতর বসিয়া যে গায়ক গাহিতেছে, তাহার মূর্তি-দর্শন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ এখনও ঘটে নাই।

যখন ভালো করিয়া বুলি ফুটে নাই, বাঁড়ুজ্যে তখন হইতে মন্টুকে তবলার বোল শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় রাম মিত্তির প্রভৃতি দু-চারজন বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি গিয়া বসেন। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি-বাদলা এক একদিন এমন চাপিয়া পড়ে সে কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। পারুক, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা ঘটে না। সেদিন মন্টুর সেতার—শিক্ষা আরও বিপুল উদ্যাম চলে। ভারি তাল কাটে, লজ্জা পাইয়া মন্টু বলে—বুড়োদাদা, আজ আর হবে না, ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুম পাইলেই হইল! লাউয়ের খোলের ভিতর হইতে সুর আদায় করা সোজা কর্ম নয়।

অশ্বিনী পাল বনকাপাসির সুবিখ্যাত সংকীর্তনের দলে খোল বাজাইয়া থাকে। উল্লসিত হইয়া সে পুনশ্চ বলিয়া উঠিল—আজই বাড়ি গিয়ে খোলের দল ছিঁড়ে খড়মে লাগাবো। মরি মরি,—কী কীর্তনটাই গাইল রে! আমাদের গানের পরে আজ ঘেন্না হয়ে গেল।

রাম মিত্তির ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—মন দিয়ে শুনেছো বাঁড়ুজ্যে? অন্তরার দিকটায় তালে গোলমাল করে গেল না?

বলিয়াছিল বটে আমির খাঁ ওস্তাদ—বাঁড়ুজ্যিবাবুর কান ডাল কুত্তার মাফিক। খাঁ সাহেব অনেক কায়দা করিয়াও বাঁড়ুজ্যের কানকে ফাঁকি দিতে পারে নাই, কারচুপি ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লিওয়ালা আমির খাঁ অবধি ভুল করিতে পারে, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য কাঠের বাক্সর গানে একবিন্দু খুঁত ধরিবার জো নাই। রাম মিত্তির তালের কিছু বোঝেন না, তিনি কথা বলিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বাঁড়ুজ্যে কী ভুল ধরিবেন?

বিকালেও আর এক বাড়ি বায়না—কামারপাড়ায়। মন্টু শুনিতে গিয়াছে, বাঁড়ুজ্যের মাথাটা কেমন টিপ টিপ করিতেছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই।...আধঘুমের মধ্যে বাঁড়ুজ্যের মনে হইল, কে যেন আসিয়া কপাল টিপিয়া দিতেছে আর ডাকিতেছে—বাবা! মেজ ছেলে মানিকের গলা না? দশ বছরেরটি হইয়াছিল। গোলাঘাটার বড়ো ইস্কুলে পড়িতে যাইত। কিন্তু মানিক নয়, মানিক

গিয়াছে ঘুড়ি উড়াইতে—নারাণী-নারাণী। নারাণী ডাকিতেছে—বাবা, বাঘ এয়েছে—খোকাকে ধরলো যে! নারাণী মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। ঘরের মধ্যে বাঘ? সেতারের তাল কাটিয়া গেল। মারো সেতারের বাড়ি বাঘের মাথায়—মারো-মারো। মন্টুকে ছাড়িয়া বাঘ সেতার কামড়াইয়া ধরিল, তার ছিঁড়িল, চিবাইয়া চিবাইয়া আগাগোড়া একেবারে তছনছ। তা যাক, মন্টু কই—মন্টু, মন্টু! বাঁড়ুজ্যে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—মন্টু!

মন্টু গান শুনিয়া ফিরিয়াছে। তাহার আর আনন্দ ধরিতেছিল না। বলিল—বুড়োদাদা তুমি গান শুনলে না—আমরা শুনে এলাম, দুই টাকার গান। এবেলা আরও খাসা খাসা। তুমি অমনি ভালো করে গাও না কেন দাদা?

বাঁড়ুজ্যে কহিলেন—ভালো গাইনে?

মন্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। তুমি গাও ছাই—বুধোকাকারা বলেছে।

বাঁড়ুজ্যে একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যেন কতো বড়ো রসিকতার কথা—প্রবলবেগে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—জানিস নে ও মন্টু, জানিস নে—ও যে কোম্পানি বাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা জুড়ে ওদের রাজ্যি, আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা পাই মোটে একান্ন টাকা সাত আনা—বলিতে বলিতে সেতারটা পাড়িয়া লইলেন।

মন্টু বলিল—সেতারে কতো ঝঞ্ঝাট, গান আপনা-আপনি বাজে। আমাকে একটা কলের গান এনে দিতে হবে।

বুঁড়ুজ্যে বলিলেন—দেবো, বুঝলি দাদু, কলের গান দেবো আর সেই সঙ্গে কলের হাত-পা-নাক চোখওয়ালা একটা নাতবৌ—কী বলিস?

বলিতে বলিতে গলাটা যেন বুজিয়া আসিল, তবু বলিতে লাগিলেন,—ওস্তাদের কতো গালাগালি খেয়েছি, সরস্বতী ঠাকুরণকে কতো চিনির নৈবিদ্যি খাইয়েছি। এখন আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। তোরা যখন বড়ো হবি মন্টু, ততদিনেন সরস্বতী দুর্গা কালী শালগ্রামটা পর্যন্ত কলের হয়ে যাবে। খুব কলের পুজো করিস।

সন্ধ্যা গড়াইয়া যায়। আজ বাঁড়ুজ্যে—বাড়ি কেহ আসে নাই। মন্টুও নাই। কেবলরাম মিত্তিরের খড়মের ঠকঠক সিঁড়িতে শোনা গেল।

—কী বাঁড়ুজ্যে, একা একা খুব লাগিয়েছো যে! সুরটা পুরবী বুঝি?

বাঁড়ুজ্যে তদ্‌গত হইয়া সেতার বাজাইতেছিল। বলিলেন—দোসর কোথায় পাই ভাই? চাঁদা তুলে ঠাকুরবাড়িতে আবার কলের গান দিচ্ছে—মন্টু গেছে সেখানে। একা একা বাজাচ্ছি—কেমন লাগছে বলো ত?

রামমিত্তির বলিলেন—এমন রেখে দাও, এসব ত রোজ শুনবো। চলো, ঠাকুরবাড়ি যাওয়া যাক। বাঁড়ুজ্যেকে লইয়া রাম মিত্তির ঠাকুরবাড়ির আসরে বসিলেন। হরসিতের কলে ইতিমধ্যে দু-খানা গান সারা হইয়া এক্‌টো শুরু হইয়াছে ঃ

কী করিলি অবোধ বালিকা?
সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান—

চেহারা ত দেখা যায় না, তবে হ্যাঁ—গলা শুনিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বক্তা ভীম, বারণ বা অন্ততপক্ষে তস্য পুত্র মেঘনাদ না হইয়া যায় না।

বাঁড়ুজ্যে বলিলেন—তুমি বাপু, একখানা পূরবী বাজাও তো?

হরসিত ঘোর প্যাঁচের মানুষ নয়, জবাব সোজা করিয়াই দিলো—হুকুম-টুকুম চলবে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান—আমার সাহবেবাড়ির কল।

অতএব সাহেববাড়র কলের যেরূপ অভিপ্রায় হইল, কনকাপাসির সমদুয় শ্রোতা তটস্থ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। ইহা আমির খাঁ ওস্তাদের মজলিস নয় যে ফরমায়েশ খাটিবে।

অকস্মাৎ-ঘটর-ঘটর-ঘ্যাস! গান থামিয়া গেল। কলের কোথায় কী কাটিয়া গিয়াছে। এতগুলি শ্রোতা বিরসমুখে বসিয়া রহিল। যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া হরসিত কাঠর বাক্সটা খুলিয়া আল্‌গা করিয়া ফেলিল।

কলের ভিতর মানুষ নাই, কেবল লোহালক্কড়।

হরসিত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মেরামত হইল না। তখন থালা হইতে বায়নার টাকা ও পেলার পয়সা তুলিয়া লইয়া উল্টোগাঁটে ভালো করিয়া গুঁজিয়া সে বলিল—রাত্তিরে আর নজর চলে না মশাই। সকালেই ঠিক করে বাকি গানগুলো শুনিয়া দেবো, কির্‌পা করে মশাইরা সকলে পদধূলি দেবেন।

ঠাকুরবাড়িতে গ্রামস্থ সকল মহাশয়েরই সকালে যতাসময়ে ভিড় হইল। কিন্তু হরসিত নাই, কলের গান নাই, এমন কী নিত্য ঠাকরুণের পিতলের ঘটিও নাই। জল খাইবার জন্য হরসিতকে ঘটিটি দেওয়া হইয়াছিল।

মামার বিশ্বকাপ দর্শন

দুলেন্দ্র ভৌমিক

বাতাসে ফুটবলের গন্ধ উড়তে আরম্ভ করলেই আমাদের বাড়িতে মামার উপস্থিতি অনিবার্য। বাবা বলতেন পাকা কাঁঠাল ভাঙলেই যেমন ভনভনিয়ে মাছি উড়ে আসে, তেমনই ফুটবল হলেই মামা হাজির। আমার এই ফুটবল খ্যাপা মামার সঙ্গে ইতোপূর্বে যাঁদের পরিচয় হয়েছে তাঁদের কাছে মামা সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। এবার মামা শুধু মামিমাকে সঙ্গে নিয়েই এলেন না, সঙ্গে আনলেন নবদাকে। নবদার পুরো নাম নবগোপাল বসু। কিন্তু ওই নামে তাকে বিশেষ কেউ ডাকে না। সব বয়সী লোকেরাই তাকে 'নবদা' বলে ডেকে আসছে। নবদা দূর সম্পর্কে আমাদের কেমন দাদা হয় সে নিয়ে আমরাও মাথা ঘামাইনি। আমরা নবদার গল্প শুনেতই আগ্রহী। মামা সম্পর্কে নবদা বলে, 'মামা ফুটবলের খ্যাপা। কিন্তু খেলাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না, বোঝাবার চেষ্টাও করে না।"

আর নবদা সম্পর্কে মামার মন্তব্য, "একটি বৃহৎ পাঁঠা। মুখে বুলি ফুটনের পর থেইক্যা সজ্ঞানে একটাও সাচা কথা কয় নাই। লোকে ব্যাঙ্ক থেইকা ওভারড্রাইফ্ট নেয়। নবটা মিথ্যার ওভারড্রাইফ্ট লয়।"

আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই প্রথম দু'জনকে আমাদের বাড়িতে একসঙ্গে পাওয়া গেল। মামা সম্পর্কে অনেকেই অল্পবিস্তর জানেন, কিন্তু নবদা সম্পর্কে তেমন কিছু অনেকেই জানেন না। সেই কারণে আমরা নবদাকে যেমন জানি তার কিছু পরিচয় দিয়ে রাখলে নবদাকে বুঝতে সুবিধে হবে। অন্তত কেউ ভুল বুঝতে না। নবদা একসময় দারুণ ফুটবল খেলত। মামার ভাষায় অবশ্য দারুণটা 'নিদারুণ'। খেলতে খেলতেই নবদা কলকাতার প্রথম ডিভিশনের একটা ছোট টিমে চান্স পেয়ে গেল। টিম যত ছোটই হোক, কলকাতার প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পাওয়া তো কম কথা নয়। নবদা অবশ্য বলেছিল, তাদের জনাইয়ের বাড়ির বারান্দায় দু হাঁড়ি মনোহরা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল, বাড়ির উঠোনে নকুড়ের কড়া পাকের সন্দেশ নিয়ে

মোহনবাগান আর বাড়ির সামনে যে লাউগাছের মাচা সেই মাচার নিচে হাঁড়িভর্তি মটন টিকিয়া নিয়ে মহমেডান স্পোর্টি হত্যে দিয়ে বসেছিল। কিন্তু নবদা টাকা এবং খাদ্যের লোভে আদর্শচ্যুত হয়নি। সবাইকে এক গ্লাস করে ঘোলের শরবত খাইয়ে করজোড়ে বিদায় করেছিল। বিদায়কালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডানের বিরুদ্ধে আমি অন্যদের দিয়ে গোল করাব কিন্তু নিজে কখনও গোল করব না।

নবদার এই কথা শুনে মামা মন্তব্য করেছিলেন, "নব একটা ব্যাপার সাচা কথা কইছে। প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। এক বছরই খেলছিল। মোট দশটা খেলায় মাঠে নাইম্যা আটবারের বেশি গায়ে বল ঠেকাইতে পারে না। তো চোখে বাইনাকুলার গোটা মাঠে ভাইগানারে খুঁজি। কোথায় আমার নব। হেই নব এক বছর কলকাতার মাঠে খেইলা পরে শুনি নিজের গ্রামে গিয়া কোচ হইয়া বইসে।"

নবদা নিজের গ্রামে এখন ফুটবলের কোচ। এইবারের বিশ্বকাপে নবদার নাকি ফ্রান্স থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যেতে পারেনি। না যাওয়ার কারণটাও বড় বিচিত্র। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে নিজের বাড়ির আমগাছ থেকে নাকি কিলো ওজনের একটা ডাঁসা ফজলি মাথায় পড়ে। সেই আঘাত এতই গুরুতর যে, সরকারি হাসপাতালে ফার্স্ট এড নিতে হয়েছিল। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা নবদার মাথা আর আম দুটোকে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, "এই জিনিস পড়েও আপনার মাথা ফাটেনি এটাই তো আশ্চর্য।"

নবদা বলেছিল, "আপনার ভুলে যাচ্ছেন, আমি, একজন ক্যালকাটা মাঠের ফুটবলার। মাথার যে-কোনও জায়গা দিয়ে হেড করতে পারতাম। একজন দক্ষ হেডার হিসেবে আমার সুনাম ছিল।"

আমরা বললাম, "তুমি কি শুধু এইজন্যেই গেলে না?

নবদা একবার মামার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "এ ছাড়া অন্য একটা কারণও ছিল। আফটার অল মামার রিকোয়েস্ট তো ফেলতে পারি না।"

আমরা সবাই আমর দিকে তাকালাম। মামা পানের ভেতর থেকে সুপুরির বড় কুচিগুলো বেছে বেছে ফেলে দিচ্ছিলেন। মামা আমাদের দিকে না তাকিয়েই বললেন, "সারা জীবনে গায়ে বল লাগাইতে পারলি না, তুই আবার হেডার। তবে আমার যদি টাকা থাকত, তাইলে তরে আমি ফ্রান্সে পাঠাইতাম। তার পক্ষে এখন কইলকাতার খেইতা ফ্রান্স নিরাপদ।"

নবদা ফুঁসে উঠে বলে, "ফ্রান্স নিরাপদ, কলকাতা নিরাপদ নয় কেন? তুমি কী বলতে চাইছ মামু?"

মামা পান মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বললেন, "ফ্রান্সে তো তরে কেউ চেনে না, তর ভাষাও বুঝব না। গ্যালারিতে বইস্যা তালিবালি কথা কইলেও ওরা কিছু করব না। মানে গ্যালারির মধ্যে কিল-চড় খাইয়া মরণের ভয় ছিল না। শুধু এইখানে আছে। তাই কই কি কথাটা কম কইস।"

নবদা সোফা থেকে দুম করে উঠে দাঁড়াল। কোমরে হাত দিয়ে বলল, "হোয়াট ডু ইউ মিন মামু? তুমি কী বলতে চাইছ?"

মামা পিচ করে পানের পিক ফেলে বলেন, "আগে ইংরাজি কয়, পরে আবার নিজেই অনুবাদ কইরা কয়। ভাইগনা, আমি খালি বলতে চাইতাছি, দিনকাল ভাল না। মানুষের সহনশীলতা বেজায় কইমা গ্যাছে। দ্যাশের দাদারা দিবা-রাত্র তালিবালি কথা কইতে আছে। তুই আর এর মইধ্যে ফুটবল লইয়া তালিবালি কথা কইয়া পথে-ঘাটে মাইর-ধইর খাইস না।"

নবদা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "জাস্ট ও মিনিট! এক মিনিট।"

ইংরেজি বলেই সঙ্গে বাংলা বলাটা নবদার স্বভাব। আমরা এবারে হেসে উঠতেই নবদা ধমকের সুরে আমাদের বললেন, "ডোন্ট লাফ। হেসো না।"

নবদা প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে একটা খাম বার করে মামার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "বল তো এটা কী?"

মামা খামটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা খাম।"

নবদা বেশ গর্বের গলায় বলল, "খামের কোনায় কী লেখা আছে?"

মামা খামটার কাছে চোখ এনে বললেন, "নবদিগন্ত। তুই কি নতুন ফ্ল্যান্ট কিনবি নাকি?"

নবদা বলল, "কেন? ফ্ল্যাট কিনব কেন?"

মামা বললেন, "ফ্ল্যান্ট বাড়ির কমপ্লেক্সগুলার ওইরকমই হয় কিনা।"

নবদা খামের ভেতর থেকে একটা চিঠি বার করতে করতে বলে, "এটা একটা সাপ্তাহিক কাগজের নাম। এই কাগজে বিশ্বকাপ নিয়ে আমাকে বিশেষজ্ঞর মতামত লিখতে হবে।"

মামা বিষম খেয়ে বললেন, "কাম সারছে। জনাই খেইক্যা তুইও ডাক পাইলি।"

নবদা চিঠিটা আমাদের দেখাতে দেখাতে বললেন, "এমনি পাইনি মামা। মনে রেখো, আমি কলকাতা মাঠের একজন এক্স ফুটবলার।"

মামা বললেন, "তরা আমারে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া। ভাগ্যিস এই দ্যাশে বাংলা কাগজ কম। যদি শ-তিনেক থাকত তাইলে তো বিশেষজ্ঞের আকাল পড়ত। তবে ওর একটা সুবিধা আছে।"

নবদা তার ব্যাগ থেকে বাদামি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বার করতে করতে বলল, "কিসের সুবিধে?"

মামা বললেন, "তুই তো সপ্তাহে একদিন লেখবি। রোজকার কাগজে রোজ যা লেখব, হেইগুলি দিব্যি টুইকা দিতে পারবি। লোক অত মনে রাখব না।"

আমি বললাম, "নবদা, তোমার ওই প্যাকেট কী আছে?"

নবদা বললেন, "চুইংগাম। টিভিতে খেলা দেখার সময় কাজে লাগবে।"

মামা সঙ্গে-সঙ্গে উঠলেন, "নব রে যে আমি পাঁঠা কই হেইটা সাধে কই। খ্যালব ওরা, আর নব চুইংগাম চাবাইয়া দাঁতের পাটি আলগা করব।"

নবদা মামার সামনে বসতে বসতে বলল, "অত হেলাফেলা কোরো না মামা। বিশ্বকাপ খেলাতে নিয়ে গেছেন যে কোচেরা আমি আমার যুক্তি আর লেখনীতে তাঁদের ফালা-ফালা করে ফেলব। ওঁদের প্রত্যেকটা ভুল আমি ধরে দেব।"

মামা বললেন, "এইডা তুই ভালই পারবি। অন্যের ভুল ধইয়া মুখে আর কলমে তুলাধুনা করতে বাঙালির চাইতে আর কেউ ভাল পারে না। ভাইগনা, তুই বাঙালির মান রাখ। বিশ্বকাপের আসর থেইকা আমরা কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকলেও ঘরে থম ধইরা বইসা বিশ্বের তাবড়-তাবড় কোচের মুণ্ডপাত তো করতে পারি। ঠ্যাকাব ক্যাডা। এ বঙ্গের পথে-ঘাটে এখন বিশেষজ্ঞের হুড়াগুড়ি। আমাগো অন্নদামাসি বারো বছর বয়স থেইক্যা দেওয়ালে ঘুঁইটা দেয়। আইজ পর্যন্ত একটা ঘুইটাও আকারে পারফেক্ট গোল করতে পারে নাই। হেই মাসি টিভির সামনে বইসায় কয়, সাহেবগুলার নিশানা ঠিক না। রোনাল্ডো থেইক্যা কামানো খেলোয়াড় দেখলেই কয়, দাদা ওগরে কি এই বয়সে পৈতা। হইল। মাথা কামাইছে ক্যান। কিছুই কওন যায় না, কোনও এক দিগন্ত থেইক্যা বিশেষজ্ঞের মতামত দেওনের জন্যে হয়তো বা অন্নদামাসির কাছেও প্রস্তাব আইতে পারে।"

আমরা চুইংগামের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে যাওয়ার আগেই নবদা প্যাকেট খুলে সবাইকে দিয়ে অবশেষে মামাকে বলল, "মামু চলবে নাকি?"

মামা বললেন, "ব্যাবাক দাঁত বান্দাইয়া ফালাইছি। ওই দাঁতে চুইংগাম চলব না। এখন ঘাটে যাওন অব্দি গামটুকু রাখতে পারলেই বাঁচি।"

রাত্রি সাড়ে ন'টার খেলা দেখার আগে নবদা মামাকে বলল, "আমার লেখার একটু নমুনা শুনবে?"

মামা একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। চেয়ার থেকে নেমে নিচে বসতে বসতে বললেন, "একটু শুনা।"

নবদা বলল, "একটু কেন?"

মামা বললেন, "একটু দিয়া শুরু করি। সহ্য করলে পারলে পুরাটা শুনুম।"

আমরা বললাম, "মামা, আপনি চেয়ার ছেড়ে নিচে বসলেন কেন?"

মামা উত্তর দিলেন, "নবর ভাষায় বেগ সহ্য করতে না পাইরাযদি চেয়ার উলটাইয়া পইরা যাই, হেই কারণে চেয়ার ছাইড়া নিচে বসলাম। এতে পতনের আশঙ্কা নাই।"

নবদা তার ব্যাগের ভেতর থেকে কয়েকটা কাগজ বার করে বলল, "ডোন্ট টক! কেউ কথা বলবে না। আমি পড়া শুরু করছি।"

মামা বললেন, "ওরে তোরা দরজা বন্ধ কইরা এলাকায় কার্ফু জারি কর। নব এখন বিশেষজ্ঞর মতামত দিতাছ।"

নবদা কেমন লিখেছে সেটা শোনার জন্য আমাদের বেজায় আগ্রহ হচ্ছিল। আমরা বললাম, "নবদা, তুমি কোন ম্যাচটা নিয়ে লিখেছ?"

নবদা বললেন, "প্রথম লেখাটায় আমি বিশেষ কোন ম্যাচ নিয়ে লিখিনি। যে কয়টা খেলা হয়ে গেছে আমি তারই পরিপ্রেক্ষিতে সবার ভুলগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি।

নবদা একজোড়া চুইংগাম মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল। মামা বললেন, "খেলনের সময় চুইংগাম চিবায়, এ যে দেখি পড়নের সময়ও চিবাইতে আছে।"

নবদা শুরু করলেন, "ব্রাজিলের খেলার মধ্যে ওয়ান টাচের ছন্দটা আর নেই। রোনাল্ডো বুদ্ধি দিয়ে লেখতে পারছে না। ব্রাজিলের কোচের বড় ভুল, টিমটাকে রোনাল্ডো-নির্ভর করে ফেলা। অথচ রোনাল্ডোর মধ্যে সেই রিফ্লেক্স নেই। আমি যখন খেলতাম, আমার পেছনেও দু'জন পাহারাদার বসানো হত। আমি তাদের যেভাবে বোকা বানাতাম, রোনাল্ডো তা পারছে না।"

এই পর্যন্ত পড়ার পর মামা চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ওরে, তরা এই পাগলডারে থামা। ও যখন খেলত, পয়লা দিনেই ওর খেলা দেখার পর মাঠের একটা মাছিও ওরে গার্ড দিত না।

নবদা গর্জে উঠে বলল, "আমি কি ভুল লিখছি?"

মামা উত্তর দেন, "বাগজোলা খালের মশা যদি গির অরণ্যের সিংহের লগে নিজের তুলনা করে তাহলে কী মনে হয় জানস?"

নবদা বলল, "কী মনে হয়?"

মামা বললেন, "মনে হয় তবে পাগলা পাঠাই, হয়তো হাত থেইক্যা বাচনের লেইগা আমি গারদে ঢুকি।"

নবদা পড়া বন্ধ করে বললেন, "এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। এখন খেলা শুরু হবে। খেলাটা আমার স্টাডি করতে দাও।"

খেলা শুরু হওয়ার পর নবদা প্রথমে কোলে বালিশ নিয়ে বসল। সামনের টেবিলে কাগজ, দু'রকমের কলম, জলের গ্লাস, চুইংগাম, স্টপওয়াচ। মিনিট তিনেক খেলা হওয়ার পরই নবদা ঘর ঝাড়ার লম্বা ফুলঝাড়ু নিয়ে এল। আমরা বললাম, "এটা দিয়ে কী হবে?"

সবদা বলল, "তোদের বিশেষ করে, মামাকে এই ফুলঝাড়ুর সাহায্যে পয়েন্ট করে করে দেখিয়ে দেব কোথায় কী ভুল হচ্ছে। এটাকেই বলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো।"

মামা বিশেষ কিছু বললেন না। নবদার টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নব তো দোকান সাজাইয়া বইসে। ও খেলা দেখব না দোকানদারি করব।"

খেলার মধ্যে উত্তেজনা যত বাড়ে নবদার চিৎকারও তত বাড়ে। চিলির সালাস যখন বল নিয়ে ইতালির বক্সে দুরন্ত গতিতে ঢুকছে তখন নবদা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছে "সালাসা, বাঁ দিকের পোস্টে মার, বাঁ পায়ে নে।" গোলটা যখন হল না তখন আমাদের ঘরের মধ্যে কী যে ঘটল তা প্রথমে বোঝা গেল না। দুপ করে একটা আওয়াজ তারপরই পাখার হাওয়ায় ঘরময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল তুলো।

ব্যাপারটা কী, সেটা বুঝে ওঠার আগেই মাসিমা আর্ত চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আমার নয়া বালিশটারে নব ফাটাইয়া ফালাইছে। রাইতে মাথায় দিমু কী?"

মাসিমার বালিশ ফাটানোর শোকে আমাদের তখন কর্ণপাত করার অবস্থান নয়। আবার একটা বল ধরে চিলির ক্যাপ্টেন জামোরনো যখন ইতালির দু'ডিফেন্ডারকে

পেছনে ফেলে ছুটছে আর কোনাকুনিভাবে বক্সের কাছে ছুটে এসে যাচ্ছে পোলপিপাসু সালাস তখন কাচের টেবিলে নিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল নবদা।

মামা চিৎকার করে বলছেন। "ঘরের মইধ্যে যা ঘটুক, আমি টিভি থেইকা চোখ সরামু না।"

আমার দিদিমা বেড়াল তাড়ানোর ডাণ্ডা এনে নবদার পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "অতিসাইরা, খেলা হয় ফ্রান্সে, তুই ক্যান কাচের টেবিলডার উপর উইঠ্যা খারইসস নাচতে আরম্ভ করলি। এত দামের টেবিলটা তো ফুটিফাটা হইয়া গেল।"

এই ঘটনায় নবদাকে খুব একটা বিব্রত দেখাল না। সে বলল, "লেখার টাকা পেয়ে তোমার টেবিল আমি করে দেবো। আসলে জামদাগ্নি যেভাবে আটাক বানাল..."

আমরা বলি, "জামদাগ্নি কাকে বলছ, উনি তো জামোরানো।"

নবদা বলল, "ওই হল!"

হাফ টাইমে মামা ঘরের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, "নব যেরকম দাপাদাপি আরম্ভ করছে তাতে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘরের কিছুই আস্ত থাকব না। আমার মাথাও লাথ্থি দিয়া ফাটাইয়া ফালাইতে পারে। তোরা ব্যাবাকে মিইলা নব'র হাত-পা বাইন্দা ফালা। নইলে শরীর অক্ষত রাইখা খেলা দেখন যাব না।"

খেলা যতক্ষণ চলে নবদার মুখ আর হাত দুটোই সমানতালে চলতে থাকে। দিদিমা তাঁর কাচের টেবিলের শোক তখনও ভুলতে পারেননি। নবদার দিকে একবার আগুন চোখে তাকিয়ে দিদিমা বললেন, "নব'র মুখে গামছা বাইন্দা দে। ওরা খেলে আর নবটা দাপাদাপি কইরা ঘরের জিনিস ভাঙে।"

আমরা নবদাকে বললাম, 'নবদা, তুমি একটু চুপ করে থাকতে পারো না?"

নবদা উত্তর দিল, "এটা তো শোকসভা নয়। ফুটবল খেলা। এখানে একটু চ্যাঁচামেচি হবেই।"

রাত সাড়ে বারোটার খেলা শুরু হওয়ার আগে দিদিমার তাড়ায় আমরা খেয়ে নিলাম। আমরা কয়েকজন মিলে খেলা দেখছি। নবদা খুব একটা বাড়াবাড়ি করেনি। শুধু একবার উত্তেজিত হয়ে নিজেই হেড করতে গিয়ে আচমকা মামার মাথায় গোত্তা মেরে ফেলেছে। মামা দু'হাত মাথা চেপে আমাদের বললেন, "বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে নব আমারে মাইরা ফালাব। মাথায় এমন গুতা মারছে যে মনে হইল মানুষ না ষাঁড়ে গুতাইছে। মগজে ঘিলু থাকলে মাথাটা একটু নরম হয়। নব জীবনে মাথায় বল ঠেকাইয়া গোল করতে পারে নাই, কিন্তু চারজন ডিফেন্ডারের দাঁত ভাইঙ্গা ফালাইছে খালি মাথার গুতা মাইরা।"

নবদাকে এই সময় একটু লজ্জিত দেখাল। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আবার আগের মতো হাত পা ছুঁড়ে চ্যাঁচাতে আরম্ভ করল। কোনও দলের গোলের পাশ দিয়ে বল গেলেই নবদা 'গোল' বলে চিৎকার করে ওঠে আর মামা ধমক দিয়ে বলেন, "তুই কি চোখেও কম দেখস। তিন হাত দূর দিয়া বল যায়, আর নব 'গোল' 'গোল' বইলা চিল্লাই।"

অনেক রাত্রে খেলা শেষ হওয়ার পর মামা বললেন, "এইবারের বিশ্বকাপে একটা জিনিস বড় চোখে লাগতাছে।"

আমরা বললাম, "কী?"

নবদা বলল, "কোন ব্যাপারটা চোখে লাগছে বল তো। আমি নোট করে নিই।"

মামা বললেন, "দুনিয়া কাঁপানো এক-একজন প্লেয়ার। এরাও যদি বক্সের তিন গজ দূরে থেইকা বারের উপর দিয়া বল মারে তাইলে আর ভাইচুং-বিজয়নদের থামাখা গাল পারি ক্যান। ওরাও তো তাই করে।"

নবদা সঙ্গে সঙ্গে কীসব যেন লিখতে লাগল। মামার ঘরেই নবদা'র শোবার ব্যবস্থা। আমরা ভাইয়েরা মিলে নিজেদের ঘরে শুতে যাওয়ার আগে বুঝিনি যে, মামা আর নবদার এক ঘরে শোয়াটা গভীর রাতে কোনও অঘটন ঘটাতে পারে। আমাদের তখনও ভাল করে ঘুম আসেনি। হঠাৎ আমাদের দরজার ধাক্কা। বাইরে থেকে দিদিমা আর মামিমার উত্তেজিত গলা।

আমরা দরজা খুলে বাইরে আসতেই দিদিমা বললেন, "তোরা সবাই রাস্তা গিয়া দ্যাখ। লোহার ডাণ্ডা লইয়া পরেশ নব'রে তাড়া করছে।"

আমরা তো হতবাক। সবাই বাইরে এসে দেখি নবদা একটা উঁচু পাঁচিলের ওপর বসে আছে আর মামার হাতে একটা লিকলিকে লোহার শিক। আমরা দেখি মামা নিচ থেকে শাসাচ্ছেন, আর উঁচু থেকে নবদা বলছে, "সরি মামা, সরি। আমি খুঁজে দিচ্ছি।"

আমরা বললাম, "কী হয়েছে?"

মামা রাগে ফেটে পড়ে বললেন, "নবভা একটা কলির পাঁঠা। শোওনের আগে আমারে ব্যাকভলির কায়দা দেখাইতে গিয়া এমন পাও যে আমার জলের বাটি জানালা দিয়া একেবারে রাস্তায়।"

আমরা বললাম, "এর জন্য এত কাণ্ড কেন? চলুন, আমরা বাটি খুঁজে দিচ্ছি।"

মামা গর্জন করে উঠে বললেন, "বাটি তো আমি পাইছি। কিন্তু বাটির মইধ্যে যে দাঁত ভিজাইয়া রাখছিলাম, হেই দাঁত গেল কোথায়?"

সমস্যাটা গুরুতর। আমরা টর্চ জ্বেলে রাস্তায় মামার দাঁত খুঁজতে লাগলাম। মামিমা জানালা দিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "খবরদার, রাস্তায় পড়া দাঁত তর মামা যেন মুখে না তোলে।"

আমাদের শোরগোলে অন্যান্য বাড়ির লোক জেগে উঠেছে। নবদা যে বাড়ির পাঁচিলের উপর উঠে বসেছে সেই বাড়ির মহিলারা তাদের পাঁচিলের উপর লোক দেখে 'চোর-'চোর বলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে আর নবদা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। "আমি চোর নই। আমি একজন এক্স ফুটবলার। প্লিজ আন্ডারস্টান্ড মি, আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন।"

ইতোমধ্যে পেট্রোল ডিউটি দেওয়া পুলিশ জিপ এসে হাজির। এক পুলিশ অফিসার জিপ থেকে নেমে বললেন, "কী হচ্ছে এখানে? টর্চ জ্বেলে কী খুঁজছেন?"

মামা উত্তর দিলেন, "আমার দাঁত।"

পুলিশ অফিসারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তিনি বললেন, "দাঁত! মুখের দাঁত রাস্তায় খুঁজছেন? আসল ব্যাপারটা কী?"

জিপ গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলোয় রাস্তা আলোকিত। আমার ভাই হঠাৎ সোল্লাসে চিৎকার করে বলল, "ওই তো মামুর দাঁত।"

আমরা দেখলাম, সেটি নর্দমার জলে শান্ত হয়ে পড়ে আছে। মামা দাঁতের পাটি দেখলেন। বিষণ্ন গলায় বললেন, "এই দাঁত কি আর মুখে তোলন যাব!"

নবদা ততক্ষণে নেমে এসে বলল, "বাকি রাতটুকু ডেটল জলে ভিজিয়ে রাখ। তা হলে আর অসুবিধা নেই।"

দিদিমা আর মামিমা প্রবল আপত্তি করলেন। মামিমা বললেন, "ওইটা নব'র মুখে ঢুকাইয়া দে।"

দিদিমা বললেন, "কইলকাতায় খোলা ম্যানহোলের অভাব নাই। দুই পা হাঁটলেই পাবি। তার মইধ্যে ওই দাঁত আর নব দুইটারেই ফালাইয়া দে।"

মামা নবদার দিকে তাকালেন। ঠোঁটে হাসি। এগিয়ে এসে পিঠে হাত রেখে বললেন, "আর রাগ নাই। তোর ব্যাকভলিটার কথা ভাবতাছি। দুই বাই এক ফুটের জানালা দিয়া তুই তো বাটিটার ঠিক বাইরে পাঠাইতে পারছস। তোর এই জিনিসটা আমারে মুগ্ধ করছে। এই দ্যাশের কত পোলা সুযোগ না পাইয়া বইস্যা গেল।"

বাইরে তখন রাত শেষের মৃদুল হাওয়া। নবদার কাঁধে হাত দিয়ে মামা এগিয়ে' যাচ্ছেন বাড়ির দিকে। আমরা তখন দাঁত পাহারায় দাঁড়িয়ে।

ভুলোমন ভুলোদা

অনীশ দেব

মায়ের মুখে কথাটা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। ভুলোদার সঙ্গে নেমন্তন্নে যাওয়া! ওরে বাবা, সে আমি পারব না! মৌ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হাততালি দিয়ে বলল, "ঠিক হয়েছে, ভুলোদার সঙ্গে গেলে মজাটি টের পাবে!"

আমার মুখে একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠেছিল। হয়তো সেটা লক্ষ্য করেই মা বললেন, "ভয় কী রে! তুই তো ভুলোর সঙ্গেই থাকবি। দরকার হলে ওকে খেয়াল করিয়ে দিবি।"

মৌ এখনও আমার দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে। মা ওকে ধমক দিয়ে বললেন, "দাদার সঙ্গে ফাজলামো হচ্ছে! চল্, পড়তে বসবি।"

মা ওকে নিয়ে পড়াতে বসলেন। কাল মৌয়ের ইংরেজি পরীক্ষা। আমার অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত পরশু। আর তার জন্যেই পড়তে হল এমন বিপদ। কারণ পরীক্ষা শেষ না হলে ভুলোদার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠত না। এ যেন অ্যানুয়াল পরীক্ষার চেয়েও কঠিন পরীক্ষা।

ভুলোদাকে ও পাড়ায় প্রায় সব্বাই ভয় পায়। বিশেষ করে আমি। কারণ সে সব কিছু খালি ভুলে যায়। আর এই ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে যখন-তখন। একবার নাকি রাত দেড়টার সময়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে স্রেফ চেঁচিয়ে পড়তে বসে গিয়েছিল। বাড়ির সবাই তো জেগে উঠেছে ভুলোদার ভারী গলার চিৎকার। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, তখন যে রাত সেটা ভুলোদা ভুলে গেছে। ভেবেছে ভোর হয়েছে। তাই হাত-মুখ ধুয়ে পড়াশুনোয় মন দিয়েছে।

ভুলোদার আসল নাম বিপ্রদাস সরকার। আমার বড়মাসির ছেলে। থাকে আমাদের বাড়ির পাঁচটা বাড়ি পরে। তার ঐ ভুলো মনের কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে কবে যে 'ভুলো' নামটা চালু হয়ে গেছে জানি না। এখন তার আসল নামটাই বেশ কষ্ট করে মনে করতে হয়।

ভুলোদা আমার চেয়ে চার বছরের বড়। গত বছরে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। ভুলো মন নিয়ে কী করে যে সে ঠিক ঠিক উত্তর পারল, কে জানে! সবাই যখন একথা জিজ্ঞেস করে তখন ভুলোদা বলে, "কী জানি ভাই, ঐ একবারই হয়তো ভুল করে ঠিক উত্তর লিখে ফেলেছি।"

হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর ভুলোদা কলেজে ভর্তি হয়েছে। একই সঙ্গে আবার ব্যায়াম করতে শুরু করেছে। মাঝে-মাঝেই বলে, পড়তে ভাল লাগছে না, অথচ আমাকে সময় পেলেই পড়া-টড়া দেখিয়ে দেয়। এমনিতে ভুলোদা সত্যিই খুব ভার। শুধু ঐ ভুলে যাবার ব্যাপারটুকু ছাড়া।

আজকের নেমন্তন্ন ছোটমাসির ছেলের মুখেভাত উপলক্ষে। বাবা অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে। মা মৌকে পড়াতে ব্যস্ত থাকবেন। একমাত্র আমিই পরীক্ষার পাট চুকিয়ে খেলাধুলো নিয়ে মেতে আছি। অতএব আমাকেই যেতে হবে। যেতে রাজিও ছিলাম। কারণ জানতাম বড়মাসির বাড়ির অনেকে যাবে। কিন্তু একটু আগেই মায়ের মুখে শুনলাম ওরা কেই যেতে পারবে না। কী সব ঝামেলায় পড়ে গেছে। যাবার লোক রয়েছে শুধু ভুলোদা ব্যস, এখন আর আমার নিস্তার নেই। ছোটমাসিদের বাড়ি সেই খিদিরপুর, আর আমাদের বাড়ি বরানগর। শ্যামবাজার পেরিয়ে গেলে রাস্তাঘাট আমি কিচ্ছু চিনি না। স্রেফ ভুলোদা ভরসা। যদি নেমন্তন্নে যাবার সময় ভুল করে অন্য দিকে চলে যায়? কিংবা আমাকে ফেলে রেখে ব্যস থেকেও কোথাও নেমে পড়ে? ভুলোদা কোথায় যে কী করে বসবে তার কোনো ভরসা নেই। তার ওপর গত সপ্তাহেই যে দুটো ঘটনা ঘটেছে তাতে আমার ভয়টা অনেক বেড়ে গেছে। যাবে বলে একেবারে বুক ঢিপ-ঢিপ করছে।

গত সপ্তাহের প্রথম ঘটনা আমার সাইকেল নিয়ে।

ক্লাস সেভেন থেকে এইটে ওঠার পরে বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছেন। বেশ বড়সড় সাইকেল। আগে একটা ছোট সাইকলে ছিল। সেটার চাকা ছিল মোট চারটে। দুটো বড়, আর পেছনের চাকার দুপাশে দুটো রডের মাথায় খুদে-খুদে দুটো চাকা। যাতে চালাতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে কাত পড়ে না যাই। ছোট সাইকেলটা এখন মৌ চালায়, বড়টা আমি।

বড় সাইকেলটা একদিন ধার চাইতে এল ভুলোদা। বলল, "বাবান, তোর সাইকেলটা একটু দে তো। চিড়িয়ামোড়ের কাছে একটা জরুরি কাজ আছে, ঝটপট সেরে আসি।"

আমি সাইকেলটা ভুলোদাকে দিয়ে বললাম, "মনে করে আবার দিয়ে যেও কিন্তু!"

"আরে সে নিয়ে ভাবিস না—"বলে সাইকেলে চড়ে ভুলোদা রওনা হয়ে গেল।

তারপর থেকে তিনি-তিনটে দিন ভুলোদার আর পাত্তা নেই। সুতরাং গেলাম বড়মাসির বাড়ি। ধরলাম ভুলোদাকে। বললাম, "আমার সাইকেল কী হর ভুলোদা?"

মাথায় হাত দিয়ে জিভ কেটে ভুলোদা বলল, "এই রে, একদম গেছি! শিগগির চ, শিগগির চ—"

আমার হাত ধরে টানতে টানতে সোজা রাস্তায়। সেখানে থেকে বাসে চেপে চিড়িয়ামোড়। চিড়িয়ামোড়ে নেমে একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল ভুলোদা। দোকানদারকে বলল, "বিকাশদা, আমার সাইকেলটা—"

ভদ্রলোক হেসে দোকানের এক কোণ থেকে সাইকেলটা এনে ভুলোদার হাতে দিলেন। তাঁর হাসি দেখেই বুঝেছি ভুলোদাকে তিনি ভাল করেই চেনেন।

বাড়ি ফেরার পথে ভুলোদার মুখে সব শুনলাম। তিনদিন আগে সাইকেলটা বিকাশবাবুর দোকানে রেখে সে কী একটা কাজে গিয়েছিল। বলেছিল, বাদে এসে সাইকেলটা নিয়ে যাবে। তারপর ভুল করে বাসে চড়ে সোজা বাড়ি চলে গেছে। ব্যস, সেদিন থেকে বেমালুম ভুলে গেছে সাইকেলের কথা।

দ্বিতীয় ঘটনা আরও সাংঘাতিক।

ভুলোদার কলেজের এক বন্ধু, ভুলোদাকে ডাকতে এসেছিল বাড়িতে। দুজনে মিলে কোথায় যেন যাবার কথা। বন্ধুর ডাকে ভুলোদা নেমে এসেছে সদর দরজায়। বলেছে, "দাঁড়া,—কাপড় পরে এক্ষুণি আসছি, " তারপর একছুটে দোতলার উঠে গেছে পোশাক পালটাতে।

দশ মিনিট। পনেরো মিনিট। অবশেষে আঘঘন্টা কেটে গেল, তবুও ভুলোদার পাত্তা নেই। তখন অধৈর্য হয়ে সেই বন্ধু ডাকাডাকি করতে শুরু করল ভুলোদার নাম ধরে। বড়মাসি দেখা দিলেন দোতলার বারান্দায়। বন্ধুটি বলল, "মাসিমা, বিপ্রকে আসতে বলুন। জামা-প্যান্ট ছেড়ে আসছি বলে সেই যে গেছে পুরো আঘঘন্টা হয়ে গেল। দেখা সেই। যেখানে যাবার কতা সেখানে দেরি হয়ে যাবে।"

ছেলের বন্ধুর কথা শুনে বড়মাসি তো হ্যাঁ। অবাক গলায় মাসি বলল, "সে কী, বাবা! ভুলো যে জামা-কাপড় পরে মিনিট বাবা! ভুলো যে জামা-কাপড় পরে মিনিট কুড়ি আগে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল! বলল, শঙ্করদের বাড়ি যাব, ভীষণ জরুরি দরকার—বন্ধুটি আরও অবাক। কারণ তারই নাম শঙ্কর। তাকে সদরে দাঁড় করিয়ে রেখে খিড়কি দরজা দিয়ে চলে গেছে ভুলোদা। গেছে আবার তাদেরই বাড়িতে, তার সঙ্গে দেখা করতে!

"মাসিমা, আমারই নাম শঙ্কর—"এ-কথা চেঁচিয়ে বলে সে তখন ছুটতে শুরু করেছে জবাস স্টপের দিকে। যদি কোনো রকমে ভুলোদাকে ধরা যায়।

ভুলোদাকে ধরা গিয়েছিল। তখন জিভ কেটে মাথায় হাত দিয়ে সে বলে উঠেছিল, "ইশ! একদম ভুলে গেছি রে!"

সুতরাং এইরকম ভুলোদার সঙ্গে নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে ভয় করবে না? কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই!

সুতরাং সন্ধেবেলা রওনা হয়ে গেলাম দুজনে। মা বারবার বলে দিলেন, "ভুলো, তোর ছোট ভাইটিকে ভুলে যাস না যেন।"

ভুলোদা হেসে বলল, "তুমি কিচ্ছু ভেবো না, মাসি। ভুল আমার হয়, তবে বাবানকে ভুলে যাব, এত ভুলো আমি নই।" মৌ তখন মুচকি-মুচকি হাসছে। আমিও রেগে গিয়ে বলে দিলাম, "কাল পরীক্ষায় লাড্ডু পাবি।"

মৌ নাকি সুরে প্রতিবাদ করতেই মা বললেন, "কী হচ্ছে, বাবা! ও কথা বলতে নেই।"

ছোটমাসির বাড়ি পথে কোন গোলমাল হল না। হেমন্তন্ন খেতে গিয়ে না। গোলমালটা হল বাড়ি ফেরার পথে।

সন্ধ্যোবেলা রওনা হওয়ার পর থেকেই আমি ভুলোদার সঙ্গে আঠার মতো লেগে আমি। যদি হঠাৎ কিছু ভুল করে বসে। কপাল ভাল যে যাওয়ার পথে বা ছোটমাসির বাড়িতে সময়টুকু বেশ ভালয়—ভালয় কেটে গেল। তারপর আমরা রওনা হলাম বাড়ির দিকে। রাত তখন প্রায় দশটা।

পাড়ার বাস স্টপে এসে যখন নামলাম তখন রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে। চারপাশ বেশ অন্ধকার। অর্থাৎ লোশেডিং। নির্জন অন্ধকার রাস্তায় চলতে গিয়ে গা-টা যেন ছমছম করে উঠল। চাঁদের আলোয় পথ দেখে আমি আর ভুলোদা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎই একটা দোকানের আড়াল থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এল। দুটো কালো ছায়া। সোজা সে একেবারে আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল। ওদের মুখগুলোও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কর্কশ গলায় একজন বলল, "টাকাকড়ি যা আছে ঝটপট দিয়ে দাও!"

ঠিক তক্ষুণি দ্বিতীয় লোকটা রিভলভার বের করল। ছবিতে যেমন দেখেছি ঠিক সেইরকম, সত্যিকারের রিভলভার। তারপর রিভলভারটা ভাঁজ করে গুলির চেম্বারটা দেখিয়ে বলল, "দেখছ তো, চেম্বারে গুলিঠাসা আছে! গোলমাল করলেই খুলি উড়ে যাবে!"

আমি পকেট থেকে ক'টা টাকা আর কিছু খুচরো বের করে প্রথম লোকটার হাতে তুলে দিলাম। কাঁপা গলায় ভুলোদাকে বলালাম, "ভুলোদা, যা দেবার দিয়ে দাও।"

দ্বিতীয় লোকটা তখন রিভলভার ঠেকিয়ে ধরেছে ভুলোদার বুকে, "জল্‌দি!"

সেই মুহূর্তেই ভুলোদা এক অদ্ভুত কাণ্ড করল রিভলভার ধরা লোকটার নাকে সপাটে বসিয়ে দিল এক বিরাশি সিক্কার ঘুষি। লোকটা ব্যায়াম-করা হাতের ঘুষি থেকে ছিটকে পড়ল মটিতে। আর ভুলোদা সঙ্গে সঙ্গে, "বাবান, কুইক!" বলে দে ছুট। চমক ভেঙে আমিও ছুটতে লাগলাম ভুলোদার পেছনে। মুখ ফিরিয়ে দেখি প্রথম গুণ্ডটা ছুটে পালাচ্ছে, দু'নম্বরটা বোধহয় তখন সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছে। ছুটতে ছুটতেই খেয়াল হওয়ার হঠাৎ ভুলোদা চিৎকার শুরু করে দিল, "পুলিশ! পুলিশ!" আমিও তার দেখাদেখি চিৎকার শুরু করলাম। তারপর দু-চারজন মানুষের সাড়া পেতেই আমরা থেমে পড়লাম। আরও লোক জড় হতে লাগল।

নাইট ডিউটির দুজন পুলিশ কনস্টেবলও হাজির হল সেখানে। সবাই মিলে যখন অকুস্থলে হাজির হলাম, তখন গুণ্ডাবাবাজি অজ্ঞান। টর্চের আলোয় দেখলাম তার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। রিভালভারটা পড়ে আছে পাশেই। আমাদের নাম—লিখে নিয়ে বলা হল। পরদিন থানায় দেখা করতে।

পরদিন একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড! সারা পাড়ায় রটে গেল, "ভুলো ডাকাত ধরেছে!" একেবারে যে-সে ডাকাত নয়, রিভালভার—ধরা সাংঘাতিক ডাকাত। থানার অফিসারও ভুলোদাকে পিঠ চাপড়ে বারবার বাহবা দিলেন। বললেন, এ কুখ্যাত ফেরারি গুণ্ডাটিকে তাঁর বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁজছিলেন।

থানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভুলোদাকে আমি বললাম, "ভুলোদা, তোমার এত সাহস! ছ-ছটা তাজা কার্তুজ ভরা রিভলভারওলা লোকটাক তুমি এক ঘুষিতে শুইয়ে দিলে? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই।"

. ভুলোদা উদাস মুখে বলল, "ভয় কি আর নেই রে, বাবান। আসলে তুই তখন বলিলি, ভুলোদা, যা দেবার দিয়ে দাও; আর আমি ভাবলাম তুই বোধহয় গুণ্ডালোকে ধোলাই দেবার কথা বলছিস। ব্যস্ দিলাম একখানা হুক সামনেরটার নাকে বসিয়ে। তখন কি আর রিভলভারের কথা আমার মনে আছে রে! সে তো একদম ভুলে গেছি!

ঝন্টু-মন্টু

আহসান হাবীব

মন্টু?

— জ্বী বাবা।

— তুই তাহলে বিয়ে করবি না?

— না।

— কথাটা ভেবে বলছিস তো?

— হু।

— বেশ তাহলে আমি ঝন্টুর বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

— কর।

— আরেকটা কথা, তোকে তোর রুমটা ছেড়ে দিতে হবে।

— মানে?

মানে আবার কি, ঝন্টু বিয়ে করে উ নিয়ে উঠবে কোথায়? তোর ঘরটা বড় আছে, বউ নিয়ে ওখানেই উঠবে।

— তাহলে আমি কোথায় থাকব?

— তুই কোথায় থাকবি সেটা তোর ব্যাপার। ব্যাচেলরের আবার থাকা নিয়ে সমস্যা নাকি? সেখানে রাইত সেখানে কাইত...

মন্টু মুখ অন্ধাকার করে বাবার সামনে থেকে উঠে গেল। মন্টু পরিবারের বড় ছেলে। ঘোর নীরীবিদ্বেষী, সে নারী জাতিকে দু'চোখে দেখতে পারে না। তাই বিয়েও করবে না বলে ঠিক করেছে। এদিকে তার কারণে ছোট ভাই ঝন্টুর বিয়ে হচ্ছে না বলে ঝন্টু ঘোষণা দিয়েছে এক মাসের মধ্যে তার বিয়ের ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশনে না এলে এ বাড়ি ছেড়ে চাকরি ছেড়ে...না হিমালয়ের দিকে...না ওদিকেটায় বড্ড ঠাণ্ডা, ঝন্টুর আবার বেশি ঠাণ্ডা, সহ্য হয় না। সে যাবে সাহারা মরুভূমির দিকে।

মন্টু নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আজ অফিসে নেই, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা দরকার। ঠিক ওই সময় দরজায় নক হলো।

- কে?

— আমি ঝন্টু।

— কী চাই?

— ভাইয়া দরজাটা একটু খোল।

দরজা খুলল মন্টু। 'কী ব্যাপার?'

— ইয়ে ভাইয়া ঘরটা করে ছাড়ছো?

— মানে?

— কেন বাবা কিছু বলেনি তোমাকে?

— বলেছে...কিন্তু এখনই কেন?

— না মানে আমি বাথরুমে তো নতুন টাইলস বসাবো...ঘরের টুকটাক কাজ করতে হবে। ঘরটাকে যা বানিয়ে রেখেছো তাতে করে...শাপলাকে নিয়ে...ঢুকলে...

— শাপলটা কে?

— শাপলাকে চিনলে না, এ পাড়াতেই তো থাকে। ওই যে তোমার ফ্রেন্ড মকার ফোন—ফ্যাক্সের দোকানের পাশের বাড়িটাই তো ওদের।

— ও আচ্ছা। মন্টু প্রসঙ্গ এড়াতে চায়।

— ভাইয়া তাহলে কাল সকালেই তোমার সব জঞ্জাল সরাচ্ছ?

জঞ্জাল! মন্টুর ইচ্ছে হলো কষে একটা চড় কষায় মন্টুর গালে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় কারণ সাইজে ঝন্টু মন্টুর চেয়েও বেশ লম্বা-চওড়া। দুষ্ট লোকরা বলে মন্টু আর ইঞ্চিখানেক শর্ট হলে আপসে ঢাকার যে কোন চায়নিজ রেস্টুমেন্টের দারোয়ানের চাকরি পেয়ে যেত। যা হোক মন্টুর হাত ঝন্টুর গাল পর্যন্ত পৌছাবে না। বহু কষ্টে রাগ সামলাল মন্টু। 'এ নিয়ে তোর সঙ্গে পরে কথা বলব।'

— পরে না, তুমি কালই ঘরটা ছেড়ে দাও। আমি মিস্ত্রিদের বলে দিয়েছি আসতে। বলে ঝন্টু খুব ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। মন্টু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার ঘরের দরজায়। হঠাৎ করে তার নিজের ঘরটাকে অসহ্য লাগতে লাগল মন্টুর। শার্ট গায়ে দিয়ে বেড়িয়ে পড়ল সে। মোড়ের কাছের মকার ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে গিয়ে একটু আড্ডা মারলে যদি মনটা ভালো হয়!

— কি রে গিটঠু অফিস নাই?

— না।

মন্টুকে মকা গিটঠু বলেই ডাকে এতে সে মাইন্ড করে না। কারণ ছেলেবেলার বন্ধু। কিন্তু আজ ভীষণ মেজাজ খারাপ হলো। কারণ একটা মেয়ে ফোনে কথা বলছে! তার সামনে এভাবে...অবশ্য মেয়েটা ফোন করা নিয়ে ব্যস্ত, হয়তো শোনেনি। মন্টু একটা চেয়ারে বসে কান খাড়া করে মেয়েটা কি বলছে শোনার চেষ্টা

করে। যদিও এটা অনুচিত। তারপরও মকার ফোন—ফ্যাক্সের দোকানে এলে সে এই ব্যাপারটা এনজয় করে। মেয়েটার গলাটা বেশ মিষ্টি।

— কি বললে?...তাই?...কিন্তু তোমার বড় ভাইতো শুনেছি পিছলা টাইপ। ঘর ছাড়তে রাজি হলো?...বাকী কথা আর কানে ঢুকলা না মন্টুর...এ মেয়ে যে শাপলা তা বুঝতে মন্টুর শার্লক হোমস হওয়ার দরকার নেই। সে চট করে উঠে পড়ল।

— কি গিটঠু যাস নাকি?

—হু।

হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে মন্টু তার জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল। তার বিয়ে না করার ধনুকভাঙা পন সে আজ এই মুহূর্তে বাতিল করল। সে বিয়ে করবে। এবং নিজের ঘরটা দখলে রাখার জন্য সম্ভব হলে এই মুহূর্তে বিয়ে করবে। কিন্তু কিভাবে? কাকে?

পার্কের একটা খালি বেঞ্চে বসে আছে মন্টু ঘন্টাখানেক ধরে একা একা। এ সময় লম্বা একটা মেয়ে হেটে গেল তার পাশ দিয়ে। আড় চোখে মেয়েটিকে মাপল মন্টু। শুধু লম্বা বললে মেয়েটিকে অপমান করা হয়। এই মেয়ে কি বিবাহিত? অবশ্য এ মেয়ের যে হাইট বিখ্যাত বাস্কেট বল প্লেয়ার করিম আব্দুল জব্বার ওকে বিয়ে করলেই শুধু মানাবে...! ভাবতে ভাবতে মেয়েটির চলে যাওয়া দেখছিল মন্টু আর তখনই মেয়েটি ঝট করে ঘুরে ফের আসতে লাগল মন্টুর বেঞ্চের দিকে।

— তুমি গিটঠু না?

ভয়ানকভাবে চমকে উঠল মন্টু।

— আ আপনি?

— আমি দিপ্তি...মনে নেই?

— দিপ্তি? চট করে সব মনে পড়ে গেল, তাই তো ছাত্র জীবনে তাদের ক্লাসের মিস পামট্রি...ওরফে দিপ্তি! দিপ্তি এত লম্বা হয়েছে। আগের চেয়েও লম্বা হয়েছে!

তারপর দু'জনের আলাপ জমতে বেশি সময় লাগল না।

— কিন্তু তুমি পার্কে একা একা কী করছ?

মন্টু জানতে চায়।

— সত্যি কথাটা বলব?

— বল।

— বাবা বলেছে আমাকে বিয়ে করতে হবে একটা বাটকু ছেলেকে। কারণ আমার সঙ্গে মানায় এমন লম্বা ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা বাটকু ছেলে নাকি রাজি হয়েছে পি এইচ ডি করে এসেছে, আরেক বাটকুর দেশ থেকে মানে জাপান থেকে...! আজ আসছে বাসায়, এনগেজমেন্ট হবে। তাই পালিয়ে এসেছি...অবশ্য ছেলে তোমার থেকে লম্বা। বলে খিল খিল করে হাসল দিপ্তি। এই প্রথম মন্টু মুগ্ধ হলো। মেয়েটি এত সুন্দর করে হাসে!

— তা তোমার সমস্যা কী? তুমিইবা পার্কে একা একা কী করছ গিটঠু সাহেব? মাইন্ড করছ নাতো আবার এত বছর পরে তোমাকে গিটঠু নামে ডাকছি বলে?....তোমার এই গিটঠু নাম কিন্তু আমারই দেয়া।

— মনে আছে। গম্ভীর হয়ে মন্টু বলে।

— তা তোমার সমস্যাটা কী?

— আমার সমস্যাটা একটু জটিল।

— কী রকম?

— আমি ঠিক করেছিলাম বিয়ে-টিয়ে করব না। বাসায় পরিষ্কার বলেও দিয়েছি। ছোট ভাইয়ের বিয়ের আয়োজন করছে বাবা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার ঘরটা নাকি ছেড়ে দিতে হবে তাকে...তাই ভাবছি...

— কী ভাবছ? দিপ্তি জানতে চায়।

— ভাবছি বিয়ে করব। অন্তত আমার ঘরটা রক্ষা করতে। তাই পার্কে বসে ভাবছিলাম। আর এই সময় তুমি...

— তুমি যদি আর ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হতে তাহলে অন্তত ভেবে দেখা যেত...ফের খিল খিল করে হেসে উঠল দিপ্তি। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল দিপ্তি। 'আমি চললাম, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পিএইচডি জামাই বিদেয় হয়েছে হীরের আংটি নিয়ে....এই মন্টু ফোন করো কিন্তু'।

মন্টুও উঠে দাঁড়ায়।

— চল তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। আমার তো আসলে এখান কোনো কাজ নেই।

— বেশ চল। তবে বাসায় ঢুকে আবার চা খেতে চাইবে না।

— না আমি চা-সিগারেট খাই না।

— গুড!

তারা একটা সবুজ সিএনজিতে উঠল।

তবে সিএনজিটা দিপ্তিদেরু বাসায় গেল না। এদিকে-ওদিক উল্টাপাল্টা ঘুরল কিছুক্ষণ। ১২ টাকা থেকে মিটার উঠল ১১২ টাকায়। তারপর ঘুরে গিয়ে থামল একটা বাড়ির সামনে। বাড়ির সদর দরজায় ছোট একটা সাইন বোর্ড তাতে লেখা 'কাজী অফিস'।

রাত সাড়ে দশটায় মন্টু এলো। সঙ্গে দিপ্তি।

—বাবা আমি বিয়ে করেছি। এ দিপ্তি। দিপ্তি লাজুক মুখে মন্টুকে বাবাকে সালাম করে দাঁড়িয়ে রইল। মা জীবিত নেই বলে সালাম করতে হলো না।

বাবা তার জীবনে বহুবার হতভম্ব হয়েছেন। কিন্তু আজকের হতভম্ব ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে উঠে দু'হাত দু'জনের মাথায় রেখে আশীর্বাদ করতে গেলেন। মন্টুর মাথায় হাত রাখতে পারলেও দিপ্তির মাথায় হাত রাখতে পারলেন না।

ঝন্টু বাসায় ছিল না। বাবা কী মনে করে নিজেই গেলেন মিষ্টি কিনতে। ঝন্টু এলো তার পর পরই। এসেই সোজা গেল মন্টুর ঘরে। মিস্ত্রির ব্যাপারটা ফাইনাল করা দরকার। কাল মিস্ত্রি আসছে।

— ভাইয়া দরজাটা খোল।

দরজা খুলল দিপ্তি। 'তুমি ঝন্টু? আমার এক মাত্র দেওর? শাপলার মাথামোটা প্রেমিক?...হা করে দেখছ কি মাছি ঢুকবে তো...আমি তোমার বড় ভাবি সালাম কর...আর কাল মিস্ত্রিদের আসতে নিষেধ করে দিও।'

পিছনে হো হো করে হেসে উঠল মন্টু। দিপ্তি ভাবে মানুষটা ছোটখাটো হলে কি হবে হাসিটা কিন্তু বিরাট!

সাইকেল ভ্রমণ

আমীরুল ইসলাম

দুপুর দুটো দু মিনিটে হাজির হলো পল্টু টক করে মাথায় মেরে বললো—

ঃ ভ্রমণে বেরুবি! সাইকেল ভ্রমণ!

একটু আশ্চর্য হলাম। পল্টু দুবার বেল বাজাল। নতুন সাইকেলের জেল্লায় ওর চোখমুখে ঝকমক করছে।

ঃ সাইকেল পেলি কোত্থেকে!

ঃ পরীক্ষায় ফেল মেরেছি বলে কাকু দিল।

আবার আশ্চর্য হবার পালা! ফের মেরে পল্টু সাইকেল পেয়েছে?

ঃ না, না, ঘাবড়াস না হাবলু। আগামীবারে যেন ভাল করতে পারি—সেই আশায় দিয়েছে।

আমার চোখ কপালে উঠলো। রোগা টিঙটিঙে শরীর আমার মাসে চোদ্দটি দিন অসুখে ভুগি। তেলে ভাজা জিনিস সহ্য হয় না। বাসে চাপলে মাথা ঘোরে। সাইকেল ভ্রমণের প্রস্তাব পেয়ে সানন্দে রাজি হলাম। পল্টু কানের সামনে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো—

ঃ পাঁচটা টাকা নিয়ে নিস।

ঝটিতি বড় আপার ঘরে ঢুকে পাঁচটা টাকা নিয়ে নিলাম। ঢলঢলে একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঃ চল পল্টু।

নাটবল্টুর মতো দুচোখ নাচিয়ে সাইকেলে প্যাডেল মারল সে।

ঃ লাফিয়ে চেপে বস পেছনে।

পল্টুর অর্ডার মাফিক ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমাদের এঁদো গলির ভেতর দিয়ে বেশ কসরত করে সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে এল পল্টু। বড় রাস্তার মুখে এসেই কোমর নাচিয়ে জুত মতো বসলো সে। তারপর উড়ন্ত পঙ্খীরাজের মতো ছুটে

চললো সাইকেল। আমার মনে তখন আনন্দের বুগবুগি। বাতাস ঝাপটা মারছে। চোখেমুখে। ফুলে ফেঁপে উঠছে আমার ঢোলা জামা। পল্টু হঠাৎ করে গান ধরলো—আমিও এ নিশিরাতে—

ঃ কিরে পল্টু, দুপুর বেলায় নিশিরাতের কাব্য করছিস। শুধারঅম আমি।

ফিক করে হেসে পল্টু শর্টকাট জবাব দিল—ওসব বুঝবি না!

নতুন সাইকেলের তেজ অন্যরকম। রাস্তায় যেন চাকা থাকতে চায় না। কখনো ফুটপাতে, কখনো রাস্তায়, ড্রেনের পাশ দিয়ে ট্রেনের মতো ছুটে চলেছে সাইকেল। আমার আবার রুগি রুগি ভাব। বছরের এগারো মাসই রোগে ভুগি। সেই আমিও হেঁসে কুঁদে গান ধরলাম। ভেড়ার মতো কণ্ঠস্বর শুনেই বোধহয় পল্টু পিছনে ফিরে তাকাল—

ঃ কি হাবলু, তুই ও যে আবদুল আলিম হয়ে উঠলি আমি তখন রবীন্দ্রসংগীতে মগ্ন।

বেশ হেসেখেলেই আজিমপুর হয়ে পলাশীর মোড় ধরে মেকিক্যাল পেরিয়ে সবে হাইকোর্টের সামনে এসেছি, অমনি—হাইকোর্ট দেখার সাধ মিটলো। পল্টু তাল রাখতে পারেনি। রোড ছেড়ে ফুটপাতে মাথা রেহাই পায়নি। ট্রাকের সঙ্গে ঠোকাঠোকি খেয়েই একটা টিউমার গজিয়ে গেল। চ্যাংদোলা হয়ে ছিটকে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে। পল্টু আগে বেড়ে গেছে কিছুদূর। পেছন ফিরে এসে আমাকে টেনে তুললো। টেক্কো লোকটির কিছুই হয়নি এমন ভাব। ধ্যাবড়ানো দাঁত বের করে হাসির রোশনাই ছড়িয়ে দিল।

ঃ খোকা একটা ঠোকর খেলে, শিং গজাবে। এসো আরেকটি লাগিয়ে দিই।

আমি' থ। মাথা আমার ঝিমঝিমাচ্ছে। এরকম অবস্থায় রসিকতা! কথা না বলে পল্টুর সাইকেলের হাতল ধরে আমি দাঁড়ালাম। পল্টুর দিকে তাকিয়েই টেকো লোকটি শেষ বাক্যাবাণ ছাড়ল—

ঃ ব্রিটিশ পিরিয়ডের ঘি খাওয়া মাথা খোকা। দশ ইঞ্চি ইট আঘাতে ভেঙে যায়। তোমার বন্ধুর বোধ হয় খানিকটা নড়ে গিয়েছে।

বলেই লোকটা চলে হন হন করে। ব্যথায় টনটন করছে আমরা মাথা। খুপসে ব্যাথা পেয়ে চুপসে বেলুন হয়ে গেছি। পল্টু চুকচুক করে হৃদয়ের দুঃখ জানাল।

ঃ দে দে পাঁচটা টাকা এবার ছাড়। তোর চিকিৎসার করাতে হবে।

কৌশলে টাকা বাগিয়ে নিল পল্টু। সামনে হাতলে চাগিয়ে বসতে বললো। আমাকে কিছুদূর গিয়ে চার আনা দিয়ে একটা আইসক্রীম ঘষতে থাকে! আলুর আয়তন কমে যাবে।

অগত্যা তাই করতে লাগলাম। পল্টু ওদিকে অনায়াসে সাইকেল চালাচ্ছে। খুব কেরদানি দেখাচ্ছে থেকে থেকে। নালার পাশ দিয়ে শোঁ করে বেরিয়ে গেল একবার। ভয় পেয়ে হাতল চেপে ধরলাম আমি!

করিস কি করিস কি ছাই! হাতল চেপে ধরলে আমি যে কতল হব।

তারপর এক চটপটির দোকানে নেমে কিছু ফুচকা খেল পল্টু। বলা বাহুল্য আমারই পয়সায়। আমার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে বললো—

ঃ কুকুরের পেটে ঘি সয় না! রুগি মানুষ তুই। এসব খেলে তোকে নিয়ে মেডিকেল যেতে হবে।

আমাকে কুকুরের সঙ্গে উপমা দেয়ার মনক্ষুণ্ন হলাম। আমার পয়সায় খাচ্ছে আবার আমার পর ফ্যাচাংগিরি। ঢিল মেরে কুল ফেলবে। আর সে কুল খাবে কাক সেতো হয় না। তবু সাইকেল ভ্রমণের নেশায় সব হজম করতে হবে।

পল্টু মুখ না মুছেই চাঁদিতে ঘা দিল। আবার শুরু আমাদের ভ্রমণ। এবার পড়বি তো পড় আমাকে নিয়ে ডাস্টবিনে হুমড়ি খেয়ে সাইকেল। পল্টু লাফিয়ে সরে গিয়েছে। আমি বেচারা ভ্যাগা গংগারাম। উপরে সাইকেল নিচে ময়লা আবর্জনা। আধাসেদ্ধ তন্দুরী রুটির মতো চিঁড়ে চেপ্টে পড়ে রয়েছি। পল্টু সাইকেলটা হেঁচড়ে দাঁড় করাল। চুকচুক করে সমবেদনা জানাল। যেন লোহা বেচারা কত দুঃখ পেয়েছে। সাইকেলের গায়ে লেগে থাকা ময়লা রুমাল দিয়ে সাফ করতে লাগল। আমি ওদিকে কাঁকাচ্ছি। পল্টুর কোন নজর নেই।

ঃ ওঠ, ওঠ আর কত বিশ্রাম নিবি। খুব নরম বিছানা পেয়েছিস মনে হচ্ছে। একটিং ছাড়।

কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসতে হয়। হাতপা ছড়ে গেছে। পল্টু দাঁড়িয়ে দেখছে আর ফিক ফিক করে হাসছে। কার না পিত্তি জ্বলে ওঠে! তবু রোখ চাপতে হলো। আবার সাইকেল বসা। আবার সেই ভ্রমণ।

ঃ হাবলু, কিছু মনে করিস না। নতুন সাইকেল তো। তাই মাঝে মাঝে কথা শুনছে না। চল এবার টিকাটুলি যাই। প্রস্তাব দিল পল্টু।

ঃ না—অন্যদিকে যাওয়া যাক। ভেটকি মাছের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চললাম আমি। সামনে বসে আছি আমি। দুরন্ত বেগে উড়ন্ত সাইকেল চললো। মুখে আমাদের অফুরন্ত কথা। পল্টু জানাল, জানিস সাইকেলে চাপলে আমার নিজেকে চেঙ্গিস খাঁ মনে হয়। আমি বললাম, ডাইনোসর ভাবতে ইচ্ছে করে আমার।

ঃ ও সেই বিশ্রি ঘোঁত ঘোঁত জন্তু। দেখলেই বমি বমি লাগে।

ঃ আর চেঙ্গিস খাঁ বুঝি সাইকেল চালাত।

দুজনেই মুখিয়ে উঠি। আর অমনি একপাগলা ষাঁড়ের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। সাইকেল মাঝখানে। দুধারে আমরা দুজন। আমার পরনে ছিল লাল জামা। তেড়েমেড়ে ছুটে এল লাল ষাঁড়। আমার দিকেই। ব্যর্থ লক্ষ্যবেধ। কোনমতে ডজ মেরে সে যাত্রা বাঁচোয়া। ষাঁড়ের তেড়ে আসা, আমার ডজ মারা এভাবে চললো কিছুক্ষণ। অমনি এল এক লাল বিআরটিসি বাস। আমার চোখে ঝুলছে লালগেন্দা ফুল। ষাঁড় হতভম্ভ হয়ে বিরাট লালের দিকে তাকিয়ে রইল। ছুট লাগলো পেছু পেছু। লাল রক্তে থেকে বাঁচালো পোবেচারা। পল্টু রেডি ছিল—হারি আপ হাবলু।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ব্যাক সিটে বসলাম আমি। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। পল্টু আবার ষাঁড়ের দিকে তাকাল বাই বাই টাটা।

চলছে আমাদেরএই মার্ভেলাস সাইকেল ক্রমণ। সামনে যে আবার কোন ঘটনা ওঁত পেতে আছে, কোত করে ধরবে কে জানে! পল্টু হঠাৎ হাসি শুরু করল। সে কী হাসি। পিলে কাঁপনী। রাগে আমার শরীর কাঁপছে থরথরিয়ে।

ঃ হ্যাবলা তোর ব্যাডলাকে। হি...হি...হি...। কী যে হয়েছে আজ তোর!

ঃ ধ্যাত্তের—চুপকর। শর্টকাট জবাব ছুঁড়ি।

নির্বিকার পল্টু। তোর অবস্থা দেখে ফিল্মস্টার মনে হচ্ছে তোকে।

রাগে আমার মাথায় চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

ঃ তোর সংগে এসেই না এই ভজঘট।

হে হে করে হাসল পল্টু। ঃ থাকিসতো, আমলিগোলার এঁদো গলিতে। আরশোলা দেখলে লাফালাফি করিস। নাকের সামনে দিয়ে ইঁদুর চলে গেলেও ধরতে পারিস না। বৈশাখে ঝড় এলে বাবা মা তোকে খাটের তলায় পাঠিয়ে দেয়। যদি ঝড়ে উড়ে যাস।

ব্রহ্মতালু, কাঁপছে আমার। চেঁচিয়ে উঠি, পল্টু শিগগির বাড়ি পৌছে দিয়ে আয়, ঢের হয়েছে সাইকেল ভ্রমণ।

পল্টু আবার ব্যঙ্গ করল, এসেছিস তোর খুশি মতো। যাবি আমার মর্জি মাফিক! ব্যাকরণের হিসেব তো নাই।

আকি কিছু একটা বলতে যাই। রাগে আমার কথা ছড়িয়ে আসে। পল্টুর চামড়ার মুখে কথা আটকায় না।

ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে আয়েশি যানবাহন হচ্ছে সাইকেল। বিনি পয়সায় সেই ভ্রমণ তোকে করাচ্ছি। কৃতজ্ঞ থাকিস হাবলা।

খাঁদা নাক উঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—পাঁচটি টাকা কিন্তু পল্টু বাগিয়ে নিয়েছিস।

সে কথা আর বলা হয় না। ঝটিতি আমি একটা খোলা ড্রেনের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। নিচে চওড়া ড্রেন। উপরে পল্টুর দাঁত বের করা হাসি। টাল সামলাতে না পেরে ড্রেনের ভিতরই পড়ে গেলাম। হুশ হুশ করে রাজ্যের ময়লা পানি আমার চার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। রাগে, ব্যথায়, দুঃখে জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা আমার। পল্টু দাঁত বের করে কেলানো হাসি দিয়ে বললো—

পল্টু তীরবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার তখন কল্পনান্ত অবস্থা। পল্টুর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। টেনে হেঁচড়ে ড্রেনের পাশে উঠে দাঁড়ালাম। বিকেলের ছায়া রোদ। আমার তখন ভূতের মতন অবস্থা। কাদায় ময়লার ল্যাটাপেটি। কিভাবে বাড়ি ফিরলাম তা বলে নিজেকে আর খাটো করতে চাই না।

পল্টুর সংগে দুদিন দেখাই সেই। তৃতীয় দিনে শুনলাম—নতুন সাইকেলটা ছিল পল্টুর কাকার। পল্টুর কাণ্ডকারখানা দেখে আর সাইকেলের দফারফা হয়েছে বলে কাকা তাকে বেধড়ক মার লাগিয়েছে। তাতেই বেচারা শয্যাগত।

আমার ইচ্ছে করলো—কাকাকে আমার দূরবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে পল্টুকে আরেক গ্রস্থ ধোলাই দেয়ার ব্যবস্থা করি।

নাক নিয়ে নাকাল

আহমাদ মাযহার

বাড়িটা তৈরি হতে অনেক দিন লেগেছে। এতোদিন ওখানে খেললে কেউ কিছু বলতো না। এ বাড়িতে অনেক দিন খেলেছে তপুরা। তপুরা মানে তপু, টিপু, আনু, টুলু আর মিশু। আগামী মাসে একজন ভাড়াটে আসছেন এ বাড়িতে। এক সাদা দাঁড়িঅলা বুড়োকে আসতে দেখেছে ওরা। আর বুঝি এখানে খেলতে আসা যাবে না। ওই বুড়ো লোকটা অবশ্য মজার। সেদিন সবাইকে যা হাসানো হাসিয়েছেন। কথাটা মনে হতেই এমন হাসি আসছে যে আর বুঝি থামানো যাবে না। উনি আবার নাকি ম্যাজিকও জানেন। সবাইকে দেখাবেন বলেছেন। আনু এই বুড়োকে নিয়ে কি সব জল্পনা করছে। এ বাড়িতে এলে বুড়ো যদি বকুনি দেন, তাহলে কোথায় খেলতে যাবে ওরা? এই নিয়ে মহাচিন্তা আনুর। আশপাশে কোনো মাঠ থাকলেও কথা ছিলো। তবে তপুর বিশ্বাস এ বাড়িতে তপুদের আসা বন্ধ হবে না। যারা ছোটদের সঙ্গে মজা করে, যারা ছোটদের ভালোবাসে তারা কি আর অন্যসব মানুষের মতো রাগী লোক হয়? তবু আনুর বিশ্বাস হচ্ছিলো না। অন্যরা অবশ্য স্বীকার করেছে তপুর কথা ঠিকও হতে পারে।

তপুর কথাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। বুড়ো যেদিন এলেন সেদিন বিকেলেই পাঁচ বন্ধু মিলে গেটের কাছে গিয়ে হুতিউতি করছিল। বুড়ো ডাকলেন সবাইকে,

'এই যে আমার ক্ষুদে বন্ধুরা। কেমন আছো তোমরা! এসো ভেতরে এসো।'

সবাই এ ওর চাওয়াও চাওয়ি করলো। সঙ্গে সবার মুখে হাসি। আনুটা সত্যি একটু বুদ্ধু। এর পরেও মনে সন্দেহ; এ বাড়িতে খেলতে আসতে পারবে না। জিজ্ঞেসই করে বললো, 'আমরা রোজ বিকেলে বেলা এখানে লেখতে আসি। এখন আপনারা এসেছেন। আমরা তো আর খেলতে পারবো না।' আনুর কথা শুনে বুড়ো হাসলেন।

'কেন? খেলতে পারবে না কেন? কেউ কি নিষেধ করেছে তোমাদের? কেউ কিছু বলবে না। তোমরা আগের মতোই খেলতে পারবে এখানে। অতো বড়ো বাড়িতে আমি আর আবদুল ছাড়া তোর আর কেউ নেই। খেললে কিছু হবে না। আর আমিওতো খেলবো তোমাদের সঙ্গে।' আর কি। বন্ধু হয়ে গেলেন বুড়ো। এখন মজা হবে তপুদের উনিতো আবার ম্যাজিশিয়ানও। বলেন কিনা, 'ওই হতচ্ছাড়া জুয়েল আইচ যদি না জন্মাতো তাহলে আমিই বাংলাদেশের সেরা জাদুকর হতাম। ও ব্যাটাই আমার যত নষ্টের গোড়া।'

তপু বলে বসলো,

'কেন জুয়েল আইচ তো আপনার মতো বুড়ো হয়ে যান নি। আপনি আগে বিখ্যাত হয়ে গেলেই গো হতো।'

'তোমাদের মতো যদি আমার বুদ্ধি থাকতো তাহলে তো হয়েছিলোই। জানো আমি কি ভাবতাম? আমি ভাবতাম আগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার মতো জাদু আবিষ্কার হয়ে নিই তারপর প্রকাশ করবো। দেখি আর আগেই ব্যাটা জুয়েই আইচ বিখ্যাত হয়ে গেছে। দাঁড়াওনা আমি পাখি বানিয়ে ফেলবো তাকে। এ জাদুটা আবিষ্কার হয়ে এলো বলে।'

তপু ঠোঁট উল্টিয়ে দিলো,

'আপনি পাখি বানিয়ে দিলে জুয়েল আইচও যাদ করে মানুষ হয়ে যাবে।'

বুড়ো চোখ কপালে।

'সত্যিই তো! আমি আর তাহলে বিখ্যাত হতে পারবো না? কী করা যায় বলোতো? এবার সবার মুখে জেলের তালা। কোনো জবাব নেই। কী আর করা আনু আর মিশু ব্যাপারটাকে অন্য দিকে ঘোরানোর আবদার করে বসলো ; ম্যাজিক দেখাতে হবে। বুড়ো ঘরে চলে গেলেন। একটা চৌকা টুকরো আনলেন তিনি।

'এটা চিনি দিয়ে বানানো। এখন শুকিয়ে এমন খটখটে হয়ে আছে।'

পকেট থেকে একটা ম্যাচের বাক্স বের করলেন। কাঠি বের করে চৌকা টুকরোটা দিলেন তপুর হাতে।

'কাঠি দিয়ে ঘষে ঘষে জ্বালাওতো।' সবার চোখ অবিশ্বাস। চিনির দলার মধ্যে ম্যাচের কাঠি ঘরে আগুন জ্বালানো যা! তবু একে একে চেষ্টা করলো সবাই। প্রথমে তপু পরে মিশু, আনু, টুলু সবাই চেষ্টা করলো দুবার। কেউ জ্বালাতে পারলো না। এবার বুড়ো চিনির চৌকা দলাটা হাতে নিলেন।

'দেখো কি রকম আগুন জ্বালি আমি।' বলে ঘষা দিলেন কাঠি দিয়ে। আগুন জ্বললো না। পর পর তিনবার এভাবে ঘষলেন। এভাবে জ্বললেতো হয়েছিলোই। সবাই ভাবছে : বুড়ো অ্যায়সা জব্দ! বুড়োও এখন ভাব করছেন যেন আগুন জ্বালাতে না পেরে ভারি লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু চমকে উঠলো সবাই। জ্বলে উঠেছে একটা কাঠি।

বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে। সবার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে ওই বুড়োর। মিশু আর তপু মিলে ঠিক করছে আর বুড়ো বুড়ো করবেনা তাঁকে। দাদু বলে ডাকবে।

সবাই এক কথা রাজি। দাদু ডাকলে কি হবে? উকি এদিকে আবার আস্ত পাজি। ফাঁকে ফাঁকে ঠিকই পড়াশুনার খবর জেনে নেন। টিপু আবার পড়াশুনার একেবারে গাড্ডু মার্কা। ও-ই আবিষ্কার করেছে ব্যাপারটা। করবে না—চোরের মন যে পুলিশ পুলিশ। সবাই ভাবলো এ নিশ্চয়ই বাবাদের কাজ। বাবারা নিশ্চয়ই দাদুকে বলেছে দাদু যেন মাঝে মাঝে সবার পড়ার খোঁজ নেন। শিশু এই গোপন খবর ফাঁস করেছে। মিশুরা বাবা নাকি ওর মাবে বলছিলেন, ওরা ওই বুড়ো ভদ্র-লোকের কথা খুব শোনে। ওনাকে বললরাম মাঝে মাঝে যেন পড়াশুনার খোঁজ খবরও নেন। উনি রাজি হয়েছেন। খুবই ভালো।' মিশু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনে ফেলেছে।

খবরটা শুনে সবাই মিলে ঠিক করলো আর দাদুর কাছে যাব না ওরা। কিন্তু যাবে না বললেই হলো? বেলা ঠিকই গুটি গুটি পায়ে হাজির। দাদুর কাছে যেন হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালার সেই যাদুর বাঁশিটা আছে। না হলে সবাই না গিয়ে থাকতে পারে না কেন? এদিকে দুপুরে ইশকুলের পড়া শেষ না করে এল তার সঙ্গে আড়ি নেন দাদু। ফলে দুপুর বেলাটা পড়েই কাটাতে হয়।

অনেকদিন আগে তপুর ডাবলু মামা গুলতি কিনে দিয়েছিলো ওকে। কিন্তু তপুর হাত সই হয় না বলে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলো। হঠাৎ পুরানো সুটকেসে কি যেন খুঁজতে গিয়ে পেলো গুলতিটা। ওটা নিয়ে একটু আগেই বেরিয়ে পড়রো। তপু। দাদুর বাইরের ঘরটা একদম ফাঁকা। কেউ নেই দরজা খোলা। কি করে ওর মাথায় কুবুদ্ধিটা এলো বুঝতে পারেনি। দাদুর ঘরের এক কোণে একটা মাটির মূর্তি আছে। হঠাৎ তপু গুলতি দিয়ে ওই মূর্তিটার নাক সই করে পাথর ছুঁড়তে তৈরি হলো। মনে মনে ভাবলো আমার হাত তো সই-ই হয় না। কিন্তু পাথরটা হাত থেকে ফসকাতেই অপু অবাক! মূর্তির নাক নেই! ভয়ে তপুর হৃৎকম্প। পা টিপে টিপে গেট দিয়ে বের হয়ে এক ছুট বাড়ি। গুলতি রেখে ঘরে গিয়ে ফ্যাশনের নিচে বসলো ও। দৌড়ে আসার বুক ধড়ফর করছে। কেউ দেখে ফেলেনি তো?

কিছুক্ষণ পর তপু সবার সঙ্গে মিলে আবার বাড়ি গেলো। মিটি মিটি হাসছেন দাদু। দাদুর হাসি দেখে আজ আর ভালো লাগছে না তপুর। ভয়ে কুঁকড়ে আছে সে। যেন এখনই ধরা পড়ে যাবে। সবাই লুকোচুরি খেলতে চাচ্ছে। সে চোর হবে তার চোখ হাত দিয়ে পাহাড়া দেবেন দাদু; যাতে অন্যের কোথায় লুকোয় সেটা দেখতে না পারে। হবি তো হ চোর হতে হলো তপুকেই। শেষবারে রক্ষা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে বলে খেলা শেষ করতে হলো। দাদু বললেন, 'কাল তোমাদের একটা ম্যাজিক দেখাবো। ম্যাজিকটার জন্যে আজকেও তোমাদের কিছু কাজ করতে হবে।'

পকেট থেকে পাঁচটা কাটি বের করলেন দাদু। 'এই পাঁচটা কাঠি আজ তোমরা পাঁচজন নিয়ে যাবে। কাল ফেরত দেবে আবার। আমার ঘরে যে মূর্তিটা আছে ওটার

নাক ভেঙে গেছে। ম্যাজিকটা হলো যার কাঠি এক ইঞ্চি লম্বা হয়ে যাবে সে বলতে পারবে মূর্তির না কি ভাবে ভেঙেছে। আজ সবাই বাড়ি চলে যাও। এটা কিন্তু খুব কঠিন ম্যাজিক। আর একেবারে নতুন।'

কাঠি নিয়ে বাড়ি ফিরে তপুর মনে আরো অশান্তি। যদি দাদুর কথামতো কাঠিটা এক ইঞ্চি লম্বা হয়ে যায়? তাহলে ধরা পড়ে যাবে সে! কী লজ্জার কথা। অমন সুন্দর মূর্তির নাক ভেঙে ফেলেছে। কেন যে কুবুদ্ধিটা এলো মাথা! রাগে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে তার। রাতে ভালো করে ঘুমুতে পারে নি তপু। ছফফট করেছে সারাক্ষণ। দাদুর হাসি হাসি মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে; মনে হচ্ছে দাদু তাকে বলছেন, 'কেমন মজা মূর্তির না ভাঙা?"

সকালে স্কুলে গিয়েছিলো। কিন্তু কাঠির কথা আনু, মিশু, টিপু কাউকেই জিজ্ঞেস করতে পারলো না। পাছে ধরা পড়ে যায় এই ভয়। তপুর হঠাৎ একবার মনে হলো এক ইঞ্চি ছোটো করে ফেললে কেমন হয়। তবে তো বড়ো হলেও আর বোঝা যাবে না। আবার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। যদি সত্যি সত্যি এক ইঞ্চি লম্বা না হয় তাহলে তো আবার ছোট হয়ে যাবে।

তাওতো এই-ই সমস্যা। যতোই সময় যাচ্ছে ততোই বাড়ছে তপুর কষ্ট। বার বার মনে হচ্ছে কেন ওই সুন্দর মূর্তির নাক সই করতে গিয়েছিলো তপু।

কষ্টে অস্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে পারছে না ও। বারবার পানির পিপাসা লাগছে। কিন্তু গিলতেও পারছে না পানি। কান্না আসছে বুক ঠেলে। ধরা পড়ে গেলে কী লজ্জা। কাঁদতেও পারছে না। কাঁদলে যদি দেখে ফেলে সবাই? এখন কি করবে? মনে হচ্ছে একটা ছোটো ঘরে তাকে যেন কেউ বন্দি করে রেখেছে। কিছুতেই বেরুতে পারছে না! দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর! বুক ঠেলে কান্না আসছে শুধু।

দাদুর বাড়ির যাবার সময় হয় নি এখানো। তবু আস্তে আস্তে গুটি গুটি পায়ে এগুলো সে। গিয়ে দেখে দাদু বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন। কারেন্ট নেই। ঘরের ভেতর গুমোট গরম। তপুর মনের অবস্থাও ওরকম গুমোট হয়ে আছে। দাদু দেখলেন মাথা নিচু করে তপু আসছে।

'কী ব্যাপার তপু। এতো আগে? পড়াশুনা শেষ?' মাথা উঁচু করলো না তপু। মাথা গোঁজ করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'কি ব্যাপার তপু। কী হয়েছে তোমার?' দাদু অবাক। ফুপিয়ে উঠলো তপু,

'দাদু....।' বলে শেষ করতে পারলো না। কান্নার দমকে আটকে গেলো কথা। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দাদু,

'কি ব্যাপার তপু। কাঁদছো কেন?'

'দাদু....। ঐ মূর্তিটা; নাকটা....আমি...আমি ভেঙে ফেলেছি।

কাঠিটা কি লম্বা হয়ে যাবে....?

শুনেই হো হো করে হেসে উঠলেন দাদু।

'এই কথা? এজন্য এমন কান্না? বোকা ছেলে। আমিতো আঠা দিয়ে নাকটা আবার লাগিয়ে দিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে মজা করার জন্য ম্যাজিকের কথা বলেছিলাম। আর ওটা তুমি ভেঙেছো। সেটাও আমি সেদিন দেখেছি। ঠিক আছে আর কাঁদতে হবে না। আজ নতুন ম্যাজিক দেখাবো। কান্না থামাও তপু।'

নিজ হাতে দাদু তপুর চোখের পানি মুছিয়ে দিলেন। কারেন্ট এসেছে। তপুকে নিয়ে ঘরের তেতর গেল দাদু তপুর বুকে এতোক্ষণ থাকা দলা পাকানো কান্নার কষ্টটা যেন উড়ে গিয়ে বুকটা হালকা করে দিয়েছে।

আমার আর্থিক উন্নতি

মিজানুর রহমান কল্লোল

ঠিক বলতে পারবনা অর্থই অনর্থের মূল কিনা, তবে ব্যাংকে যাবার মানে যে আগ বাড়িয়ে অনর্থকেই ডেকে আনা তাতে সন্দেহ নেই। আমার অন্তত তাই মনে হয়। ব্যাংকে গেলেই হাত-পা সব যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চায়। সবকিছু ভুল হতে থাকে। সত্যিকথা বলতে কি, ব্যাংকের লোকজনকে দেখলেই আমি কেমন যেন ঘাবড়ে যাই। ব্যাংকের জানালা, টাকা-পয়সা সবকিছু আমাকে কাহিল করে তোলে।

ব্যাংকে ঢুকলেই আমি পুরোপুরি একটা গাধা হয়ে যাই। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি, তবু আমার মাসিক বেতন যখন পঞ্চাশ ডলার ছাড়িয়ে গেল তখন বাধ্য হয়ে আমাকে ব্যাংকে যেতে হলো। কারণ তখন আমার মনে হলো একমাত্র ব্যাংকই হলো আমার ঐ টাকা রাখার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

বেশ এলামেলো পা ফেলে, ব্যাংক কর্মচারীদের দিকে বোকার মতো তাকাতে তাকাতে শেষপর্যন্ত ব্যাংকে ঢুকতে পারলাম আমি। আমার ধারণা ছিল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তাই 'অ্যাকাউন্ট' লেখা কাউন্টারটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কাউন্টারে বসে থাকা লোকটা ছিল বেশ লম্বা ও শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু তাকে দেখামাত্রই আমি ঘাবড়ে গেলাম। কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'ম্যানেজারের সাথে একবার দেখা করতে পারি? একদম একা?'

'একদম একা' কথাটা কেন, বললাম জানি না। কিন্তু তা বলে ফেলার পর আরো যেন ঘাবড়ে গেলাম। অ্যাকাউন্ট্যান্টে লোকটা শান্তভাবেই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখা করতে পারেন।' সে নিজেই আমাকে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেল। ম্যানজার লোকটাও বেশ শান্ত। কিন্তু আমি আরো নার্ভাস হয়ে পড়লাম। পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করলাম ছাপ্পান্ন ডলারের প্যাকেটটা। ধরে রইলাম ওটা। তারপর সেরকম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠেই বললাম, 'আপনিই কি ম্যানেজার?'

ঈশ্বর জানেন আমার এ রকম সন্দেহ হলো কেন।

'হ্যাঁ, বলুন,' উত্তর দিল সে।

'আপনার সঙ্গে কি কথা বলতে পারি? একদম একা?'

ঐ 'একদম একা' কথাটা আমি বলতে চাইনি-তবু তা মুখ ফসকে বেরিয়ে এল।

আমার দিকে তাকালেন ম্যানেজার। সম্ভবত একজন শাঁসাল মক্কেল মনে করল আমাকে। ভাবল, নিশ্চয় তাকে কোনো গোপন কথা বলব। তাই আমাকে তার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, তারপর ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'এখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না,' বলল সে। 'বসুন।'

আমরা মুখোমুখি বসলাম, কিন্তু কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকলাম।

'আপনি নিশ্চয় পিংকারটনদের একজন?' ম্যানেজারই কথা বলে উঠল।

বুঝতে পারলাম আমার হাব ভাব দেখে আমাকে গোয়েন্দা ভেবেছে সে। আর, তার এই ভাবনা আমাকে আরো বেশি ঘাবড়ে দিল।

'না, না, তাড়াতাড়ি বললাম আমি। 'মোটেও গোয়েন্দা নই। আসলে আমি আপনার ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই।'

আমার কথায় কিছুটা নিশ্চিত হলো ম্যানেজার। গভীরভাবে তাকিয়ে আমাকে জরিপ করতে লাগল। সম্ভবত আমাকে একজন ধন কুবের ভেবেছে সে। তাই বলল, 'নিশ্চয় অনেক টাকা জমা রাখতে চান?'

'হ্যাঁ, ফিসফিস করে বললাম আমি। 'তা বলতে পারেন। আপাতত ছাপ্পান্ন ডলার দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই। তারপর প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ ডলার করে জমা দেব।'

আমার কথায় একেবারে চুপসে গেল ম্যানেজার। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বলল, 'মি, মন্টেগোমারি, এই ভদ্রলোক ছাপ্পান্ন ডলার দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চান। আপনি এর ব্যবস্থা করে দিন।' বলেই আমর দিকে ফিরল সে। 'আপনি আসতে পারেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ভেতরর দিকে ঢুকতে গেলাম, কিন্তু সে আমকে কাউন্টারের দিকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। গেলাম সেদিকে। অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাউন্টারে গিয়ে ছাপ্পান্ন ডলারের প্যাকেটটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই যে টাকাটা।'

খুব শান্তভাবে আমার কাছে থেকে ওটা নিয়ে আরেকজনের হাতে দিল সে। একটুকরো কাগজে টাকার পরিমাণ লিখল, তারপর একটা খাতায় আমার নাম লিখে সই করতে বলল। তখনো ঠিক বুঝতে পারছিনা কি করছি আমি। সমস্ত ব্যাংকটাই তখন আমার চোখের সামনে দুলছে। রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে বলি, 'টাকাটা জমা হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখন আমি চেক কাটতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

একটা ছোট্ট জানালা পথে একজন আমার দিকে চেক বইটা এগিয়ে দিল। আরেকজন পাশ থেকে বলে দিল কীভাবে চেক কাটতে হয়। আমার ইচ্ছে ছিল জমাকৃত টাকা থেকে আপাতত ছয় ডলার তুলব। কিন্তু কী লিখতে কী লিখলাম কে জানে। ব্যাংকের লোকজন আমাকে অবশ্য মিলিওনার ভেবেছে। সেভাবেই তাকাচ্ছে আমার দিকে। কর্মচারীটা চেক হাতে নিয়ে অবাক হলো। 'আপনি সব টাকাই তুলে নিতে চান?'

এবার বুঝতে পারলাম চেকটাতে আমি ছয় ডলার নয়, ছাপ্পান্ন ডলার লিখেছি। বুঝলাম, সবকিছু বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। ব্যাংকের সব কর্মচারী তখন কাজ থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই সম্মান বাঁচাতে বললাম, 'হ্যাঁ, সবটাই।'

'আপনি আপনার সব টাকাই তুলে নিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, প্রতিটা পয়সা পর্যন্ত।'

হতভম্ব হয়ে যাওয়া কর্মচারী বলল, 'আপনি আর টাকা জমা রাখবেন না?'

"কক্ষনো না।'

একটা মিথ্যো আশা জেগে উঠল আমার মনে। সম্ভবত ওরা ভাবছে চেক লেখার সময় ওদের কথায় আমি অপমানবোধ করেছি, আর তাই তুলে নিচ্ছি টাকাটা। এই ভাবনায় সন্তুষ্ট বোধ করলাম আমি, বুক টান করে দাঁড়ালাম।

কর্মচারীটি বলল, 'টাকাটা কীভাবে নেবেন?'

'কেন?'

'মানে, জানতে চাইছি কত টাকার নোট দেব।'

এবার বুঝতে পারি তার কথা। তাই বললাম, 'পঞ্চাশ ডলারের নোটে দিন।'

তাই দিল সে। তারপর বলল, 'বাকি ছয়?'

'খুচরো দিন।'

সে তাই দিল। আর তা নিয়েই ব্যাংক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি।

আমার পেছনে ব্যাংকের বিশাল দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন হো হো শব্দের প্রচণ্ড হাসির ঝড়ের মধ্যে পড়লাম। ঐ হাসির ঝড় আমকে তাড়া করতে লাগল। তারপর থেকে আমি আর ব্যাংকে যাইনা। আমার টাকা আমার পকেটেই থাকে। আর বাড়তি যা থাকে তা রেখে দিই একটা মোজার মধ্যে।

[**স্টিফেন লিকক**-এর গল্প অবলম্বনে]

যে দিনে কাট্‌তি

শায়েন খান

সাজ সাজ রব পড়েছে বাসায়। মিশ্‌নার মুসলমানী আজ। বাসার পেছনের আঙিনায় চাদর টাঙিয়ে রান্নার আয়োজন হচ্ছে। তোরাব বাবুর্চির ব্যস্ততা লক্ষণীয় সেখানে। কাকা যদিও ব্যস্ততার ভান করছে, তবুও চোখে মুখে টেনশনের ছাপ স্পষ্ট। শুভ কাজের স্থান নির্ধারিত হয়েছে ছাদে। পুরো ছাদ-টা ডেটল দিয়ে ওয়াশ করা হয়েছে। ছাদের মাঝখানে পাতা হয়েছে চাদর এবং তার মধ্যিখানে একটা বড়সড় চৌকি। এ চৌকিতেই মিশনা চূড়ান্ত মুহূর্তে বসবে। চৌকির দু'পাশে দুটো বাঁদরের মূর্তি রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন কাকা, কিন্তু হাজামের আপত্তিতে সেটা বাতিল করতে হয়েছে। কাকার মতে সিংহাসনের দু'ধারে যেমন দুটো সিংহের মূর্তি থাকে, এই আসনের দু'ধারে দুটো বাঁদরের মূর্তি রাখা উচিত। কেননা, এটা হচ্ছে বাঁদরাসন। তাঁর মতে, মিশ্‌না বাঁদর বৈ কিছুই নয়। অতিরিক্ত ঘি খেয়ে খেয়ে লোমগুলো পড়ে গেছে কেবল।

বেডরুমে মিলি শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। ভয় পেয়েছে ও বেশ। ওকে কাকীমা ও ঋতু যুগপৎ সান্ত্বনা দিচ্ছে। ঋতু মিলির ননদ। আমার সাথে ওর বে-আইনী সম্পর্ক। মানে কিনা, বেয়াইন হয় ও আমার।

এদিকে ড্রইংরুমে তখন অন্য দৃশ্য। থমথমে একটা পরিবেশ সেখানে। হাজাম সাহেব যে সোফায় বসেছেন, মিশ্‌না বসেছে ঠিক তার দুটো সোফা পর। এখানে খালু, ফুলাভাই, ফুয়াদ ভাই, এবং আরও চারজন অপরিচিত লোক বসে আছেন। এই চারজন লোককে খালু তাঁর কারখানা থেকে নিয়ে এসেছেন মিশনার প্রহরী হিসেবে। গত বছর এই সময়ই এহেন এক শুভ কার্যের সময় পালিয়ে গিয়েছিল মিশ্‌না আচমকা। লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল সমস্ত অনুষ্ঠানটি। তাই এবার আর রিস্ক নিতে রাজি হননি খালু।

মিশ্‌নার সাথে মাঝে-মাঝেই চোখাচোখি হচ্ছে হাজাম সাহেবের। আবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দু'জনে। যেন একটু পরেই দু'জনের মধ্যে ডুয়েল হবে। পরস্পর পরস্পরের শত্রুকে দেখে নিচ্ছে তাই। তবে হাজামের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এ ডুয়েলে শেষমেষ তারই জিত হবে। মুখে আস্থার মিটিমিটি হাসিটা সেটাই নির্দেশ করছে।

মিশ্‌নার কাছে অসহ্য ঠেকছে এ হাসিটা। ধীরে ধীরে সে চোখ তুলে চাইল হাজামের দিকে। নিঃশব্দ একটা রূঢ় চাহনি দিয়ে শাসাতে চাইল ও হাজামকে। দমলেন না একটুও হাজাম সাহেব। বরং নিঃশব্দে নিজের অপারেশনের ব্যাগটা খুললেন, আর অতঃপর খামোকাই কাঁচিটা বের করে শূন্যে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাঁচির ধারটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। দু'সেকেন্ডের জন্য কেঁপে উঠল যেন মিশ্‌নার চোখের পাতা। চোখ ঘুরিয়ে নিল ও। ধীরে ধীরে চোখ দুটো ফেলল কারখানার শ্রমিক চারজনের ওপর। নির্দয় চারটে মূর্তি! তামাটে পেটানো শরীর। কোনোভাবেই ওরা ছাড় দিতে রাজি নয় মিশ্‌নাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মিশ্‌নার বুক থেকে।

'আল্লাহর নাম নে,' সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন ফুলাভাই।

'তাতে কি ব্যথা কম পাবে ও কিছুটা?' বলেন ফুয়াদ ভাই। 'তুই আর আমি কি কম নিয়েছিলাম খোদার নাম? মনে নেই কি তোর? তুই তো খোদার নাম নিতে নিতে জিকির তুলে ফেললি, আর শেষমেষ সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটিকে আল্লারে বলে এত জোরে ডাক ছাড়লি যে তাবৎ পাড়া কেঁপে উঠছিল সে ডাকে। পাড়ার সবাই ভাবল বুঝি বা আজান পড়েছে, যদিও আজানের সময় ছিল না সেটা।'

'জানের আজান। মানে কিনা প্রাণের ডাক,' বলেই চোখমুখ খিঁচে একটু কেঁপে ওঠেন যেন ফুলাভাই। তার সেই বেদনাময় স্মৃতিটা ক্ষণিকের জন্যে উদয় হয় যেন তার মনের ভেতর। বলেন, 'আর তুমি তো সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলে পুরোপুরি। আল্লাহকে ছেড়ে বাবা-রে, মা-রে বলে ডাক শুরু করে দিয়েছিলে।'

মিটি-মিটি হেসে হাজাম সাহেব ব্যাগ থেকে এবার একটা বড়সড় ফোরসেপ বের করেন। এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সেটা মুছতে থাকেন ধীরে ধীরে, আর ট্যারা হয়ে মিশ্‌নার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসিটাকে ভিলেন মার্কা বাঁকা হাসিতে পরিণত করেন। রূঢ় চাহনিটা এবার করুণ চাহনিতে পরিণত হয় মিশ্‌নার। করুণ দৃষ্টিতে কি একটা বলার পায়তারা যেন ওর হাজামকে। কিছুই মানতে রাজি নন হাজাম। মুখর বাঁকা হাসিটা আনেকটা বাঁক খেয়ে কুটিল হাসিতে পরিণত হয়।

অসহায় হয়ে পড়ে মিশ্‌না। বাইরে খট্-খট্-ঘট্-ঘট্ মশলা পেষা এবং মাংস বানানর যুগল আওয়াজ। টারজানের একটা ছবির কথা মনে পড়ে যায় মিশ্‌নার। সেই ছবির সাদা চামড়া এক ভদ্রলোকের মত নিজেকে মনে হতে থাকে ওর। সেই ভদ্রলোককে কালো বর্বর দ্বীপবাসীরা ধরে বেঁধে ঠিক এমন ভাবে ভোজ উৎসবের আয়োজন করেছিল দ্বীপটিতে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মিশ্‌না। আর দেরি নয়। শেষ চেষ্টা তাকে করে দেখতেই হবে।

ছিটকে নিজের সোফা থেকে উঠে আসে সে আচমকা।

'আরে, করে কি! করে কি!' লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সকলে! অতন্দ্র প্রহরীদের একজন খপ্ করে মিশ্‌নার কলারটা ধরার পাঁয়তারা করে। ফসকে বেরিয়ে আসে ও। শ্রমিকদের আরেকজন এবার ডাইভ দেয় পলায়নরত মিশ্‌নার পা লক্ষ্য করে, পাক্কা-হা-ডু-ডু খেলোয়াড়ের মত। শরীর বেঁকিয়ে একটা ছোট্ট জাম্প দিয়ে এবারও ডজটা দেয় মিশ্‌না। ড্রয়িং রুমের দরজা থেকে মেইন গেট, আর অতঃপর গেট টপকে হাওয়া! পেছন থেকে কাঁচি হাতে চিৎকার করে ওঠেন হাজাম, 'গেল-গেল! সব গেল!' আর উঠোন থেকে এ দৃশ্য থেকে আর্মি কম্যান্ডাদের মত গমগমে গলায় খালু তাঁর মাস্‌ল ক্যাডারদের কম্যান্ড করেন, 'ফলো হিম আনটিল হি ইজ ক্যাপচার্‌ড!' ছুটে বেরিয়ে যায় চারজন।

বাসার সামনের গলি ধরে দৌড়াচ্ছে মিশ্‌না। পিছে পিছে আসছে চার দানব। ক্রমশ দূরত্ব কমছে ওদের। ওদের সাথে দৌড়ে পারা সম্ভব নয়, বুঝল মিশ্‌না। গলিটা যেখানে এসে মেইন রোডের সাথে মিশেছে সেখানে এসে চট্ করে পাশের এক চায়ের দোকানে সেঁধিয়ে গেল ও চট্‌জলদি। ভেতরে কোনার এক টেবিলে গিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

মেইন রোডে এসেই থমকে দাঁড়াল কম্যান্ডো স্কোয়াডটা। ডানে-বামে তাকাল দ্রুত। 'ওই তো,' চিৎকার করে তর্জনী উঁচিয়ে দূরে কাকে যেন নির্দেশ করল একজন প্রহরী। আর তার পর পর ছুটল সেদিকে চারজনই।

আশ্চর্য হয়ে গেল মিশ্‌না। দোকানের ভিড় থেকে সাবধানে মাথা বের করে উঁকি দিল ও রাস্তায়। উঁকি দিয়ে যা দেখল, তা দেখে চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল ওর।

মেইন রোডের শেষ মাথায় রয়েছে বাস স্ট্যান্ড। আর সেই স্ট্যান্ডে একটি বাস স্টার্ট নিয়ে ছাড়ি ছাড়ি করছে। একটা বাচ্চা ছেলে, মিশ্‌নার-ই সাইজ, একই রঙের শার্ট পরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে বাসটি ধরার জন্য। আর প্রহরী চারজন ছুটছে ওর পিছে পিছে ওকে ধরার জন্যে। সব্বোশ। দুর্ভাবিত হয়ে পড়ল মিশ্‌না। আর ওর ভাবনা শেষ হতে না হতেই ধরা পড়ে গেল ছেলেটা স্কোয়াড-টার হাতে। চারজনে মিলে ধরে নিয়ে আসতে লাগল ওকে। আর ওর নিস্ফল হাত-পা সঞ্চালন কোনোই অর্থ বহন করল না প্রহরীদের কাছে। চট্ করে মাথাটা আবার ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল মিশ্‌না।

এদিকে বাসার ছাদ থেকে এ দৃশ্য দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠল সবাই।

'চালু, চালু,' চিৎকার করে উঠল ফুয়াদ ভাই।

'সাবাস্, মাই এলিজিব্‌ল লেবারস, সাবাস!' চিৎকার করে ওঠেন খালু। 'সুন অল অব ইউ উইল গেট আ প্রমোশন!'

ছাদ থেকে সবাই নেমে আসে নিচে। গেট দিয়ে চার সৈনিক ঢোকা মাত্র কাকা বলে ওঠেন, 'কোনো কথা না, সোজা ছাদে নিয়ে যাও। হাজাম সাহেব, যান ওদের সাথে। আগে কাজ, পরে কথা।'

ছাদে চলে যান তাঁরা তরতরিয়ে। আর একটু পরেই ছাদ থেকে বাচ্চা গলায় একটা চিৎকার ভেসে আসে, 'ভগবান। হরি, ও হরি!'

'অ্যাঁ।' আঁতকে ওঠেন কাকীমা।

'এ তো মিশ্‌নার গলা না,' বলেন কাকীমা কাকাকে। 'আর মিশ্‌না এমন ধারা ডাক ছাড়েওনি কোনোদিন।'

'তাই তো!' তরতরিয়ে ওপরে উঠে আসেন দু'জনে এবারে।

'হোল্ড অন,' চিৎকার করে ওঠেন কাকা। দেখেন বাঁদরাসনে বাচ্চাটাকে বসনো হয়েছে। শ্রমিকরা ধরে রেখেছে ওকে। আর উদ্ধত কাঁচি হাতে হাজাম সাহেব কর্ম সম্পাদনে উদ্যত।

'এ তো মিশ্‌না না,' চিৎকার করে ওঠেন কাকা।

'আমি মিশ্‌না না,' বলেই ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে ফেলে ছেলেটা।

'তোমার নাম কি, বাবা?' আদরমাখা প্রশ্ন কাকার।

'মনোহর বড়াই,' বেশ বড়াই করেই বলে ও।

'হায় আল্লাহ, মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা স্বরে বলে ওঠেন কাকীমা। 'দিয়েছিলে তো এখনি কাজ সেরে? এখনি দিয়েছিলে ছেলেটিকে মুসলমানী করিয়ে। ধর্মান্তরিত হয়ে যেত এখনি ছেলেটি!'

'না, না, তা হয় না, 'বলেন কাকা। 'ছেড়ে দাও ওকে। ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই।'

ছাড়া পেয়েই লাফ দিয়ে ওঠে মনোহর। চোখ মুছতে মুছতে পালিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করে ও। খপ করে এর হাত ধরে ফেলেন কাকামী। বলেন, 'তুমি নিচে চল, বাবা। খাওয়া দাওয়া করে তারপর যেয়ো।'

'খেলে আবার কেটে দেবেন না তো?' কান্না' ভেজা গলায় শুধোয় ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এ কথায় কাকা। বলেন, 'কাটার দিনই তো ছিল আজ, বাবা। সকালবেলা উঠে মুরগি কাটলাম, গরু কাটলাম, মাটি কেটে চুলো বানালাম, কাপড় কেটে ত্রিপল বানালাম, বাঁশ কেটে তার সাথে ত্রিপলকে বেঁধে দিলাম। কিন্তু যে 'কাটা'র জন্য এত কাটা-কুটি, সেই মূল 'কাটা'-টি-ই হল না কেবল। সেই কাটা কাটির আগেই কেটে পড়ল, নচ্ছারটা। আজ আর কাটা হবে না বোধহয়। নিজে কেটে পড়ে সমস্ত আয়োজন-কাটা দিয়ে গেল ও। অতএব, কাটার কথা তুলে কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না, বাবা। তার চেয়ে চল নিচে যাই বরং।'

কাকা আর কাকীমা মনোহরকে নিয়ে নিচতলায় দিকে এগোন!

রিখ প্রজেক্ট

ধ্রুব এষ

কিউমুলাস মেঘ আকাশে উড়ছে।

নীল রঙের আকাশ, সাদা রঙের মেঘ।

দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে আমার কেমন একটু মন খারাপ করল! মন খারাপ, সত্যিকার মন খারাপ করল! এই রকম মেঘ আগেও উড়ত? আমি ভাবলাম। অনেক অনেক কাল আগেও উড়ত? আমি একটা খুব বোকার মতো ভাবলাম এবং আমার আরও মন খারাপ করল। আমি ভাবলাম তবে সমস্ত ঘটনাই আগে একবার ঘটে গিয়েছে? কখনো না কখনো একবার। এই যে আমি এই মেঘমালা দেখছি, দেখে এত মন খারাপ করছি, এই ঘটনাও আগে ঘটেছে। কখনো না কখনো ঘটেছে। নাকি ঘটেনি? ঘটেনি এবং ঘটার কথা না। কিন্তু তারপরও আমি ভাবলাম। কেন যে ভাবলাম! আমার অদ্ভুত অচেনা একটা কষ্ট হতে থাকল ভেতরে ভেতরে। মন খারাপ যদি বলি এটাকে, আমার মন খারপ আরও বাড়ল। আমি আবার সাদা মেঘমালা দেখলাম আর ভাবলাম নরকে যাক সব। আজ আমিও কোথাও যাব না। কিচ্ছু করব না। কোন কিছু না। আমি বসে থাকব এখানে চুপচাপ। বসে থাকার আর মেঘমালা দেখব। কিউমুলাস মেঘ আর চিল। আর ফড়িং। একটা চিল উড়ছে, আমি দেখলাম। একটা ফড়িং উড়ছে, আমি দেখলাম। আর আকাশ, অন্তহীন নীল। ঝিকোচ্ছে রোদ আর মেঘে। আমার মন খারাপ আরও বাড়ল। অথচ এ রকম হওয়ার কথা না। এই অনুভূতি আমার আর কখনো হয়নি। মন খারাপ! এই রকম কিছুই কখনো হয়নি। আমাদের আর কারোর কি হয়েছে? কখনো শুনিনি। তবে? হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটল? আমি ছোট্ট ফড়িংটাকে দেখলাম। চোখ তীক্ষ্ম করে দেখলাম। এবং আবিষ্কার করলাম ফড়িংটা যান্ত্রিক। বাচ্চাদের খেলনা। রিমোট কন্ট্রোল হাতে কোথাও বসে আছে একটা বাচ্চা। তার ইচ্ছে মতো ফড়িংটা উড়ছে। রোদ পড়েছে যান্ত্রিক ফড়িংয়ের ডানায়। ফড়িটাকে একটা সত্যিকার হলুদ ফড়িংয়ের

মতো লাগছে। আমার এটা ভাল লাগল না। হেই বাচ্চা, আমি ভালাম, রিমোট কন্ট্রোল অফ করে এক্ষুণি! আমার কথা কি শুনল বাচ্চাটা? নাকি শুনল না? শোনার কথা না। তবে ফড়িংটাকে আর দেখা গেল না। উড়ে গেছে অন্য কোনদিকে। উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাচ্চাটা। আমি মেঘ আর চিলটাকে দেখলাম। মেঘের কিনার ধরে পাক খাচ্ছে চিল। ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, অনেক আগে কার লেখা কবিতা আমি পড়েছিলাম—

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে।

তুমি আর কোঁদো নাকো উড়ে-উড়ে...

অনেক কাল আগের এক কবি এই অদ্ভুত কবিতাটা লিখেছিলেন। সব মেঘের দুপুরই ভিজে মেঘের দুপুর। আমি ভাবলাম। কিন্তু চিল, চিলের ডানার রং কি সোনালি? না রোদ পড়ে সোনালি দেখায়? এটা অনেকদিন আমি ভেবেছি। এই দুপুরেই মতোই অনেকবার। অথচ না ভাবলেও পারতাম। এনসাইক্লোপিডিয়া আছে কয়েকটা। ওতে চিলের এন্ট্রি থাকবে না হয় না। দেখে নিলে হয় কখনো একবার কিন্তু আমি কখনো দেখিনি। কখনো দেখব বলেও ভাবিনি। কারণ এটা আমার কথা না, অঙ্কবিদ রিশি বলেছেন, যতো বাজে কথার আড়ত হচ্ছে ওই এনসাইক্লোপিডিয়া-টিডিয়াগুলো। রিশি বলেছেন যখন কথাটা মূল্যবান। আমি একবার দেখেছি রিশিকে। ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু কথাবার্তা বলা ঠিক না। আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে তিনি তাঁর উত্তর দেয়ার কথা না, কিন্তু কি মনে করে আমার প্রশ্নর উত্তর দিয়েছিলেন। কখনো কখনো তাহলে এ রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে। আমার মতো সাধারণ একজনের সঙ্গেও কথা হয়ে যায় অঙ্কবিদ রিশির! তাঁকে দেখাই যেখানে ঘটনা! আমি কি প্রশ্ন করেছিলাম রিশিকে?—আপনি কি কবিতা পড়েন? তিনি বলেছিলেন, হুঁ, পড়ি। কার কবিতা? পুরনো কবিতা! এই আর কোনো কথা না। কিন্তু যে কোনো মানুষ কি বলবে না ওটা তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতাগুলোর একটা? সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনাটা হলো আমি রিশিকে দেখেছিলাম একটা পুরনো বই পত্রিকার দোকানে। তিনি একটা পুরনো পত্রিকা খুঁজছিলাম। বাচ্চাদের পত্রিকা!

এই রকম আরও কিছু অভিজ্ঞতা আমার কাছে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না হয়, দ্রুণ আমাকে ফোন করেছিলেন একদিন। এটা এক সকালের ঘটনা আমি আমাদের কর্মপন্থার একটা ছোট্ট গলদ নিয়ে ভাবছিলাম। এই সময় আমার ফোন বাজল। আমি ধরলাম।

'কে মাক্রশ্কা? মাক্রশ্কা বলছো? দ্রুণ বললেন।

আমি দ্রুণের গলা কখনো শুনিনি। আমি কি করে বুঝব তিনি দ্রুণ?

আমি বললাম, 'আপনি কে বলছেন?'

'ও মাক্রশ্কা! মাক্রশ্কা! মাক্রশ্কা! তুমি কেমন আছ।

মাক্রশ্কা?'

'আমি মাক্রশ্কা না, আপনি কে?'

'মাক্রশ্কানা তুমি মাক্রশ্কা না? সত্যি সত্যি তুমি মাক্রশ্কানা?'

'না, আপনি কে?'

'আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত।'

'আপনি কে?'

'আমি দ্রুণ।'

'কে দ্রুণ?' বলেই আমি বুঝলাম কে দ্রুণ? 'কিহ্ আপনি?' আমি বললাম, 'অপনি দ্রুণ! মহাবিজ্ঞানী দ্রুণ? সত্যি সত্যি মহাবিজ্ঞানী দ্রুণ?'

'আমার তো মনে হয়। আমার তো মন হয়।' তিনি বললেন।

'কি সর্বনাশ! আপনি দ্রুণ! আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তুমি বিশ্বাস না করলেও, 'তিনি বললেন, 'আমি দ্রুণ। আচ্ছা আমি কি তোমাকে বিরক্ত করলাম?'

'বিরক্ত স্যার, কি বলছেন আপনি?"

'আমি লজ্জিত, খুবই লজ্জিত। আচ্ছা রাখি।' বলে ফোন লাইন অফ করে দিলেন দ্রুণ। আমি থাকলাম ফোন হাতে নিয়ে। কে বিশ্বাস করবে ভুল করে দ্রুণ আমাকে ফোন করেছিলেন? কেউ না, কেউ বিশ্বাস করবে না!

আমি মন খারাপের কথা বলছিলাম।

আমার মন খারাপ! খুব মন খারাপ!

কিউমুলাস মেঘ দেখে মন খারাপ।

সোনালি ডানার চিল দেখে মন খারাপ।

কিছু করব না।

কোনো কিছু না?

কোনো কিছু না।

এটা খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি।

মন খারাপ!

মন খারাপ হলে কি করে লোকজন?

আমি ফোন করলাম ইয়ুসকে।

ইয়ুস বলল, 'তুমি কি বলছো?'

'হু ইয়ুস।' আমি বললাম, 'আমার মন খারাপ। খুব খারাপ।'

যে কোনো জটিল পরিস্থিতিতে আমরা ফোন করতে পারি ইয়ুসকে। তবে সে কোথায় থাকে কেউ জানে না। আমি তাকে কখনো দেখিনি। এর আগে ফোস করেছি কয়েকবার। সবারই সে ছিল আন্তরিক। এইবারও তার অন্যথা হলো না। যথেষ্ট আন্তরিক গরায় সে বলল, 'তুমি বুছতে পারছো, তুমি কি বলছো?'

'বুঝতে পারছি ইয়ুস।' আমি বললাম।

'কিন্তু এটা তো একটা অসম্ভব ঘটনা।' সে বলল, 'আমাদের কখনো মন খারাপ হয় না।'

'আমার হয়েছে আমি কি করবো?'

'অনুভূতিটা কি রকম বলবে?'

'কি রকম আমি বলতে পারব না। এটা খুব অদ্ভুত। খুবই অদ্ভুত।

আমি কি করব, তুমি কি বলবে?'

'কি করবে, তুমি কি করবে....'চিন্তিত মনে হলো ইয়ুসকে।

'মন খারাপ হলে কি করে লোকজন?' আমি বললাম।

'মন খারাপ হলে? সাইকিয়াট্রিস্ট দেখায়।' ইয়ুস বলল।

'সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'লোকজন দেখায়। কিন্তু তুমি...ইয়ুস বলল, 'তুমি কি মনে কর তুমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলে দেখবে?'

'তুমি কি মনে কর ইয়ুস?'

'দেখা করতে পারো।'

'কিন্তু সেটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে না?'

'আরে না বিপজ্জনক হয়ে যাবে কেন? সাইকিয়াট্রিস্ট কিছু ধরতে পারবে না।'

'ধরতে পারবে না?'

'না। সাইকিয়াট্রিস্টরা সারাণত বোকা লোক হয়। তুমি কে তারা কখনো দেখবে না।'

'তুমি বলছো?'

'বলছি তো, তুমি গিয়ে দেখ না!"

এই প্রথম আরেকটা ঘটনা ঘটল। কথা বলতে বলতে ইয়ুসের একটা চেহারা আমি কল্পনা করলাম। আমার মনে হলো লম্বা, দাড়িওয়ালা সে। উন্নত নাক, পার্পল রঙের চোখ। 'আচ্ছা ইয়ুস' আমি বললাম, 'তোমার চোখের মণি কি পার্পল?'

'হতে পারে' সে হাসল, 'আবার নাও হতে পারে, ঠিক না?'

'তুমি কি লম্বা?'

'সে হাসল।

'দাড়ি আছে তোমার?'

সে হাসল।

'তুমি কিছু বলবে না ঠিক না?'

'তুমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে না?'

'কার কাছে যাব?'

ব্যবস্থা করে দিল ইয়ুসই। আমি একবার ভাবলাম না যাই। তারপর ভাবলাম কেন যাবো না। অবশ্যই যাবো। এছাড়া ইয়ুস হয়ত এটাকে একটা পরীক্ষা হিসাবে দেখছে। কৌতূহলোদ্দীপক একটা পরীক্ষা। এই প্রথম আমাদের মধ্যে কেউ একজনের মন খারাপ হলো। সেটা কেন, কি করে সম্ভব? সাইকিয়াট্রিস্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে ইয়ুসকে।

ইয়ুসের ব্যবস্থা মতো আমি দেখা করলাম একজন বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'তোমার কি সমস্যা?'

'আমার মন খারাপ।' আমি বললাম।

'মন খারাপ? মন খারাপ একটা বাজে সমস্যা।' তিনি বললেন, 'এই প্রবণতা খুব বেড়েছে ইদানীং। যখন তখন মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে লোকের। কেন বলো তো?'

কেন আমি কি করে বলব?

'তোমার মন খারাপ কেন হলো?' তিনি বললেন।

'কিউমুলাস মেঘ দেখে।' আমি বললাম।

'কিউমুলাস মেঘ?'

'আর একটা চিল।' আমি বললাম।

'আর একটা চিল?'

'হুঁ চিল। আর একটা অনেকদিন আগের কবিতা।

'অনেকদিন আগের কবিতা?'

জ্বী।'

'তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না।

'চিল মেঘ এইসব দেখে আমার একটা কবিতা মনে পড়েছিল...।

'ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা। আচ্ছা। বুঝতে পারছি তোমার সমস্যা।

কিন্তু অনেকদিন আগের কবিতা বুঝলাম না!'

'অনেকদিন আগের কবিতা। অনেকদিন আগে একজন কবি এই অদ্ভুত কবিতাটা লিখেছিলেন।'

"অদ্ভুত কবিতা! এইসব কবিতা কেউ পড়ে নাকি এখনো?

'রিশি পড়েন।'

'কে পড়েন?'

'অঙ্কবিদ রিশি।'

'এই কথা কে তোমাকে বলল?'

'রিশি বলেছেন।'

'রিশি? ও।'

যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। রিশি তাঁকেও বলেছিলেন কথাটা। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন আর কি! আচ্ছা আমার চোখের মণি যে সবুজ, ভেরিডিয়ান গ্রীন, এটা কি লক্ষ্য করেছেন ভদ্রলোক, মনে হয় লক্ষ্য করেননি। প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন তিনি, 'এই ধরা এই ওষুধগুলো খেও।'

তিনটা ওষুধ খেলা, আমি দেখলাম।

ফোন করে জানাতে হবে ইয়ুসকে।

'কাজ হবে এই তিনটা ওষুধে?' আমি বললাম।

'কেন হবে না?' তিনটার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ওষুধ দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এই একটা ক্যাপসুলই তোমার মন ভাল করে দিতে পারবে। মস্কিষ্ক সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার এর চেয়ে কার্যকরী ওষুধ আর হয় না।'

'মস্তিষ্ক সংক্রান্ত?' আমি বললাম।

'এ ছাড়া কি? মন খারাপ কি তুমি বলো তো? মনের একটা বিশেষ অবস্থা। এই মনের আবাস মস্তিষ্ক। কোনো কারণে তোমার মস্তিষ্কে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। সেই জটিলতা দূর করে দিতে হবে। তোমার মন ভাল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু'—

'কি কিন্তু?'

'গঠনা যদি এ রকম ঘটে যে—'

'কি রকম ঘটে যে?'

আমাদের মন খারাপ হয় না—আমি বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বললে আরও জটিলতা বাড়বে। আমি বললাম, 'রোবটদের মন খারাপ হয় না?'

'তুমি কি রোবট?'

'কেন রোবটের মস্তিষ্ক থাকে না?'

'রোবটের মস্তিষ্ক? মানসিক মস্তিষ্ক? তুমি কি বলছো বুঝতে পারছো তো? বলো কোনো দিন তুমি শুনছো কোনো রোবটের মন খারাপ হয়েছে?'

বললাম, 'শুনিনি।'

কিন্তু আমার তো মন খারাপ হয়েছে।

কিন্তু এটা আমি কি করে এই লোককে বলব? এক, বললে তিনি বিশ্বাস করবেন না। দুই, অনাবশ্যক কিছু জটিলতা দেখা দেবে আমাদের প্রজেক্টে। রিখতিন দুই শূন্য নয় প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের খবর এখনো না বোকা সোকা পৃথিবীবাসীরা। রিশি, দ্রুণ, আয়ান কেউ না। আমি কেন এই ঝুঁকি নিতে যাব? আমি প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে বেরুলাম। ইয়ুস সব শুনে বলল, 'বললাম না তুমি ধরা পড়বে না।'

'কিন্তু আমার কি হবে ইয়ুস?'

'তোমার আর মন খারাপ হবে না?'

'মন খারাপ হবে না?'

'কোনোদিনসই না। এটা ছিল একটা পরীক্ষা।'

'এটা পরীক্ষা?'

'রিখিয়ানদের মন খারাপ হলে কি হয়, এটা জানা খুব দরকার ছিল আমাদের। শোনো আর মাত্র কয়দিন, রিখিয়ানরা শাসন। ভার নেবে এই পৃথিবীর। এখন পৃথিবীবাসীর আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে তো আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন, না কি?'

'প্রয়োজন ইয়ুস।'

'তোমার এই অবদানের কথা হরিখ গ্রহের ইতিহাস লেখা থাকবে দেখো।'

'এটা কি এত বড় অবদান?'

'বড় অবদান না, কি বলছো? মন খারাপ হলো পৃথিবীবাসীদের দুর্বলতম অনুভূতিগুলোর একটা। মন খারাপ হলে কি করে তারা? অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না? আমরা এই সুযোগটা নেব।' ইয়ুস হাসল।

'কি সুযোগ?' আমি বললাম।

'তাদের সকলের যদি মন খারাপ থাকে, তারা কি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে না?'

'সকলের মন খারাপ থাকবে?"

'আমরা সেই ব্যবস্থা করব। তারপর কি সহজে দেখো না, আমরা শাসন করব এই পৃথিবী। মন খারাপ মানুষ, নিষ্ক্রিয় মানুষ। তারা কিচ্ছু করতে পারবে না।'

'ও। কিন্তু আমার মন খারাপ হলো কেন?'

'প্রয়োজনে। তোমার মন খারাপ না হলে আমরা কি করে এই বিষয়টা জানতাম। অনেক হিসাব নিকাশ করে তবে তোমার মন খারাপের অবস্থা করা হয়েছে।'

'ও তুমি সব আগে থেকে জানতে?'

'শোনা একটা কথা, রিখ প্রজেক্ট কি? গোপনীয় না?'

'গোপনীয় ইয়ুস।'

'তবে তুমি আর কোনো প্রশ্ন করবে না।'

'আচ্ছা করব না।' আমি ফোনন রেখে দিতে যাচ্ছিলাম। ইয়ুস বলল, 'আরেকটা কথা—'

'শোনো, আমরা রোবট হলেও কি? পৃথিবীবাসীদের তুলনায় আমরা তো অনেক উন্নত এবং বুদ্ধিমান। মন খারাপ ছাড়া আর তথাকথিত সমস্ত মানসিক অনুভূতিই আমাদের ছিল। ছিল কিনা বলো?'

'ছিল।'

'এখন মন খারাপও থাকল। পৃথিবীবাসী সকল রিখিয়ানই এখন এই অনুভূতি সম্পর্কে জানবে। অথচ তা কি বোকা দেখো, পৃথিবীবাসীরা, এখন পর্যন্ত একজন রিখিয়ানকেও তারা শনাক্ত করতে পারল না। তাদের সাইকিট্রিস্টও না।'

'প্রজেক্টটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে গেল।'

'এই তো বুঝছো।' ইয়ুস আবার হাসল; 'মন খারাপ প্রজেক্ট।'

'কিন্তু আমার মন খারাপ হয়েছে, মানুষের মতো মন খারাপ, আমি কি মানুষ হয়ে গেঠি ইয়ুস?'

'মানুষ? না মানুষের একটা দুর্বল অনুভূতি শুধু তোমার হয়েছে। তুমি মানুষ হতে পারবে না। কোনো রিখিয়ানই তা কখনো পারবে না। আচ্ছা তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

"ধন্যবাদ ইয়ুস।'

ফোন লাইন অফ করে দিল ইয়ুস।

আমি আবার কিউমুলাস মেঘমালা দেখলাম। আবার সেই চিলটা। মেঘের কিনার ধরে পাক খাচ্ছে শূন্যে ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে। আমার অনেক মন খারাপ হলো। অনেক অনেক মন খারাপ হলো।

ইয়াস বলেছে আমার মন খারাপ হবে না। সেটা কখন থেকে হবে না?

যখন থেকে হবে না তখন থেকে হবে না। কিন্তু মন খারাপ হলে কি হয়? কখনো কখনো একটু মন খারাপ? কথা বলে দেখব ইয়ুসের সঙ্গে? পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এই অনুভূতিটা আমার থাক ইয়ুস। মন খারাপ হোক কখনো কখনো। মন খারাপ। আসলে অদ্ভুত এই অনুভূতি স্পষ্ট। এখন ইয়ুস আমার কথা শুনলে হয়...

লঙ্কাকাণ্ড

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

লঙ্কাপুরীতে মহা হইচই পড়িয়া গেছে। ভোর হইতে বেহারি রাক্ষসেরা শহরময় খবরের কাগজ ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে—এই ভিষোণ কাণ্ড হোয়ে গেলো বাবু, নন্দবাগান মে ভিষোণ কাণ্ডো হোলো—কাঁচালঙ্কা পত্রিকা—আজকের কাঁচালঙ্কা পত্রিকা!

পত্রিকাখাননা লঙ্কা নগরের কাঁচা, অর্থাৎ অল্পবয়সের রাক্ষসেরা বাহির করে, কাজের তার নাম 'কাঁচালঙ্কা' পত্রিকা।

ব্যাপারটা অসাধারণই বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাত্রেই রেডিওতে সে খবর লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিয়া গেছে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের গোড়ার স্বর্গ-মর্ত এবং পাতল—এই তিন মহাদেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে টেনিস কম্পিটিশন হয়, এতদিন ধরিয়া তার সেরা খেলোয়াড় বা চ্যাম্পিয়ান হইয়া আসিতেছিলেন ইন্দ্র। এবার সে জাঁক তাঁর ভাঙিয়াছে—লঙ্কার কুমার মেঘনাদ ফাইন্যালে তাঁকে পর পর তিনটি লাভ সেট দিয়া ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ানশিপ কাড়িয়া লইয়াছে। দেবতাদের নন্দন গার্ডেনের সুবিশাল স্টেডিয়ামে যে পাঁচাশি কোটি দর্শক সে খেলা দেখিয়াছে তারা নাকি মেঘনাদের ফর্ম দেখিয়া হাঁ করিয়া ফেলিয়াছিল। তার সে কী সার্ভিস! টিলভেন, কোশে লজ্জায় রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়াছিল—সে কী ব্যাকহ্যান্ড! লাকোস্ত বোরোত্রার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার উৎসাহও দ্বিগুণ বাড়িয়া চলিল। ট্রামে চাপিয়া যাইবার পথে কেরানি রাক্ষসেরা অনেকেই এক-একখানা কাঁচালঙ্কা পত্রিকা কিনিয়া লইল। কাজগের স্বর্গস্থ সংবাদদাতা টেনিস ম্যাচের হুবহু বর্ণনা পাঠাইয়াছে, কাঁচালঙ্কা পত্রিকা তার উপর টিপ্পনি কাটিয়া লিখিয়াছে—ইটিং কম্পিউশনে (Eating Competition) রাক্ষেসেরা বরাবর প্রথম হইলেও টেনিসে ওয়ালর্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ তাদের কপালে এই সর্বপ্রথম। কুমার মেঘনাদ আজ সমস্ত রাক্ষসজাতির মুখ

উজ্জ্বল করিলেন। সকলের ধারণা ছিল টেনিস ম্যাচে ইন্দ্র অজেয়। সেই ইন্দ্রকে তিনি পরাজিত করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে 'ইন্দ্রজিৎ' উপাধি দেওয়া হউক।

রাবণ রাজার মনে আনন্দ আজ আর ধরে না। ছেলে এত বড়ো দিগ্বিজয় করিয়া দেশে ফিরিতেছে, তার জন্য একটা জাঁকালো গোছের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তা ছাড়া, মহারাজের ইচ্ছা কুমার দেশে ফিরিলে এই উপলক্ষে খুব উঁচুদরের একটা গার্ডেন পার্টিও দেওয়া হয়। আজ প্রাতেই তিনি মেঘনাদের 'ওয়ারলেস' পাইয়াছেন, ইন্দ্র ভদ্রতা করিয়া তাঁর নিজস্ব এরোপ্লেন 'দি পুষ্পাক' খানা দেশে ফিরিবার জন্য তাকে দিতেছেন।

কিন্তু গতকল্য পাইলট মাতলি এক মোটর অ্যাকসিডেন্ট কাবু হইয়া পড়িয়াছেন, ডাক্তার অশ্বিনীকুমারকে কল দেওয়া হয়েছিল—তিনি বলিয়াছেন, আঘাত গুরুতর নয়—দু-চার দিনের মধ্যে তাহারা রওয়ানা হইতে পারিবে।

রাবণ বড়োই ব্যস্ত। সেই যে ভোরবেলা তিনি চায়ের সঙ্গে খানকত তিমি-কাটলেট (চিংড়ি-কাটলেট নয় কিন্তু) এবং ঘোড়ার ডিমের ওমলেট খাইয়া প্রাইভেট সেক্রেটারি ঘটন-চৌকশের সহিত পরামর্শে বসিয়াছেন, তারপর কত বেলা হইয়া গেছে সেদিকে তাঁহার হুঁশই নাই। মাঝে রোদের তাত যখনই খুবই বাড়িয়া উঠে তখন অন্দর হইতে মন্দোদরী টনখানেক বেঙ্গল কেমিক্যালের লেমন সিরাপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রানি এখন পস্তাইতেছেন, কেননা শরবত পেটে যাওয়ার পর বার বার তাড়া দিয়াও তিনি আর এখন রাবণকে স্নানে পাঠাইতে পারিতেছেন না। অথচ তাঁর নিজের বড়োই ক্ষুধা পাইয়াছে।

দিন দুয়ের মধ্যেই খবরের কাগজের মারফতে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল তিন মহাদেশেই সংবাদ রটিয়া গেল—কুমার মেঘনাদের ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দরুন রাবণ এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিতেছেন। দুনিয়ার সমস্ত জাতেরই বাছা বাছা লোকেরা সে—ভোজে নিমন্ত্রণ হইবে, এমনকি মুনিঋষি এবং ব্রাহ্মণদের জন্যও আলাদা বন্দোবস্ত থাকিবে। কণ্ব মুনির আদুরে মেয়ে শকুন্তলা বাপকে ধরিয়া পড়িয়া মালিনী নদীর পারে জঙ্গলের মধ্যেই এক রেডিও বসাইয়াছিল—তার এবং তার সখীদের অবশ্য উদ্দেশ্যে ছিল কটকের 'উড়িয়া সঙ্গীত সম্মেলনী'তে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যে উঁচুদরের সঙ্গীত আলাপ হয় তাহাই শ্রবণ করা। কাজেই তপোবনে খবরের কাগজ না আসিলেও শকুন্তলার রেডিওতে রাবণের ভোজের কথা প্রকাশ পাইয়া গেল। শুনিয়া মুনিষষিরা তো ভারী খুশি! দুর্বাসা ঋষির মেজাজ সেদিন অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা দেখা গেল, সারাদিন তিনি একবারও রাগিলেন না বা কাউকে শাপ দিলেন না। অষ্টাবক্র মুনি একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। আর নারদ তো খবর শুনিয়া নিজের ভাবে এমনি মশগুল হইয়া গেলেন যে, যেদিন পাড়ায় টহল দেওয়ার কথা তাঁর একবারও মনে আসিল না। কাজেই ঋষিবালকদের ডাংগুলি খেলায় সেদিন একটু মারামারি হইল না বা কাহারও মাথা ফাটিল না। ফলে কিষ্কিন্ধ্যা নগরের সুষে ডাক্তার আর আমরা নগরীর অশ্বিনীকুমার সেদিক হইতে কোনো কল না পাইয়া মনমরা হইয়া ফিরিতে লাগিলেন তার উকিলরা পরস্পর এই বলিয়া জটলা পাকাইতে

লাগিলেন যে, নারদ এভাবে ঘরে বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের নির্ঘাত অনাহারে মরিতে হইবে। আর কষ্ট পাইল এক নিরীহ বেচারি—নারদের বাহন ঢেঁকিটি। বহুদিন বাদে হাতে পাইয়া ঋষিপত্নীরা তাকে দিয়া পঞ্চাশ মণ নিবার ধান ভানাইয়া লইলেন। এদিকে কলিকাতায় বড়ো বড়ো ওষুধের দোকানগুলি—যেমন বটকৃষ্ট পাল, বাথগেট প্রভৃতি একেবারে ফাঁপিয়া উঠিল, কেননা খবরের কাগজে রাবণের সদিচ্ছার কথা শুনিতে পাইয়াই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেরা অনেক টাকার ক্যাস্টর অয়েল কিনিয়া ফেলিলেন।

ভোজের দিন ক্রমেই আগাইয়া আসিতে লাগিল। কোনো দেশ হইতে কে কে আসিবেন কাঁচালঙ্কা পত্রিকায় প্রত্যহ জল্পনাকল্পনা চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ বেশ একটু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল।

ভোজের ঠিক আগের দিনকার কথা। রাবণ প্রাতে চা-পানান্তে ড্রইংরুমে বসিয়া সবে একটি স্বদেশি বিড়ি ধরাইয়াছেন, এমন সময় উসকোখসকো চুলে, শুষ্ক মুখে তাঁর সেক্রেটারি ঘটন-চৌকশ আসিয়া উপস্থিত। তাকে সে অবস্থায় দেখিয়া রাবণ ভয় পাইয়া গেলেন, কহিলেন, ব্যাপর কী ঘটন-চৌকশ?

হুজুর, কাল বোধ করি ভোজ দেওয়া চলবে না, তারিখ পিছিয়া দিতে হবে।

হুজুর ভীষণ চটিয়া গেলেন—হোয়াট ননসেন্স! তাহলে আমার মানসম্মান কোথায় থাকবে শুনি? বিশ্বের বড়ো বড়ো লোকদের সব নেমন্তন্ন করা হয়েছে—সবাই তাঁরা 'বিজি' (ব্যস্ত) লোক, হাজারো রকমের কাজ আছে—এক হপ্তা আগে থেকে তাঁদের সব কাজে প্রোগ্রাম ঠিক করা থাকে। তাঁদের ওকথা বলা চলে?

তবে হুজুর কয়েক লাখ মোহর আমায় এখুন সংগ্রহ করে দিতে হবে। পনেরো দিন মাথা খাটিয়া যতরকম খরচা হওয়া সম্ভব সমস্তই আমি ভেবে রেখেছিলাম—সমুদ্রের ধারে সামিয়ানা টাঙাবার খরচা, অতিথিদের গায়ে আতর ছিটিয়ে দেবার খরচা, আঁচাবার পর তাঁদের সোনার খড়কে জোগাবার খরচা, 'দি গ্রেট লঙ্কা বিড়ি কোম্পানি'র বিলের খরচা—কিছু বাদ পড়েনি; শুধু একটা কথা আমার আদবেই স্মরণ ছিল না। যাদের নেমন্তন্ন করে আনা হচ্ছে তাঁদের যে খেতে দিতে হবে আর তার জন্য আরও একটা খরচা হবে সেটা আমার এতদিন খেয়ালেই আসেনি। আজ ভোরে যেই সেকথা মনে হয়েছে অমনি কোষাধ্যাক্ষের বাড়ি ছুটেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন—কাল সন্ধের আগে অত টাকা জোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব।

শুনিয়া রাবণের মুখ চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল—অত টাকা তিনি এখন হঠাৎ পান কোথা? তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—এ. কে. ফাইভ থ্রি সেভেন প্লিজ!

হ্যালো...অলকাপুরী এটা? কুবেরদাদার সঙ্গে একটু কথা কইতে চাই—তাঁকে বলুন লঙ্কা থেকে তাঁর ছোটো ভাই রাবণ ফোনে ডাকছে।....হ্যালো, কে কুবেরদা নাকি? হ্যাঁ, আমি রাবণ। ভারী মুশকিলে পড়ে গেছি লাখ দাদা, রাখ কয়েক মোহর নইলে আর আমার মান থাকছে না...কী? ব্যাঙ্ক অব অলকা ফেল পড়েছে? কাল? এই সেরেছে। হতাশভাবে রাবণ টেলিফোন রাখিয়া দিলেন।

কুবেরের সহিত রাবণ যখন ফোনে আলাপ করিতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই রাজবাড়ির সম্মুখে বেশ একটি ছোটোখাটো দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা দিয়া এক খ্যাপাটে চেহারার বুড়া রাক্ষস চক্ষু দুটিকে ছানাবড়ার মতো করিয়া সামনের দিকে অনির্দিষ্টভাবে হাঁটিয়া চলিয়াছে, আর তার পিছনে একদল রাক্ষস বালক হাততালি দিতে দিতে, কখনো তার গায়ে ধুলা ছিটাইয়া, কখনো তার ল্যাজ টানিয়া, কখনো বা তার মাথায় চাঁটি মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তা, বালকদের ইহাতে বড়ো বেশি দোষ দেওযা চলে না, যে চেহারা লইয়া বুড়া রাক্ষসটি রাস্তায় বাহির হইয়াছে তাতে ছেলে তো ছেলে, সুসভ্য রাক্ষসদের দেশে না হইয়া অন্য দেশে হইলে বড়োর দল পর্যন্ত তার পিছনে লাগিত। বুড়ার সমস্ত মুখে দাড়িগোফের জঙ্গল, হাতের দু-মুঠায় গুটি দশ-বারো মরা জানোয়ার, তাদের টুঁটি কামড়াইয়া সে যে রক্ত চুষিয়া লইয়াছে এখন পর্যন্ত তার দুই কষে সে রক্তের সুস্পষ্ট দাগ। পরনে যে জিনিসটি সেটি দেখিলে শিশুও আঁতকাইয়া উঠিবে। রাবণ টেলিফোন নামাইয়া রাখিতেই সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল, মনে হইল তিনি যেন একটু চমকাইয়া উঠিলেন। টি-পয়ের উপর হইতে তাড়াতাড়ি বাইনোকুলারটি চোখে লাগাইয়া সেদিকে তিনি তাকাইলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত মুখখানা তাঁর অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। বেহারাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সেই জংলি রাক্ষসটাকে তাঁর সম্মুখে হাজির করিতে আদেশ করিলেন।

জংলি রাক্ষস ঘরে আসিয়া ঢুকিল, বেশ একটু ভীতভাবেই। প্রথমটা চোস্ত শেভ-করা চশমা আঁটা রাবণকে সে ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু পরমুহূর্তেই একেবারে পরম ভক্তিভরে তাঁর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

বুড়ার নাম বিকট-কটাস। কেনই বা রাবণ তাকে ডাকাইলেন আর সে-ই বা কেন অমন উচ্ছ্বসিতভাবে তাঁর পায়ে পড়িয়া গড় করিল তাহা বুঝিতে হইলে কয়েক লক্ষ বছর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। সে সময়ে এই বিকট-কটাহইল ছিল বারণ রাজার পাকশালার চার্জে। সে যে শুধু রান্নাই করিত অতি উপাদেয় তাই নয়, তার আরও এমন একটা অপূর্ব গুণ ছিল যার ফলে রাবণ রাজার প্রত্যহ অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইত। কী সে গুণটি বলিতেছি।

এ সময় রাক্ষসদের মধ্যে একটা নিয়ম চলতি ছিল—গোঁফ গজাইবার আগে প্রায় সকলেই গিয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিত। ব্রহ্মা সাধাসিধা ভালোমানুষ, দুটি খোসামুদে মিষ্টি কথা শুনিয়াই একেবারে গলিয়া যাইতেন, কাছে গিয়া বলিতেন—বৎস, কী চাই তোমরা? ব্রহ্মার হাতে অনেকখানি ক্ষমতা, রাক্ষসেরা তাই সুযোগ পাইয়া বলিত—'আমায় অমর করিয়া দিন, 'আমায় দিগ্বিজয়ী করিয়া দিন'—ইত্যাদি। চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া ব্রহ্মা প্রায়ই রাজি হইয়া যাইতেন। তারপর শুরু হইতে রাক্ষসদের প্রতাপ।

বিকট—কটাহও ছোকরা বয়সে ব্রহ্মাকে খুশি করিয়া বর চাহিয়াছিল—যখন যে খাবার জিনিস সে যতখানি চাহিবে তখনই যেন সে জিনিস ততখানিই তার সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু, বলিয়াছিলেন আর কি—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রের নন্দনকাননের মালি ছুটিয়া আসিয়া ঘোরতম আপত্তি জানাইল। কহিল—ওরূপ

সর্বনেশে বর দিলে দেবরাজের বাগানের একটি ফুলকপি, বাঁধাকপি বা শালগমও বিক্রি হইবে না, বাগান নির্ঘাত ফেল পড়িবে। ব্রহ্মা তখন দু-জনকেই খুশি করিবার জন্য বিকট-কটাহকে বলিলেন—আচ্ছা বাপু, তোমাকে একটা মন্ত্র দিচ্ছি, পাঁচ ঘন্টা ধরে এই মন্ত্র জপলে তুমি যা চাইছ তাই হবে। মালিকে কানে কানে বলিলেন, ও ব্যাটা রাক্ষস, পাঁচ ঘন্টা ধরে দেবতার নাম জপ ওর ধৈর্যে কুলোলে তো?

কথাটা পাঁচ কান হইতে হইতে শেষে রাবণের কাণে গিয়া উঠিয়া, অমনি তিনি মনে মনে টাকা বাঁচাইবার ফন্দি আঁটিয়া বিকট-কটাহকে ডাকইয়া হেড বাবুর্চির পদ দিলেন। বিকট-কটাহের চাকুরি হইল বটে, কিন্তু সেই যে ইন্দ্রের মালীর উপর সে চটিয়াছিল, সে রাগ আর তার গেল না। একদিন তাই সুযোগ পাইয়া মালীর পোকে ধরিয়া সে ফলার করিতে যাইতেছিল, কিন্তু দেবরাজ টের পাইয়া দারুণ চটিয়া গেলেন, শাপ দিলেন—যা ব্যাটা, তুই পাথর হয়ে পড়ে থাক গে! রাক্ষস তখন ইন্দ্রের গায়ে পড়িয়া খুব একচোট কাঁদাকাটি করিল। দেখিয়া দেবরাজের রাগও পড়িয়া আসিল। তিনি বলিলেন, আচ্ছা যা যা, তোদের যুবরাজ মেঘনাদ যদি কোনোদিন আমাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হারাতে পারে তবে তোর শাপমুক্তি হবে। সেই হইতে আজ এত যুগ ধরিয়া বেচারা অচেতন পাথর হইয়া ছিল, টেনিস খেলায় ইন্দ্রের হার হওয়ার সে আবার রাক্ষসদেহ ফিরিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু লঙ্কার ফিরিয়া আসিয়া বিকট-কটাহের অবস্থা হইল বাস্তবিকই সঙ্গিন। সে তো আর জানে না যে তাদের সেকেলে বর্বর জাতি এখন কতটা সুসভ্য হইয়াছে। রাস্তায় ট্রাম-বাসের হুড়াহুড়ি, মোটরর ভোঁ ভোঁ, বাইকের ক্রিং ক্রিং—বেচারা প্রায় আবার পাথর বনিবার উপক্রম! ঠিক এই সময়েই রাবণ আরদালি পাঠাইয়া তাকে ডাকাইলেন। রাবণ বলিলেন, বড়োই সুসময়ে তোমার দেখা পেলাম বিকট-কটাহ! কাল আমি খুব বড়ো একটা ভোজ দিচ্ছি, দুনিয়ার অনেক লোক আসবে। রান্নাঘরের ভার নিতে হবে কিন্তু তোমাকে, অবশ্যি বিনি-খরচায় চালাতে হবে।

বিকট-কটাহ ঠিক বুঝিতে পারিল না। রাজা বলিতেছেন, অনেক লোক আসবে, তবে আর খাবার জিনিসের অভাব কী? তাদের ধরিয়া পেটে পুরিলেই তো হইল! রাবণ হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সে দিনকার এখন আর নাই, এখন ত্রিভুবনের মানুষ-রাক্ষণ দেবতা-যক্ষ-কিন্নর-বানর সব বন্ধুভাবে বাস করিতেছে। বুড়া বিকট-কটাহ অবশ্য রাজি রইল, তবে খুব খুশি হইয়া নয়। মানুষ আর বানর—এই দুইটিই তার প্রিয় খাদ্য। খাদ্যের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব কী?

পরের দিন ভোজ। লঙ্কা নগরীতে যেন হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রাজকর্মচারী রাক্ষসদের আর মরিবার ফুরসত নাই, তারা বিড়ি মুখে একবার আসিতেছে রাজবাড়িতে আর একবার যাইতেছে সমুদ্রের ধারে—যেখানে সুবিশাল সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। বেলা নাগাদ সাড়ে বারোটার সময় রাবণ বিকট-কটাহকে লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন—এইবার তবে বিকট-কটাহ, তুমি জপে বসে পড়ো। ঠিক ছয়টায় সময় ভোজ আরম্ভ হবে, তার আগেই তোমার সমস্ত সেরে ফেলা চাই।

'ছয়টার সময়' কথাটা বিকট-কটাহ বুঝিতে পারিল না, বলিল—মোটে ছয়টা কী, অন্তত ছ-শোটা পদ না হলে কী রাবণ রাজার ভোজ মানায়। রাবণ হাসিয়া বলিলেন—ছয়টা পদের কথা হচ্ছে না, ঘড়িতে ছয়টা বাজবার কথা হচ্ছে, রান্নাঘরে একটা প্রকাণ্ড সেন্ট টমাসের ঘড়ি ছিল, সেটির কাছে গিয়া রাবণ ব্যাপারটা সংক্ষেপে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন—এই যে কাঁটাদুটো দেখছ, এদুটো ক্রমাগত ঘুরছে। ছোটো কাঁটাটা এখানে (তিনি ছয়ের অঙ্কটা দেখাইয়া দিলেন) আর বড়ো কাঁটাটা এই জায়গায় (সঙ্গে সঙ্গে বারোর অঙ্কে হাত দিলেন) এলেই ছয়টা বাজা হল। ও দুটো ওখানে যাবার আগেই তোমার কাজ সারতে হবে; কাজেই এক্ষুণি তুমি জপে বসো। খাবার জিনিসের লিস্টি এই রইল, জপ সারা হলে এগুলো পড়ে জিনিস আমদানি করবে।

বিকট-কটাহ সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া বলিল, আমি তবে এবার ভেতর থেকে দরজা এঁটে জপে বসি। দরজা-জানালা খোলা থাকলে আর আমার জপ সারা হবে না। রাস্তা দিয়ে মানুষগুলো হেঁটে যাচ্ছে দেখলেই আমার সব মন্ত্র গুলিয়ে যাবে, ইচ্ছে হবে ছুটে গিয়ে ওগুলোকে টপপট গালে পুরি।

রাবণ হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তবে দরজা-জানালা এঁটেই বসো।

বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত সমুদ্রতীরের বিরাট সামিয়ানা একেবারে শূন্য। নিমন্ত্রিতেরা সকলেই কাজের লোক, ফলার সারিবার জন্য কেহ তো আধ ঘন্টা আগে আসিয়া আড্ডা জমাইতে পারেন না। পৌনে ছয়টা বাজিবার পরেই কিন্তু লঙ্কার আকাশ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন, জেপেলিন মাথার উপর উড়িতে লাগিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নিমন্ত্রিত জনগণে সামিয়ানা ভরিয়া, গেল। স্বর্গ, মর্ত, পাতালের চাঁইদের কেহই আর বাদ নাই। ইন্দ্র, কুবের, নারদ, দুর্যোধন, বাসুকী, চিত্রসেন—কত নাম করিব? সকলেই মুখ খুব ব্যস্ত ভাব; পরস্পর আলাপ-পরিচয় করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে ডায়েরি খুলিয়া হাতের ঘড়ির দিকে তাকাইতেছেন। এখনও কার কত এনগেজেমেন্ট সারা বাকি আছে প্রধানত সেই কথাই চলিতেছে। রাবণ ও মেঘনাদ সহাস্যে সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করিতেছেন, ঘটন-চৌকশ আশ্বাস দিতেছে—পাংচুয়ালি ছয়টার সময় সে সকলকে খাইবার সামিয়ানার নিচে লইয়া যাইতে পারিবে।

ছয়টা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকি, রাজকর্মচারীরা রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিকট-কটাহ তখনও দরজা খোলে নাই, দেখিতে দেখিতে ছয়টা বাজিয়া গেল, তবু বিকট-কটাহের সাড়াশব্দ নাই। কিন্তু আর অপেক্ষা করা অসম্ভব। সকলেই ঘন ঘন দরজায় ঘা দিতে লাগিল। ভিতর হইতে এবার আওয়াজ আসিল—আঃ থাম না বাপু! আর এখন দরজা খোলবার জন্যে উঠে যেতে পারিনে, তাহলেই ছয়টা বেজে যাবে।

ঘটন-চৌকশ ক্রুদ্ধ হইয়া এক লাথিতে দরজা ভাঙিয়া ফেলিল। ভিতরে গিয়া সবাই দেখে, সেন্টমাসের ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা আটান্ন মিনিট পর্যন্ত যাওয়ার পর বিকট-কটাহ কাচ ভাঙিয়া মিনিটের কাঁটাটাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে, আর বিড়বিড় করিয়া

নিজের মনে মন্ত্র আওড়াইতেছে। রাজকর্মচারীরা ঘরে ঢুকিতে সে একটু মুচকি হাসিয়া কহিল—ভয় পাচ্ছ কেন, ছয়টা বাজতে দেব না, এই দেখ ধরে আছি—কাঁটার সাধ্য কী আর নড়ে! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই জপে বসতে দেরি হয়ে গেছিল। প্রহর খানেকের ভেতরেই মন্ত্র পড়া সারা হয়ে যাবে। মহারাজকে ভাবনা করতে বারণ করগে যাও। জপ সারা হলে তবে কাঁটা ফের এগুতে পাবে—ছয়টা বাজবে।

ঘটন-চৌকশ মাথায় হাত দিয়ে সেইখানে বসিয়া পড়িল। হইচই শুনিয়া রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার বুঝিয়া চোখে সরিষাফুল দেখিলেন। তার ইচ্ছা হইতেছিল ঘুসি মারিয়া বিকট-কটাহের কর্ণপটহ ফাটাইয়া দেন। কিন্তু বিপদের সময় মাথা গরম করিলেই মুশকিল, তাই তিনি তাড়াতাড়ি সামিয়ানার দিকে চলিয়া গেলেন।

নিমন্ত্রিতেরা ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিলেন, রাবণকে পাংশু মুখে সামিয়ানার নিচে ফিরিতে দেখিয়া সকলে উদ্বিগ্নভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাপারটা তখন প্রকাশ পাইয়া গেল। সকলে সহানুভূতির সুরে বলিতে লাগিলেন—আহা হা, তাতে আর কী হয়েছে? খাওয়াটাই তো আর সব নয়, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা হল, এ-ই তো ঢের। আপনি ও নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না, ইত্যাদি। কেবলমাত্র ইন্দ্র মুখ মুছিবার ছলে রুমালটা ঠোঁটের উপর চাপিয়া ফিক করিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু ভোজের জন্য অপেক্ষা করা তো কারোই সম্ভব নয়। ঠিক দশটার সময় ব্যাঙ্ক অব অলকার ডিরেক্টরদের লইয়া কুবেরকে মিটিং করিতে হইবে, বারোটায় চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা বন্ধ করেন, কাজেই যমরাজের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার; নয়টার সময় নারদের ত্রিচিনপল্লি ব্রডকাস্টিং ক্লাবে বীণা বাজাইবার এনগেজমেন্ট; সাড়ে নটায় যুধিষ্ঠিরের বৈঠকখানায় সকলে পাশা খেলিতে আসিবেন; সুষেণ ডাক্তারের জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় কত রোগী বসিয়া আছে কে জানে; আর সূর্যদেবকে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আমেরিকায় পৌঁছিতে হইবে—সেখানে এখন শেষ রাত্রি, গোটা আষ্টেকের মধ্যে বেলা করিতে না পারিলে, যে দুরন্ত বৈজ্ঞানিক জাতি—বাঘা এডিসনের জাতভাই—কী যে করিয়া বসে কে জানে। মিনিট পনেরোর মধ্যে লঙ্কাপুরী শূন্য করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন, জেপেলিন আকাশে উঠিল।

উঠিলেন না কেবল বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেরা। তাঁরা স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন, ক্যাস্টর অয়েলের দাম না পাইলে তাঁরা নড়িবেন না।

রাবণ কৌচের উপর এলাইয়া পড়িয়া ঘটন—চৌকশকে পেনাল কোডখানা আনিবার হুকুম করিলেন। বিকট-কটাহকে আইনের কোন ধারায় ফেলা যায় তাহাই তিনি দেখিবেন।

গুণের আদর

গোলাম রহমান

নতুন চাকরটাকে নিয়ে ভারি মুশকিল পড়া গেছে! হরদম এটা-সেটা ভুল করে বসছে। তার জন্যে বকুনিও খাচ্ছে খুব। কিন্তু উপায় নেই—এই কয়দিনের মধ্যেই ব্যাটা আব্বাস সুনজরে পড়ে গেছে। ওর ওপর আব্বার কেমন যেন একটা মায়া লক্ষ্য করছি। ওর হাবাগোবা ভাব আর গরুর মতো নিরীহ চোখ দুটোর দিকে তাকালে আমার নিজেরও খুব মায়া হয়। নেহায়েতই গো-বেচারা! দোষের মধ্যে কেবল কানে একটু খাটো। সে জন্যেই তার ওপর আমার রাগ।

পয়লা দিন ছোট চাচা এলেন। উনি শুকরকে দেখতে পেয়ে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন; ও, এই ছোঁড়টাকে বুঝি নতুন চাকর রেখেছে ভাবী?

আম্মা বললেন : হ্যাঁ, সপ্তাহ দুয়েক থেকে ও এখানে কাজে লেগেছে। সুনিম সাহেব ওকে পাঠিয়েছেন। ওর ভাই না কেন যেন ওদের বাড়িতে কাজ করে।

: বেশ তো ভালো কথা। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে কথা হচ্ছে, সাবধান থাক ভালো। কথায় বলে, 'সাবধানের মার নেই।' ছোট চাচা বললেন : ওর নামটা এক্ষুণি রেজিস্ট্রি করিয়ে আনো থানা থেকে। দিন কাল ভালো না। কাউকে বিশ্বাস নেই।

আম্মা আবার অত ইংরেজি কথার মানে-মতলব বোঝেন না। বললেন : তাই-ই করাব। তবে এত তাড়াতাড়ি কী? একটু পুরোনো-টুরোনো হোক—বছর খানেক কাম কাজ করুক তখন দেখা যাবে।

ছোট চাচা বললেন : সে কী ভাবী!—পুরোনো হলেই ল্যাঠো চুকে গেল। তার জন্যে আবার রেজিস্ট্রি কীসের?

আম্মা আর সে কথায় কান দিলেন না। জোরে জোরে ডাক দিলেন : শুকর—ও শুকর—

শুকর সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে লুঙি আর কোমরে গামছা বাঁধা। আম্মা বললেন : বাইরে দোকান থেকে ভালো জর্দা নিয়ে আয় এক ভরি—এই পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে।

ছোট চাচা ভয়ানক পান চিবোন। তাঁর আবার ভালো জর্দা না হলে চলে না।

আম্মার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে শুকুর বেরিয়ে গেল।

তারপর পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু শুকরের কোনো পাত্তাই নেই। কোথায় গেল হতভাগা? রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসে নি তো! আমরা সকলেই ভাবনায় পড়লাম। আর তা ছাড়া জর্দার দোকান ত কাছেই। এতক্ষণ ও কী করছে? এই সব সাত পাঁচ ভাবছি, এমন সময় পাঁচ গজ পর্দার কাপড় কিনে হাজির হল।

পঞ্চানন কাকুর গাড়ি

অমল সাহা

সেদিন আমাদের বাড়িতে মহা হুলস্থুল লেগে গেল। এই কাণ্ড আমরা জন্মের পর আর কখনও দেখি নি। রতন কাকুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ছোটকা তোমরা দেখেছ আর কখনও?

রতন কাকুর মেজাজ বোধহয় খিচড়ে ছিল। বুঝতে পারি নি। আমাদের দিকে এমন অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে তাকালেন, আমরা তার কিছু না বলে মানে মানে সরে পড়লাম।

কাণ্ডটা আর কিছুই নয়। আমাদের পঞ্চানন কাকু দুপুরে একটা গাড়ি কিনে বাড়ি ফিরছেন। খেলনা গাড়ি নয় চার চাকার আস্ত গাড়ি, চাকা ঠিক ঠিক চারটেই। অবশ্য চালিয়ে নয়। পাঁচজন লোক ঠেলতে ঠেলতে গাড়িটা উঠোনে হাজির করেছে। বোধহয় লোকগুলো দেখেনি, গাড়িটা উঠানোর কোণে রাখা দুটা গোলাপ কলমের টব ভেঙে দিয়েছে। আর বোধ হয় এই জন্যই রতন কাকুর মন খারাপ। কিন্তু পরে বুঝেছি কেন রতন কাকু ভয়াবহ রাগ করেছিলেন।

গাড়ি ঠেলার লোকগুলো টাকা নিয়ে চলে গেল। পঞ্চানন কাকু উঠানে দাঁড়িয়ে সবাইকে গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন, কই তোরা ঘর থেকে বের হয়ে আয়—দেখে যা কি জিনিস এনেছি—কইরে গোপাল, বিন্তি—কাকুর ডাক শুনে শুধু আমরাই নয়—আশপাশের বাড়ির লোকজনও চলে এলো। অবাক কাণ্ড! সত্যিসত্যি গাড়ি রে!

অবাক, হওয়ারই কথা। আমাদের পাড়ায় আর কারোরই গাড়ি নেই। ভীড় করে আমরা সবাই গাড়ির চারদিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রথম প্রথম ভয় করছিলো। তারপর হাত দিয়ে গাড়ির গা ছুঁয়ে দেখলাম। পঞ্চানন কাকু সাহস জোগায়, ধর না, চেপে ধর—ভয়ের কিছু নাই—গাড়ি হলো গে মানষ—আদর করলেই পোষ মানবে—

তবু চেপে ধরতে ভয় ভয় করতে লাগলো। কিন্তু মনে মনে ঠিকই ইচ্ছা করল গাড়িটা মাথায় করে উঠানময় নৃত্য করি। গাড়ি নৃত্য! গাড়ির রংটা এখানে ওখানে

উঠে গেছে। কোন অসুবিধা নেই বরং, লাগিয়ে নেওয়া যাবে। স্বপ্ন দেখছি নাতো? বোঝার জন্য গাড়িটার গায়ে চিমটি কাটি। না, শক্রই লাগছে। কোন হাওয়াবাজি নয়। পাশের বাড়ির রফিকটা এমন খোঁচাতে লাগলো, এই তোদের গাড়িতে নিবিতো—নিবিতো—

ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, নেবো।

—সত্যি?

—সত্যি।

—ভুলে যাবি নাতো?

—নাহ্।

আবার হাত ধরে টান দিলো, মনে আছেতো-স্কুলে কিন্তু আমিই তোকে আইসক্রীম খাওয়াই।

আমি খোঁচার থেকে বাঁচার জন্য গাড়ির পিছনের দিকে সরে গেলাম। নিচু হয়ে গাড়ির তলাটা দেখে নিই। বলা যায় না আবার যদি গরুর মতো দুটো পা থাকে তাহলে লাথি খেতে হবে। অবশ্য গাড়ির চাকাই পা। তবু সাবধানের মার নেই।

পঞ্চানন কাকু সবার অবাক চোখের সামনে পিছনের বনেটটা খুলে উপরে ওঠান, দ্যাখ এই হলো মাল নেওয়ার অতিক্তি জায়গা।

আমরা আরো অবাক হই। জায়গা কোথায়? মাটি দেখা যাচ্ছে। পঞ্চানন কাকু ব্যাখ্যা করেন, এখন অবশ্য ফাঁক দেখছিস—ওটাতে ভারী দেখে টিন লাগিয়ে নিতে হবে।

রফিকদের কাজের বুয়া সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে পঞ্চানন কাকুকে পরামর্শ দেয়, হ্যাঁ দাদা-বোতল মার্কা টিন লাগাইয়েন—আমরার ঘরের চালেও বোতল মার্কা টিন লাগাইছি। রতন কাকুকে মুখ বেজার করে বসে থাকতে দেখে পঞ্চানন কাকু ডাকেন, কিরে ইঞ্জিনিয়ার, মুখটা অমন ঢেঁকির মতো লম্বা করে বসে আছিস কেন?—আয় দেখে যা—তুইতো আবার এসব ভাল বুঝবি—

রতন কাকু পলিকেটনিক কলেজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। তাই পঞ্চানন কাকু রতন কাকুকে আদর করে ইঞ্জিনিয়ার বলে ডাকেন। কিন্তু এ মুহূর্তে রতন কাকু গাড়ির দিকে ফিরেও তাকালো না। সোজা উঠানের কোণা থেকে ওঠে এসে পঞ্চানন কাকুর সামনে দাঁড়ালে, গাড়ির দাম মিটিয়ে দিয়ে এসেছেন?

পঞ্চানন কাকু উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেন, তুই আমাকে কি ভাবছিস ইঞ্জিনিয়ার? কাঁচা কাজে আমি নেই। লেনদেন একদম ক্লিয়ার—টাকা-পয়সা সব শোধ করে তবে গাড়ি নিয়ে এসেছি।

রতন কাকু আর একটা কথা না বলে উঠোন পেরিয়ে গেট দিয়ে সোজা বার হয়ে চলে যান।

পঞ্চানন কাকুর কথা বলি। তিনি কবে থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন তা জানি না। তবে তাঁর কোনো সংসার নেই। তিনি বাবার মামাত ভাই সারাদিন চাকরি করতেন একটা তেল কোম্পানিতে। আর সন্ধ্যায় বসে আমাদের পড়াতেন। পড়া না

পারলে নীল ডাউন করাতেন। পারলে সিকি আধুলি ছুঁড়ে দিতেন। শুনেছি কয়দিন আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রচুর টাকাও পেরেছেন। এর আগেই ঘোষণা দিয়েছেন—আমি এখন তোমাদের সারাদিন পড়াব। পড়া পারলে সিকি নয় এবার থেকে আধুলি পাবি। সারাদিন পড়ার কথা শুনে বিন্তির জ্বর এসে গেল। সেই জ্বর দুইদিন ছিল। আর দু'নম্বর হচ্ছে পঞ্চানন কাকু বালক-বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া বিষয়ক একটা বই লিখবেন। সেখানে থাকবে পড়ানোর পদ্ধতি, বয়সভেদে শাস্তির ও আদরের রকমফের—নীল ডাউনের প্রকার ভেদ। সেই বই নাকি প্রতি বাড়িতে বড়দের অবশ্য পাঠ্য হবে এবং তাঁরা উপকৃত হবেন। যাক তবু আমাদের পড়তে হবে না।

দুপুরে খেতে বসে মামা পঞ্চানন কাকুকে ধরলেন, রতন যা বলল তা সত্যি নাকি? পঞ্চানন কাকু অবাক হন, কি বলেছে?

তুমি নাকি চৌধুরীদের ঝরঝরে গাড়িখানা কিনে এনেছো?

ঝরঝর! একটু প্রাচীন হয়তো কিন্তু ঝরঝরে কে বলল? তাছাড়া ওরা বিদেশে চলে যাচ্ছে—সস্তায় বেঁচে—পঞ্চানন কাকু একনাগাড়ে বলে যায়।

রতনতো বলল ঐ গাড়ির সবকিছু বদলাতে হবে। কি যে করো! বাবা বিরক্ত মাখা স্বরেই বলেন।

পঞ্চানন কাকু ব্যাপারটা পরিষ্কার করেন, পেনশনের টাকা পেলাম—অতো টাকা দিয়ে কি করবো—তাই সস্তা দেখে একটা কিনে ফেললাম।

তোমার যা ইচ্ছা করো। বলে বাবা খাওয়া সেরে উঠে চলে যান। পঞ্চানন কাকু—খাবার সামনে নিয়ে খানিক বাবার যাওয়ার পথে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, যা, আমি গাড়ি দিয়ে কি করবো—তোদের জন্যই কিনলাম—মা সামনে দাঁড়িয়েছিল। কাকু খেদের স্বরে বললেন, বুঝলে মানুষের উপকার করতে চাইলে দোষ—দাও, চাঁদা মাঝের শুঁটকিটা আরেকটু দাও—বলে খেতে লাগলেন।

পঞ্চানন কাকু বিকেল বেলায় রতন কাকুকে ডেকে বললেন, ইঞ্জিনিয়ার তুই একটু দেখতো—গাড়িটার কি কি বদলাতে হবে।

রতন কাকু গম্ভীর স্বরে বললেন, এটা ওজনে বিক্রি করে ফেলুন।

পঞ্চানন কাকু একটু রাগেন, সবাই তোরা এক কথাই বসছিল। বিক্রি না হয় করে দেবো, দ্যাখ না একটু—

অগত্যা রতন কাকু গাড়িটাকে দেখতে গেলেন। রতন কাকু মেশিনের সামনের বনেটটা খুলে নিলেন।

এটা নেড়ে ওটা পেঁচিয়ে সেটা খুলে—অনেকক্ষণ শরীক্ষা করে রতন কাকু পঞ্চানন কাকুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। পঞ্চানন কাকু জিজ্ঞেস করেন, কিরে কি বুঝলি?

অনেক কিছু বদলাতে হবে।

একবার স্টার্ট দিয়ে দেখতি—টেঙ্কিতে তেল ভরে এনেছিতো।

ওটা স্টার্ট নেবে না।

কি বদলাতে হবে? পঞ্চানন কাকু জানতে চান।

ক্রাঙ্কশ্যাফট্, হর্ন ইনডিকেটের সুইচ, একনাগারে বলে তারপর রতন কাকু থামলেন।

এতোসব বদলানোর কথা শুনে পঞ্চানন কাকু গরম হয়ে গেলেন। তো আমাকেই বদলে ফেল—না-ছাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিস।

রতন কাকুও রাগ করে চলে গেল।

শেষে পঞ্চানন কাকু নিজেই মেকানিক্স ডেকে সাতদিন সাতরাত্রি চেষ্টা করে গাড়িটাকে স্টার্ট দেওয়ালেন। কোত্থেকে একজন ড্রাইভারও যোগাড় করে আনলেন। ড্রাইভারটি প্রায় বুড়ো। এ বুড়ো গাড়ি কি করে? পঞ্চানন কাকু বললেন, খুবই অভিজ্ঞ ড্রাইভার—

এর আগে পঞ্চাশ বছর গাড়ি চালিয়েছে। বুঝলি, এই ড্রাইভারের আকেটা সুবিধা হলো, ইনি কানেও কম শোনেন—চোখে কম দেখেন—তাই ধীরে সুস্থে গাড়ি চালাবেন—এক্সিডেন্টের ভয় কম থাকলো। গাড়িতো আর মরার জন্য নয়—হা-হা...

এখন বাবা আর গাড়ির সম্বন্ধে কিছু বলেন না। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। অবশ্য আমাদের মুন্সিগঞ্জে গাড়িঘোড়া খুবই কম। রিকশাই বেশি। বুড়ো ড্রাইভারেই চলতে পারে।

শেষে একদিন সবার নিষেধ সত্ত্বেও পঞ্চানন কাকু মুক্তির হাটে তাঁর এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চলবেন। সেই বন্ধু এখন মুন্সিরহাট বাজারে পাটের বিরাট আড়ৎদার। এখন গাড়ি নিয়ে যাবেন, গাড়ি দেখাবেন বলে। অবশ্য আমাদেরও সঙ্গে নিতে চাইলেন। কিন্তু আমাদের আড়ালে নিয়ে রতন কাকু এমনভাবে বললেন, যেন গাড়িতে ওঠো মাত্রই মৃত্যু। ভয়ে আমরা কেউ গেলাম না।

গাড়ি প্রথম বাড়ির বার হচ্ছে। বিরাট ব্যাপার। বাড়িতে সেদিন হেভী খাওয়া-দাওয়া হলো। বাবা পঞ্চানন কাকুকে বললেন, না গেলে হয় না?

না, যেতেই হবে—গাড়ি করে গিয়ে কোলাকুলি করে আসবো।

বাবা আবার অনুরোধ করেন, কোলাকুলি করতে কে না করেছে কিন্তু গাড়িটা না নিলে হয় না? এতখানি পথ—তাও কাঁচা রাস্তা—গাড়ির যে কি অবস্থা হবে—

সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাক। পঞ্চানন কাকুর দৃঢ় জবাব।

বাবা আর কিছু বললেন না।

বুড়ো ড্রাইভার খেয়ে দেয়ে উঠে বলল, একটু ঘুমালে ভাল অইত না—খাউনটা বেশি অইয়া গেছে।

না-না, চলোচলো এক্ষুণি রওনা দিতে হবে। পঞ্চানন কাকু তাড়া দেন। অবশেষে সবাইকে দুশ্চিন্তার সাগরে ভাসিয়ে বন্ধুর উদ্দ্যেশে তিনি যাত্রা করলেন।

সমস্ত দিন দেখলাম ঘরের বড়রা চিন্তা করছে। রতন কাকু গাড়ি খালি পেয়ে হেভি হম্বিতম্বি শুরু করলো, এই লক্কড় গাড়ি কেউ বিশ হাজার টাকা দিয়ে কেনে? সের দরেও কেউ নিত না।

এতোক্ষণে বুঝলাম কেন রতন কাকু গাড়ি কেনার দিন অতো রেগেছিল। বাবা সন্ধ্যার আগেই দু'বার খোঁজ নিয়েছেন পঞ্চানন কাকু ফিরলেন কিনা। রতন কাকু বলতে লাগলো, তখনই বলছিলাম, দেখবেন কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে ছাড়বে।

রাত আটটার দিকে একটা মহিষের গাড়ি আমাদের বাড়ির দরজায় এসে থামলো। আমরা সব বেরিয়ে এলাম, মহিষের গাড়ির উপর পঞ্চানন কাকু বলে আছেন। এ যাঃ চার চাকার গাড়িটা দু'চাকার মহিষের গাড়ি হয়ে গেল নাকি? পঞ্চানন কাকুর মুখ থম্‌থমে। খুব মন খারাপ, বোঝাই যাচ্ছে। আশ্চর্য, মহিষের গাড়ির পিছনটাতেই মোটা একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা পঞ্চানন কাকুর গাড়িটা। ভেতরে ড্রাইভার বুড়ামিয়া বসা।

ব্যাপার কি? জানা গেল শহর ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় পড়ার পরই গাড়িটা বেয়াদবি শুরু করলো। তাও মাইল তিনেক গিয়ে একবার গোঁ-গোঁ শব্দ করেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। শেষে দু'জনে মাইল দু'য়েক ঠেলে এনে রাস্তায় মহিষের এই গাড়িটা পেয়ে এটাকে টেনে আনার জন্য ঠিক করেছেন। গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নাকি জান কাবার হয়ে গেছে।

পঞ্চানন কাকু রতন কাকুকে সামনে তক্ষুণি আদেশ দিলেন, রতন—গাড়িটা বিক্রির ব্যবস্থা কর।

কিভাবে এই গাড়ি বিক্রি করবো? রতন কাকু বিব্রত বোধ করে।

ফেরিওয়ালার কাছে সের দরে বিক্রি করে দে বলেই পঞ্চানন কাকু ঘরের ভেতরে চলে গেলেন।

আমরা ভাবলাম, খুব মজা হবে, গাড়িটা ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি হলে অনেক গুড়ের কটকটি খাওয়া যাবে।

সার্কাসের ভাঁড়

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

গুলদা তার সিদ্ধান্তে অটল—যতো বাধা-বিঘ্নই আসুক সার্কাস পার্টি সে গড়বেই। এ নিয়ে খসড়া একটা প্ল্যানও তৈরি করে ফেলেছে। কারা দড়িতে ঝুলে কসরত দেখাবে, কারা রিঙে ঝুলে ডিগবাজী খাবে, কে কে বিস্ট মাস্টার হবে—সব ঠিক। ঝোলাঝুলির ট্রেনিংটা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এবং পরশু রিং থেকে হাত ফসকে পড়ে গিয়ে একটা ঠ্যাং ভেঙে ফেলেছে টিকালে। এখন প্লাস্টার বাঁধা বা পা নিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। তবে উৎসাহ এতাটুকু কমেনি। গতকাল আমরা ওকে দেখেতে গিয়েছিলাম। ও সোৎসাহে বলল, পা-টা ভালো হয়ে গেলেই আবার ঝোলাঝুলি শুরু করবে। আসলে ওর নামটা কিন্তু টিকালে নয়। চপল একটু চঞ্চল প্রকৃতির বলে গুলদা ওর নাম দিয়েছে 'টিকটিকির কাটা লেজ' সংক্ষেপে টিকালে। এদিকে টেংকুকে পাঠানো হয়েছে বান্দরবান। সেখানকার বন বিভাগে তার এক মামা আছেন। গুলদা বলেছে ফুসলিয়ে দুটো বানরের বাচ্চা যোগাড় করতে। মাংকি মাস্টারের দায়িত্বটা ওর কাঁধেই চাপানো হয়েছে। আমি ইচ্ছি এলিফ্যান্ট মাস্টার। অর্থাৎ হাতিকে খেলা শেখানোর দায়িত্ব আমার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে হাতি যোগাড় করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি এসব এলাকায় হাতি পাওয়া গেলেও কিনতে এবং আনতে খরচ হবে ম্যালা। কথায়ই তো আছে মরা হাতির দামও লাখ টাকা। অবশ্যি হাতি কেনার ব্যাপারে গুলদার একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে। শুধু হাতি নয়, ওকে একে বাঘ ভালুকও কেনা হবে। এখন থেকে আমরা টিফিনের পয়সা জমিয়ে কিছু কিছু করে চাঁদা দেব। তারপর বড় রকমের একটা পুঁজি হলেই ঢেলে সাজাব সার্কাস পার্টি। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও সার্কাস দেখাব আমরা। রোমহর্ষক আর বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে বিশ্ববাসীদের বুঝিয়ে দেব ভেতো বাঙালি কী চিজ। আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। আমাদের সার্কাস পার্টির জন্য এখনো কোনো ক্লাউন, মানে ভাঁড় ঠিক করা হয়নি। অথচ সার্কাসকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে বিশেষ

করে বিরতির সময় দর্শকদের হাসি-আনন্দে ডুবিয়ে রাখার জন্যে ভাঁড় হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। গুলদা ঘোষণা করেছে, যে রসাত্মক কোন ঘটনা ঘটিয়ে চমক সৃষ্টি করতে পারবে তাকে ভাঁড়ের মুখ্য চরিত্রটি দেওয়া হবে। আমাদের প্রায় সবাইর লোভ এই ভাঁড় চরিত্রটির প্রতি। বলতে দ্বিধা নেই আমারও লোভ আছে। কারণ ভাঁড়ের কোনো শারীরিক বুঝি নেই, তাছাড়া বিরতির সময় ভাঁড়াই হয় আসরের মধ্যমনি। দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখে তাকে। আর লোক হাসানো একটা বিরাট ব্যাপার। মানুষকে যতো সহজে কাঁদানো যায় ততো সহজে হাসানো যায় না। আমরা এ নিয়ে রাত দিন ভাবছি আর মহড়া দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু লাভ হচ্ছে না কোনো।

সেদিন সুপ্পি যা কাণ্ড করেছে একখানা! ভরদপুরে পেছনবাড়ির আমতলে একাকী ভাঁড়ামির রিহার্সেল দিচ্ছিল। সারা শরীরে কালিঝুলি মাখা। গোসলের আগে গোপনে চলছিল এই মহড়া। কিন্তু বিধি বাম হলে যা হয়। ওদের বোকাসোকা কাজের মেয়েটা মাছের আঁশটে ফেলতে এসে দেখে একটা বাচ্চা ভূত নাচানাচি করছে গাছতলে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার এবং দাঁত কপাটি। অফিস থেকে ওর বাবা পুরো এক ঘন্টা সারাবাড়ি দাবড়ে বেরিয়েছেন ওকে। আমিও গুলদাকে ভিড়ামি খাওয়াবার ধান্ধায় আছি। কিন্তু যুতসই কোনো আইডিয়া আসছে না মাথায়। তবে হাতিটা ট্রেনিং দেওয়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একটা পথ বের করে ফেলেছি। আমাদের এখানে যে সার্কাস পার্টি (এই সার্কাস দেখেই গুলদার মাথায় সার্কাসের পোকা ঢুকছে) এসেছে, সেটার মাহুতের সাথে ভাব হয়ে গেছে আমার। রোজ ভোরে আমাদের বাসার সামনে দিয়ে হাতি নিয়ে যায় সে। গোডাউনের পুকুর থেকে গোসল করিয়ে আনে। ফেরার পথে আমাদের বাসার সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে হাতিটাকে বেঁধে নাশতা করতে যায় কাছের এক হোটলে। একদিন অনেকগুলো কলাপাতা এনে দিয়েছিলাম হাতিটাকে। তারপর থেকে মাহুত ভাই খুব খাতির করে আমাকে। পুকুরে যাবার পথে আমাকে তুলে নেয় হাতির পিঠে। প্রথম প্রথম একটু ভয় করত। মনে হতো আস্ত এক পাহাড় ধেয়ে চলেছে আমাকে নিয়ে। এখন ভয়টা আর নেই। আজ পুকুর থেকে ফেরার পর মাহুত ভাইকে বললাম, বেঁধে রাখার দরকার নেই। আমি তো আছি। আপনি নাস্তাটা সেরে আসুন, আমি বসে থাকি হাতির পিঠে। হাতি কথা বলতে না পারলেও তার মাহুতের কথা বেশ বুঝতে পারে। মাহুত যা যা হুকুম করে ঠিক ঠিক পালন করে সে। হাতিকে ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে নাশতা খেতে গেল মাহুত ভাই। প্রতিদিনের মতো আজও হাতিটাকে ঘিরে ছোটখাট ভীড় জমে গেল। বেশির ভাগই আমার মতো কৌতুহলী কিশোর। বেশ গর্ব হতে লাগল। এই প্রথম হাতির পিঠে একা বসেছি, কিছু একটা করে সবাইকে তাক লাগাতে ইচ্ছে করছে খুব। কি যে করি? প্রবল উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে বলে ফেললাম, হেই চল চল। অমনি সুবোধ বালকের মতো এগিয়ে চলল হাতি। সবার দৃষ্টির ওপর নজর বুলিয়ে দারুণ এক তৃপ্তি পেলাম। ধীরে ধীরে চলার গতি বাড়তে লাগল হাতির। এবার কেমন একটু ভয় ভয় করতে লাগল। গজ পঞ্চাশেক দূরের ব্রিজটার কাছে এসে হাতিকে বললাম, হেই, থাম থাম। কিন্তু

হাতি থামল না। নিশ্চিন্তে এগোতে লাগল ব্রিজটার দিকে। আত্মা উড়ে গেল আমার যে খাড়া ব্রিজ ওঠার সময় নির্ঘাত গড়িয়ে পড়ব। আর এতো উঁচু থেকে পড়া মানে ওহ্ ভাবাই যায় না। মরিয়া হয়ে মাহুত ভাইয়ের কণ্ঠ সকল করে করে বলতে লাগলাম, দুষ্টুমি করিস না রে বেটা কথা শোন, কথা শোন, বাপ ধন!

কে শোনে কার কথা! সে বেপরোয়া ভঙ্গিতে ব্রিজের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। আমি উবু হয়ে শক্ত করে ধরলাম হাতির পেঁচানো মোটা দড়িটা। এদিকে হিংসুটে ছেলের দল আমার করুন দশা দেখে মহা পাচ্ছে খুব। তারা পেছন থেকে হৈ হৈ করে উৎসাহ দিচ্ছে হাতিটাকে। ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিল হাতি। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। সামনেই হাড়কেপ্পন টুনু পোদ্দারের কলাবাগান। হাতি মশমশিয়ে সেদিকে ঢুকে গেল। হৈ হল্লা শুনে বেরিয়ে এলো পোদ্দার। কলাগাছগুলোর অবশ্যম্ভাবী করুণ পরিণতি অনুমান করে আকাশ ফাটিয়ে মাতলমো শুরু করল সে। হঠাৎ জংলা কাটায় ভরা একটা চোরা গর্তে ঢুকে গেল হাতির এক পা। আর্তনাদ করে বিদঘুটে ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল হাতি। সঙ্গে সঙ্গে হাতির পিঠ থেকে ছিটকে এসে পড়লাম। ডানদিকের আধশুকনো ডোবায়। প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা আর ময়লা পানিতে হাবুডুব খেয়ে নিমিষেই সাজলাম কাদামানব। বিচ্ছিরি গন্ধে নাড়িভুড়ি উল্টো আসার যোগাড়। চারদিকে তখন হাসির হল্লোড় পড়ে গেছে। সাহায্য করবে কি, তারা হেসেই খুন। বহুকষ্টে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তীরে এসে উঠলাম। ঠিক তখনই কোত্থেকে গুলদা এসে হাজির। তার বিকশিত বেলচা-দন্ত দেখে গা আমার জ্বলে গেল। নিরাপদে দূরত্বে অবস্থান নিয়ে গুলদা খুব করে উৎসাহ দিয়ে বলল, দারুণ একটা খেল দেখিয়েছিস! যা, ভাঁদের প্রধান চরিত্রটা তোকেই দিয়ে দিলাম।

লজ্জায় যাচ্ছে আমার মাথা কাটা, আর উনি এসেছেন আমাকে ভাঁড় সাজাতে! অমন ভাঁড়ের মুখে ঝাঁটা।

সাহিত্য সাধনা

মাহবুব তালুকদার

সাহিত্যের জন্য সাধনা দরকার। আর সে সাধনা অত সোজা ব্যাপার নয়। ভজুদা বললেন, সাধনা কেমন করে হয় জানিস?

সাধনা ঔষধালয়ের ওষধ খেয়ে। আমি জবাব দিই।

দূর বোকা! সে তো হচ্ছে স্বাস্থ্যের সাধনা, সাহিত্যের সাধনা নয়। সাহিত্যের সাধনা করতে গেলে, এতে সিদ্ধি লাভ করতে হলে, সিদ্ধ-পুরুষের মতো এগোতে হবে তোকে।

সিদ্ধ তো অহরহই আমি। বাড়িতে একটা পাখা নেই বলে গরমে ঘেমে ঘেমে সিদ্ধ হচ্ছি।

শুধু গো ঘামালে হবে না। মাথাও ঘামাতে হবে। মাথার ওপর লেপতোষক চাপিয়ে খুব ভাল করে মাথা ঘামাবি। জগতের বড় বড় কবি-সাহিত্যিকরা মাথা না ঘামিয়ে একটি অক্ষরও লেখে না। টুপি আর পাগড়ি পরার প্রচলন তো ঐ জন্যই।

আমি সায় দিই। ভজুদার যুক্তির কাছে নিঃসহায় বলেই আমাকে সায় দিতে হয়।

সাহিত্য করতে গেলে দুটো জিনিস খুব দরকার। ভজুদা বলে যেতে থাকেন, ভাব আর ভাষা। ভাবের অভাব হলে, সাহিত্যিকের জন্য তা দারুণ ভাবনায় বিষয়।

আজকাল চারদিকে দারুণ অভাব ভজুদা।

অভাবের তাড়নায় তোদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে ভাবের সাহিত্যে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু লেখক হতে হলে অত নির্ভাবনায় বলে থাকলে চলবে না।

আর ভাষা? আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি।

ভাষা এমন হবে যে, তার তোড়ে হয়েন সবকিছু ভেসে যায়। সাহিত্যেকে ভাসিয়ে নিতে না পারলে ভাষা ভাষাই নয়। ডোবা বা বদ্ধ জলাশয়ের মতো আবদ্ধ

হয়ে থাকলে তুই নিজেই ডুবে মারা যাবি। তোকে হতে হবে সাহিত্য সাগর কিংবা সাহিত্য মহাসাগর। এখন বেশি করে কলা খাস।

কলা!

ভজদু বললেন, আকাশ থেকে পড়লি যে! কলা মানে হচ্ছে আর্ট। কলাই হচ্ছে সব সৃষ্টির পরিণতি। সাহিত্য সাগর হতে হলে মোটা মোটা দেখে সাগর কলা খাবি। লোকজনকে কলা দেখিয়ে না বেড়ালে কি কেউ সাহিত্যিক হয়?

বললাম, কিন্তু আমার লেখা যে সম্পাদকেরা নিচ্ছে না মোটেই। ওরা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে না।

তুইও ওদের প্রতি দূকপাক করবি না। সম্পাদকরা না নিলে কি হবে, পাঠকরা নেবে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য লিখে যা। শিশি-বোতাল-কাগজওয়ালা লুফে নেবে। আসলে শ্রমজীবী তো ওরাই।

ভজুদার এসব উপদেশ আমি অনেকবার শুনেছি। আমাকে সাহিত্যিক বানাতে অপরিসীম উৎসাহ তার। এ বিষয়ে তার উদ্যোগ ও উদ্দীপনার শেষ নেই। অবশ্য কারণও আছে এর। আমার লেখা গল্প-কবিতা নাটকে ভজুদাই একমাত্র উপজীব্য। ভজুদা আমার লেখার নায়ক। সুতরাং আমার লেখার সুনামের উপর তার নামের খ্যাতি নির্ভর করছে। এসব বোঝেন বলেই, সদা-সর্বদা আমাকে প্রেরণা দিয়ে চলেছেন তিনি।

সেদিন সকালে ভজুদা আমাদের বাড়ি এলেন। আমি তখনও বিছানায় পড়ে ঘুমুচ্ছি। আমাকে প্রবল বেগে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, একি প্যাচা! এখনও তোর ঘুম ভাঙলো না! কোথায় তুই দেশের লোকের ঘুম ভাঙাবি, আর তুই কি না—কাল রাতে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার ঘুমটা বেশ ঘন হয়েছে।

ঝড়-বৃষ্টি হলে তোর ঘুম বেশি হয়? ভজুদা অবাক হয়ে বললেন, মানুষের দুর্যোগের সময় একজন লেখক হয়ে তুই কি করে ঘুমোস, আমি বুঝতে পারি না। কাল রাতে ঝড়ে কত ঘর ভেঙে গেল—

আমি আড়মোড়া ভেঙে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, আমাদের ঘর ভাঙেনি তো?

তোকে নিয়ে পারা গেল না। ভজুদা ধমকে উঠলেন, এত স্বার্থপর তুই? লেখকরা সব আপনভোলা হয়ে থাকে, অথচ তুই নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিস না।

আমি আর লেখক হতে চাই না। অভিমান ভরে আমি বললাম।

ব্যাপারখানা কি? ভজদা চোখ বড় বড় করে তাকালেন আমার দিকে।

আজ কয়দিন ধরে প্রকাশকের বাড়ি বাড়ি ঘুরছিলাম। তার হাট বাজার থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত করে দিচ্ছিলাম। আশা ছিল আমার লেখা তিনি ছাপাবেন। কিন্তু কাল তিনি মানা করে দিয়েছেন আমার খেলা আর ছাপা সম্ভব নয়।

এই কাণ্ড! ভজুদা বিরাশি শিক্কার এক চড় কষালেন পিঠে, লেখা না ছাপালেই তোর প্রতিভাকে ছাপিয়ে রাখা যাবে, ভাবছিস কেন?

. বানরের গলায় মুক্তোর হার পরিয়ে লাভ নেই। আমি বললাম, শুধু শুধু উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি?

সে কথা ঠিক তাই। বানরের গলায় মুক্তোর হার ভালই মানায়। সেবার একটা বানর চিড়িয়াখানার এক মহিলার গলা থেকে মুক্তোর মালা ছিনিয়ে নিয়ে গলায় পরেছিল। মহিলার চাইতেও ভাল মানাচ্ছিল বারনটাকে। চারপাশের অনেক লোক ভিড় জমিয়ে দেখছিল কাণ্ডটা। অথচ মহিলার গলায় মালাটার দিকেও ফিরেও তাকায়নি কেউ। ভজুদা জিজ্ঞেস করলেন, তোর লেখা আর ছাপার কারণ কি?

আার লেখা কি বাস্তব হয় না।

বাস্তবের পক্ষে প্রকাশকের কথাই ঠিক। ভজুদা বললেন, তোর লেখা কাল্পনিক। তোকে-একদম কল্পলোকের অধিবাসী মনে হয়।

তুমিও এ কথা বলছ?

সত্য বলেই বলছি। ভজুদা ঘাড়ে হাত দিলেন। ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়, ঘাড়ে-গদ্দানে আদর করলেন তিনি। বললেন, লিখতে হলে অভিজ্ঞতা চাই প্যাঁচা। জীবন দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

জীবন দিয়ে ফেললে কলম চালাবো কেমন করে?

অমর হতে হলে জীবন দিতেই হবে। ভজুদা বললেন, এ পথ হচ্ছে ত্যাগের পথ; আত্মত্যাগের পথ।

ভজুদার কথায় কেমন উৎসাহ বোধ করলাম। মরতে তো একদিন হবেই। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মরাই সবচেয়ে শ্রেয়। তাহলে শহীদ সাহিত্যিক হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে আমার নাম থেকে যাবে। ভজুদা খুব খুশি হলেন আমার কথা শুনে। অবশ্য তিনি বললেন, মারা যাওয়াটা বড় কথা নয়, মরার জন্য তৈরি হয়ে থাকাটাই বড়।

সেদিন ঠিক করলাম ভজুদার সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ব। কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে নয়, বাস্তবে গাড়ি ছুটয়ে গল্পের প্লট খুঁজে বেড়াতে হবে। আর প্লট পাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। বাড়ির প্লট পাওয়া সোজা বটে, কিন্তু পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। যা-ই হোক, ভজুদার পিছু প্লটের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আমি।

এ কি তোর মামাবাড়ি যাচ্ছিস? ভজুদা ধমকে উঠলেন, কাগজ-কলম কই তোর? অগত্যা বড়মামার পার্কার, ছোটমামার পাইলাম আর আমার দিস্তা দর্শেক কাগজ সঙ্গে নিলাম।

পথ চলতে চলতে ভজুদা বললেন, আমি হচ্ছি তোর গল্পের নায়ক। যা যা করব, তা তো লিখবিই, যেসব মূল্যবান ডায়ালগ ঝাড়ব, তা-ও শর্টহ্যান্ডের মতো লিখে যাবি।

রাস্তার ওপরে চটপট বসে পড়লাম। কাগজ কলম নিয়ে যেই লিখতে শুরু করেছি, অমনি ভজুদা ভেড়ে এলেন, এটা আবার কি হচ্ছে?

ডায়লগগুলো লিখে নিতে বললে যে! তাই লিখে নিচ্ছি।

বাপের হোটেল খেয়ে খেয়ে মাথাভর্তি গোবর হয়েছে তোর। আরে বাবা-আমি বাবা নই, ভাই।

ভাই না ছাই। তুই হচ্ছিস আস্ত একটা হাবা। এখনো গল্পের প্লটই পেলাম না, আগেই তুই জায়লগ লিখতে আরম্ভ করলি! এ তো ঘোড়া না দেকে চাবুক কেনা। আগে গল্প শুরু হোক, তারপর তো লেখা।

কাগজ কলম বোঁচকা বেঁধে তুলে নিলাম আবার দুপুরের পিচগলা রৌদ্রে গলদঘর্ম হয়ে সারাটা শহর ঘুরে বেড়ালাম দুজনে। নিরিবিলি রাস্তায় কিংবা জনতার মাঝখানে অনেক খুঁজলাম। কিন্তু প্লটের কোন হদিস পাওয়া গেল না। ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা কোনকিছুর পাত্তা নেই।

নিরিবিলি পথে একজন লোক হেঁটে যাচ্ছিল। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবী, বেশ বাঙালি বাঙালি ভাব। চুলের দৈঘ্য দেখে মনে হয়, কবি-টবিও হতে পারে। ভজুদা গিয়ে আলাপ জমালেন তার সাথে। একথা সেকথার পর বললেন, গল্পের মাল-মসল্লা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?

বাজারে গিয়ে দেখুন। ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

রান্নার মসল্লা নয়, গল্পের মাল মসল্লা! বললেন, আপনাকে দেখে কবি মনে হচ্ছে কি না! তাই ভাবলাম, কোথায় গল্পের মাল-মসল্লা পাওযা যাবে, আপনি হয়ত তা জানতেও পারেন।

তা জানি। ভদ্রলোক বললেন।

কোথায়?

এর মধ্যে। ভদ্রলোক তাঁর ঝোলার ভেতর থেকে একটা কল্কে বের করে দেখালেন, এতে একটা টান দিলেই এর ভেতর থেকে গল্প বেরিয়ে সুড়ৎ করে আপনার মস্কিষ্কের ফোঁকার চলে যাবে। দেখবেন ট্রাই করে?

সর্বনাশ। ভজুদা আঁত্কে উঠলেন, ওতে টান মারলে আমাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যাওয়ার উপায় থাকবে না।

ভজুদা আর আমি দুজনেই সট্কে পড়লাম কল্কেওয়ালার কাছ থেকে। কিন্তু যাবো কোথায়? কোথায় গেলে গল্পলেখার প্রেরণা জুটবে। আর হাঁটতে পা চলছে না। টলতে টলতে আমরা দুজনে একটা বাসে উঠে পড়লাম। বাসে চাপার বড় একটা সুযোগ জোটে না আমাদের। যতবার বাসে চড়েছি, ঐ পা-দানীতে চেপেই গেছি। তাতে শরীরটা বাসের বাইরে থেকে যায় বলে পুরো দেহের ভাড়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। চলাচলের এই সুবিধাজনক আবিষ্কারের কথা ভজুদাই বলেছেন। কিন্তু শ্রান্তি-ক্লান্তিতে পা-দানীতে পা রাখার সামর্থ্য আর নেই। বাসের ভেতরেই উঠে গেলাম আমরা।

বাসের ভীড় দুজন আর কাছাকাছি থাকতে পারলাম না। এমন টানা-হেঁচড়া যে, পরস্পরকে কাছি দিয়ে বেঁধে রাখলে তা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ! একটা সিট খালি হওয়ার ভজুদা হঠাৎ সেখানে বসে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝুলতে লাগলাম।

প্যাঁচারে! হঠাৎ ভজুদার আর্ত চীৎকার শুনতে পেলাম, আমার পকেটে মারা গেছে।

নে কি! আমিও প্রায় আর্তনাদ করে সামনের দিকে গেলাম।

কি ছিল ভাই পকেটে? অচেনা একজন জিজ্ঞেস করল।

পকেটে যা থাকে। ভজুদার উত্তেজিত স্বর শোনা গেল, বুক পকেটে একটা পকেটবুক ছিল।

কে নিয়েছে দেখুন। পাশ থেকে বলল একজন।

ভজুদা আর কোন উত্তর না দিয়ে তার পাশে বসা লোকটির গলার কলার চেপে ধরে বললে, আপনি নিয়েছেন।

আ-মি! আ—,লোকটির গলার স্বর কাঁপতে লাগল।

একশবার আপনি। ভজুদা চেঁচিয়ে উঠলেন, বের করুন আমার বই।

লোকটির চোখমুখ রাগে থমথম করছে। যে বলল, আপনি দেখেছেন আমার বই নিতে?

না দেখলে কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞের মতো ভজুদা বললেন।

তাহলে প্রমাণ কি আপনার অভিযোগের?

প্রমাণ নিশ্চয়ই আছে। ভজুদা জানালেন, একেবারে লিখিত প্রমাণই রয়েছে। ঐ দেখুন।

সবাই তাকিয়ে দেখল, বাসের গায়ে বেশ স্পষ্ট করে লেখা—'সাবধান পাশে পকেটমার আছে'। সোৎসাহে বললেন, আপনি আমার পাশেই বসেছেন। পারবেন এ দোষ অস্বীকার করতে?

কিন্তু কি হতে কি হল! বাসশুদ্ধো লোক আক্রোশে ছুটে এল ভজুদার দিকে। কেউ লাথি বাগিয়ে এল, কেউ লাঠি উচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর ভজুদা তাদের সবার ওপর দুমাদুম কিল ঘুষি চালিয়ে যেতে থাকলেন।

প্যাঁচা! ভজা মারামারির মাঝখানে চীৎকার করে উঠলেন।

বলো। আমি সায় দিলাম।

গল্প স্টার্ট হয়ে গেছে। ভজুদা বললেন, ডায়গলগুলো ঠিকমত লিখেন। দারুণ বাস্তব গল্প হবে এটা।—তারপর লোকজনের দিকে তাকিয়ে ঘুসি চালাতে চালাতে তিনি বললেন, বাঁচিয়ে দিলেন আপনারা। প্লটের মতো প্লট যুগিয়ে দিয়েছেন একখানা, আমাদের সাহিত্যে সাধনাই যে বিফল হয়ে যেত!

❑

আমি রেগে মেগে টেলিফোন রেখে দিলাম।

সন্ধেবেলা শওকত সাহেবকে দেখতে গেলাম। কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় পা তুলে বসে আছেন। ঘরের মাঝামাঝি ছোট একটা ইলেকট্রিক হিটার ঘরটাকে গরম করার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখে দুর্বলভাবে হেসে বললেন, এই ঠাণ্ডাটা বড় কাহিল করে দিয়েছে।

হ্যাঁ। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে এবার। আপনার শরীর কেমন?

এই বয়সে আর শরীর। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে কাটিয়ে দিই আর কয়টা দিন।

ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন?

না যাইনি।

আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে?

ইন্স্যুরেন্স? মনে হয় আছে। মেজো ছেলেটা সেদিন নিয়ে গিয়ে করিয়ে দিল।

সেদিন করিয়ে দিল মানে? আগে অসুখ বিসুখ হলে কী করতেন?

শওকত সাহেবকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল। আমি কথা বলে বুঝতে পারলাম তার আলাদা করে কোন রকম হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই। এদেশের বুড়ো মানুষদের জন্যে সরকার থেকে দায়সারা যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে সেটাই একমাত্র অবলম্বন। মেজো ছেলেটি তাকে নিয়ে যে ইন্স্যুরেন্স কিনে দিয়েছে সেটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স। শওকত সাহেব মারা গেলে মেজো ছেলে মোটা অংকের টাকা পাবেন। বুড়ো মানুষ মারা তো যাবেনই তাকে বিক্রি করে কিছু বাড়তি টাকা পেলে মন্দ কী? ব্যাপারটা ভেবে আমার কেমন জানি গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে।

শওকত সাহেবের সাথে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। ভদ্রলোকের মনটা নিশ্চয়ই দুর্বল হয়েছিল। ঘুরে ফিরে শুধু তার মৃত স্ত্রীর কথা বললেন। হৃদয়হীন এই পৃথিবীতে স্ত্রীর স্মৃতি ছাড়া ভালবাসার আর কিছু তার জন্যে অবিশিষ্ট নেই।

শওকত সাহেব এক সপ্তাহ পরে মারা গেলেন। রাতে কাজ থেকে ফিরে এসে ম্যানেজারের কাছে শুনলাম দুপুরে তার ঘর থেকে গোঁ গোঁ ধরনের একটা শব্দ হচ্ছিল। দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হল। ভেতরে তিনি বিছানায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে সাথে সাথে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। ম্যানেজারের কাছে তার ছেলের টেলিফোন নাম্বার ছিল। তাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। তার ঠিক কী হয়েছিল এখনো জানা যায়নি, সন্দেহ করা হচ্ছে স্টোক বা হার্ট অ্যাটাক জাতীয় কিছু হয়েছে।

হাসপাতালে যেতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। আমি তবু শওকত সাহেবকে দেখতে গিয়েছিলাম। ভিজিটরদের সময় পার হয়ে গিয়েছিল তবু আমাকে যেতে দিল। হাসপাতালের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। নাকে একটি নল লাগানো।